বঙ্গসংসার।

প্রথম খণ্ড।

খুল্লতাত

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার প্রণীত

১। বীরপূজা।

(উপন্যাস)

প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা।

২। বাঙ্গালীর বল।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

৪৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা।

উভয় পুস্তক সুবর্ণ অক্ষরে কাপড়ে বাঁধাই।

আমার নিকটে পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কা

বঙ্গসংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী উপকূলবর্ত্তী কোন অট্টালিকার ছাদে বসিয়া, একদা অপরাহ্নে স্বামী, স্ত্রীকে বলিতেছে, "কেন, বিলি, আবার বাপের বাড়ী যাবার কথা বলিতেছ?"

বিজলি ওরফে বিলি উত্তর করিল, "কেন তা ত তোমায় ব'লেছি। দাদা একটু ভাল হ'লেই আবার আ'সব।"

স্বামী বলিল, "আসিবে তা'ত বুঝিলাম। কিন্তু যতদিন না এস, ততদিন?"

বিলির চোখে জল আসিল; একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ততদিন তোমার যা' আমারও তাই।"

স্বামী। তবে কেন দু'টি প্রাণ কাঁদাইয়া যাইতে চাও?

স্ত্রী। কেন চাই তাহা ত বার বার ব'লেছি। যদি পিত্রালয়ে গেলে প্রাণে ব্যথা পাও, তবে যাব না।

স্বামী নির্ম্মলকুমার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ব্যথা পাব কিনা তাহা তুমি নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে পার না? ভাইকে দেখিবার সাধ করিয়াছ, আমি তোমার সে সাধে বাধা দিব না।"

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। বিলির যেন কান্না আসিল; কিন্তু কি বলিয়া, কি ভাবিয়া কাঁদিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। অস্থির মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "আমি যাব না।"

স্বামী। কেন, বিলি?

স্ত্রী। তুমি কেন হাসিতে হাসিতে আমায় ছেড়ে দিতেছ না?

স্বামী। হাসি যে আস'ছে না, বিলি!

স্ত্রী। অন্যবারে ত' এমন কর না?

স্বামী। এবার আমার প্রাণ কাঁদছে; জানি না কপালে কি আছে।

আবার উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয়ে বৈশাখী মেঘ—বাহিরে গাম্ভীর্য্যময়ী সন্ধ্যা।

বিলি বলিল, "তুমিও কেন সঙ্গে চল না?"

এই অনুরোধে একটা কথা নির্ম্মলের মনে পড়িল। বৎসরেক পূর্ব্বে নির্ম্মলকুমার একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। সে সময় বিলির ভ্রাতৃজায়া, নির্ম্মলের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় যাচিঞা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। নির্ম্মল তদবধি শ্বশুরালয়ে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিলি এ সকল কথা জানিত না; নির্ম্মল কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এক্ষণে মনোভাব গোপন করিয়া নির্ম্মল বলিলেন, "মাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

এ কথাটাও প্রকৃত। নির্ম্মল মাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। শ্বশুরালয়ে দুই একদিনের বেশী থাকিতে পারিতেন না। কোথাও বেশী দিন থাকিতে হইলে মাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

বিলি একটু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দুইদিন থাক।"

নির্ম্মল কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার প্রাণে একটু ব্যথা লাগিল। ক্ষণকাল পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে ফিরিবে?"

স্ত্রীর অপ্রসন্নতা দূর হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল. "তোমায় ছাড়িয়া আমি কতদিন থাকিতে পারিব ?"

স্বামী বলিল, "যত শীঘ্র পার ফিরিও।"

স্ত্রী সানন্দে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। লাল রবির লাল আভা বিজলির মুখে, গণ্ডে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় ঊষার ন্যায় বিজলির ছবিখানি আকাশপটে কে যেন আঁকিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল দেখিলেন, বিজলির মুখ-খানি অতি সুন্দর। একবার সাধ হইল, বিলিকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলেন, "বিলি, আমায় ছেড়ে যেও না।"

বলিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত—বিলি সম্ভবত যাইত না। কিন্তু বিলির প্রফুল্ল ও ব্যগ্র মুখখানি দেখিয়া নির্ম্মল সে ইচ্ছা দমন করিলেন। তবু একটু আশা-সঞ্চারিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে ?"

বিজলি বলিল, "একটা চুমো।"

নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলির রক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠে

উপর স্বীয় ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সুদীর্ঘ চুম্বনে বিলিকে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কেন তাঁহার প্রাণ এত কাতর।

বিলি কাঁদিয়া ফেলিল; একবার ভাবিল, "এমন প্রেমময় স্বামী ছাড়িয়া কোথাও যা'ব না।" কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তিত মনোভাব মুখ দিয়া ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল বলিলেন, "বিলি, প্রত্যহ চিঠি লিখ্‌বে ত? তোমার দাদা কেমন থাকেন লিখিও।" বিলির মন আবার পিতৃ-গৃহ পানে ছুটিল। সে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর উপকূলে বধূগ্রাম নামে এক সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করা যখন আজকাল প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরাও সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করিলাম। যাহা হউক, এই বধূগ্রামে অবনীশচন্দ্র বসু নামে একজন প্রজারঞ্জক

জমিদার ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা অমরীশচন্দ্র ব্যতীত নিকটাত্মীয় আর কেহ ছিল না; সুতরাং বিষয় রক্ষাদির ভার অমরীশ বাবুর উপর পড়িল। অমরীশ বাবু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে একটু তীব্রদৃষ্টি রাখিতেন। তিনি নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মল কুমারের বিষয়াদি কতক পরিমাণে নিলামের ডাকে নিজের নামে কিনিয়া লইলেন। তবে কতক সম্পত্তি নির্ম্মলের রহিল। গ্রামের জমিদারী, দু'একখানা তালুক, প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, প্রজার ভালবাসা, বংশখ্যাতি নির্ম্মলের রহিল।

অবনীশ বাবুর বিধবা স্ত্রী অন্নপূর্ণার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মলের বিদ্যাশিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠন হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা উচ্চ কুলোদ্ভবা, শিক্ষিতা মহিলা। তিনি নির্ম্মলের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া দশমবর্ষীয়া বধূ বিজলিকে ঘরে আনিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়াছিলেন।

এখন নির্ম্মলের বয়স বিংশতি বৎসর। তাঁর চেয়ে বিজলি তিন বৎসরের ছোট। বিজলির রূপে নির্ম্মলের হৃদয় সুখপরিপ্লুত। কিন্তু তা'র রূপের চেয়ে গুণ বেশী। সে বড়মানুষের মেয়ে হইয়াও গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে

ঘৃণা বোধ করে না—শ্বাশুড়ীর যত্নসেবা করিতে কখন অবহেলা করে না—কাঙ্গাল,গরীবকে অর্থ বা আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে কখন পরাঙ্মুখ হয় না। স্বামী ও শ্বাশুড়ীর প্রতি তাহার ভালবাসা ও ভক্তি, গ্রামের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

বিজলি চলিয়া গেলে পর নির্ম্মল, গঙ্গাবক্ষ পানে চাহিয়া একাকী ছাদে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে দেখিলেন, একখানি ছোট বজরা তাঁহার অট্টালিকা-সংলগ্ন খিড়্কির ঘাট পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে পাল তুলিয়া ছুটিল। উন্মুখ হইয়া দেখিলেন, বজরার গবাক্ষে বিজলি বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধ-উৎক্ষিপ্ত জলভারাকুল নয়ন ব্যগ্রভাবে সৌধচূড়ায় কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মলের চোখে জল আসিল—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া নির্ম্মল আবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বিজলি গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে তাঁহার পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিলিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রপদে সৌধচূড়া হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বিতলে আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির ধারে একটি বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া

বালক বলিল, "নূতন দাদা, মা তোমায় ডাক্‌ছে—একবার এস।"

নির্ম্মল বলিলেন, "কেন,—যাচ্ছি।"

নির্ম্মল তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "বাবা নির্ম্মল, ওদের বাড়ী বড় বিপদ; তুমি এখনি যাও।"

নির্ম্মল দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, কি হয়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সোহাগের বাপ বুঝি বাঁচে না।"

"যাইতেছি" বলিয়া নির্ম্মল নীচে ছুটিয়া আসিলেন। ঘাটের ধারে আসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু বজরা কোথাও দেখা গেল না। বজরা তখন বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। নির্ম্মল ক্ষণকাল যেদিকে বজরা গিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল শূন্যহৃদয়ে, ক্ষুব্ধান্তঃকরণে গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁর মায়ের কাছে সেই বালক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রার্থনাও মনে পড়িল। বালকের বাড়ী আনন্দপুরে; তথায় যাইতে হইলে নৌকাপথই প্রশস্ত। নির্ম্মল তাই নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

নির্ম্মলের একখানি বজরা ও দুইখানি ছোট নৌকা ছিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশিতে বিজলিকে বজরায় লইয়া গঙ্গার উপর নির্ম্মল কখন কখন বেড়াইতেন। নিজে হাল্ ধরিতেন, কখন কখন গান করিতেন। বিজলি কাছে বসিয়া গান শুনিত; দাসীরা দাঁড় টানিত। আর কেহ থাকিত না। বজরা নির্ম্মলের বিলাসের সামগ্রী। সেই বজরা, আর সেই বিজলি এখন কতদূরে!

বালককে সঙ্গে লইয়া নির্ম্মল একখানি নৌকায় উঠিলেন। ঘাট ছাড়িয়া নৌকা দক্ষিণদিকে অনুকূল স্রোতের

মুখে ছুটিল; এবং সত্বর আনন্দপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল।

আনন্দপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। বধূগ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশৈক দূরে অবস্থিত। নিৰ্ম্মলকুমার দিবসে এই পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া থাকেন। রাত্রিতে অথবা সঙ্গে লোক থাকিলে সচরাচর নৌকাপথই অবলম্বন করিতেন।

ঘাটের সন্নিকটেই সোহাগের বাপের বাড়ী। পথে যাইতে যাইতে নিৰ্ম্মল, বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম, তোমার কেদার জেঠা কি তোমার বাপ্‌কে দেখিতে এ'সেছিলেন?"

হেম বলিল, "না, ও বাড়ীর কেউ দেখ্‌তে আসেনি। মা কেবল কাঁদছেন।"

বালক চুপ করিল। বালকের নাম হেম, বয়স দশ বৎসর মাত্র। অতঃপর দুইজনে একটা একতল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটা পুরাতন, বেমেরামতি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কক্ষ সকল অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন; প্রাঙ্গণে ময়লা, বারাণ্ডায় আবর্জ্জনা।

অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিৰ্ম্মল

দেখিলেন, সোহাগের বাপ্ একটা পালঙ্কের উপর শুইয়া রহিয়াছেন, আর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পত্নী ও কন্যা পরিচর্য্যা করিতেছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া সকলেরই একটু ভরসা ও আনন্দ হইল। নির্ম্মল, মুমূর্ষুর পার্শ্বে বসিয়া একবার নাড়ী টিপিলেন, একবার পায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন; পরে ডাক্তার আনিতে নৌকার মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

রোগীর চৈতন্য ও বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। সে বলিল, "বাবা নির্ম্মল, এখন ডাক্তার আসিয়া আমার কি করিবে? এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন। জগতে আমার বন্ধুর মত বন্ধু বলিতে কেহ নাই। তোমার মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী সংসারে বিরল; তাই তোমায় ডাকাইয়াছি। বাবা, এ সময় যদি আমার প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে আমি সুখে মরিতে পারি।"

নির্ম্মল বলিলেন, "কালী খুড়ো, আমার নিকট আপনি এত সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? আপনার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

কালী বাবু বলিলেন, "বাবা, আমার জীবনের কাহিনী সকলই জান। মদ খাইয়া, মকর্দ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয়

নষ্ট করিয়াছি। সমস্তই কেদার নিয়েছে। বাপের অগাধ বিষয়ের সামান্যই এখন আছে। আছে কিনা তাহাও ঠিক জানিনা। আজ দুইমাস শয্যাগত, কিছুই দেখি নাই। কোনখান্ হইতে এক পয়সাও পাই নাই। স্ত্রীর গহনা বেচিয়া খাইতেছি ও নিজের চিকিৎসা করাইতেছি।”

কালীবাবু নীরব হইলেন; সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণপরে মন একটু শান্ত হইলে তিনি বলিলেন, “সোহাগের বিবাহ দিব বলে কিছু টাকা রাখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাও মদ ও মকর্দ্দমায় নষ্ট হইয়াছে। এখন আমি নিঃস্ব। যখন অর্থ ও আয়ু দুই ফুরাইল, তখন আমার জ্ঞান জন্মিল। এ জ্ঞান কেবল আমায় যাতনা দিতে আসিয়াছে। এক্ষণে তুমি ভিন্ন এ অনাথ বালক বালিকার উপায়ান্তর নাই। আমার স্নেহের সোহাগ ও হেমকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। দেখো, বাবা, তারা যেন এক মুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া না বেড়ায়।”

নির্ম্মলের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, সেই কালীনাথ মিত্র—যাহার প্রতাপে আনন্দপুর একদিন কাঁপিত,—সেই কালী খুড়ার আজ এই দশা! যৌবনে পিতার

সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়া কালী বাবু বাসনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস কালে কতক-গুলি বন্ধু জুটিয়াছিল; তাহাদের নিকট মদ খাইতে শিখিয়া গ্রামে আসিয়া খোলা ভাঁটি খুলিলেন। মধুর গন্ধে চারি-দিক হইতে মক্ষিকা আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সরিক কেদার বাবুর সঙ্গে এক কাঠা জমি লইয়া মকর্দ্দমা বাধিল। সেটা চুকিতে না চুকিতে একটা ভাঙ্গা প্রাচীর লইয়া মকর্দ্দমা লাগিল। এইরূপে আজীবন মকর্দ্দমা চলিল। সঞ্চিত অর্থ সত্বর ফুরাইয়া আসিল। অবশেষে ঋণ করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, মদ ও মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। মধুভাণ্ড শূন্য হইলে মক্ষিকানিচয় সরিয়া পড়িল! প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইবার সম সময়ে মকর্দ্দমার প্রবৃত্তি মিটিল। মদ ও মকর্দ্দমায় আজীবন ব্যস্ত থাকিয়া, এক্ষণে সন্তান সন্ততিদিগকে অকূলে ভাসাইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাবিচারকের নিকট সমুপস্থিত হইবার জন্য কালীনাথ যাত্রা করিলেন।

নির্ম্মলকে নীরব দেখিয়া কালীবাবু একটু উদ্বিগ্ন হই-লেন। বলিলেন, "বাবা, এদের ভার নিতে ইতস্ততঃ করিতেছ? তুমি সহায় না হইলে এরা যে অকূলে

ভাসিবে, বাবা! আর যে আমার কেহ নাই—ভগবানও যে আমায় ছেড়েছেন।”

নির্ম্মল বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমার যতদূর সাধ্য, ছেলেদের জন্য আমি ততদূর করিব। আজ হইতে আমি ইহাদের ভাই বোন্ বলে গ্রহণ করিলাম। যতদিন আমার এক মুঠা অন্নের সংস্থান থাকিবে, ততদিন এরাও খাইতে পাইবে।”

মুমূর্ষু কম্পিত কণ্ঠে বলিল,' “বাবা, তুমি চিরসুখী হও, ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন। তুমি ইহাদের রহিলে, আর এদের কিছুই রহিল না। আর—আর—যে কখন আমায় তিরস্কার করে নাই, কটু বলে নাই, কখন অপ্রসন্ন মুখ দেখায় নাই, সেই অনাথিনী বুড়ীকে একটু দেখিও।”

কালীনাথের কণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া আসিল—ক্রমে বাক্-রোধ হইল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থারই প্রতীক্ষা হইতেছিল। নির্ম্মলের আহ্বানে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পৌঁছিল। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে মুমূর্ষুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গার ঘাটে আনা হইল।

জাহ্নবীনীরে দেহ অন্তর্জ্জলি করা হইলে মুমূর্ষু ভাবিল, "এই পবিত্র তোয়ে কি আমার পাপরাশি ধৌত হ'বে? ভগবান্, আজীবন কখন তোমায় ডাকি নাই, ব'লে দেও প্রভু, ঐ উপরের আকাশে তুমি আছ কি না, আর এই নীচের জল তোমার পদ-নিঃসৃতা ভাগীরথী কিনা? যদি তাই হয়, তা'হলে তোমার পাদোদক সর্ব্বাঙ্গে মেখে, তোমার পানে চেয়ে মরিতে পারিলে আর ভয় কি প্রভু!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিজলিকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া বজরা চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিল। মাঝিদের হাতে বিজলি একখানা পত্র দিয়াছিল। নির্ম্মল ব্যগ্র হইয়া পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িলেন,—

"আমার জীবন সর্ব্বস্ব!

তোমায় ছাড়িয়া আসিয়া ভাল করি নাই। সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও কান্নার বিরাম নাই। মায়ের মুখ, ভাইয়ের মুখ কিছুই তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলাইতে পারিতেছে না। প্রাণটা যেন

শূন্য—শুধু হাহাকারময়। দু’দিন এখানে থাকিলে যদি মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে দাসী ছুটিয়া গিয়া সত্বর শ্রীচরণে উপস্থিত হইবে। ইতি

ব্যাকুলা বিলি।”

নির্ম্মল একবার, দুইবার, দশবার পত্রপাঠ করিলেন। অতৃপ্ত নয়নে পত্র পানে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষুর জলে পত্র সিক্ত হইল: অবশেষে পত্রখানি বুকে ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠ ও কান্নার পর চিন্তা আসিয়া জুটিল। চিন্তায় কিছু সুখ পাইলেন। উঠিয়া গবাক্ষে দাঁড়াইলেন। নীচে জ. বীর জল হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। আশা ও উৎসাহে নির্ম্মলের প্রাণ উছলিয়া উঠিল। ভাবিলেন, “বিলি আমার জন্য এত কাতর? দু’দিন পরে আবার সে আসিবে?”

এমন সময় মা ডাকিল; পুত্র ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউমা কি লিখিয়াছেন আমায় বলিলে না ত?”

মায়ের ইচ্ছা চিঠিখানা প’ড়ে শুনান হয়,—বুড়ীদের দশাই ঐ।

ছেলে আদুরে, সুতরাং লজ্জাহীন; স্বচ্ছন্দে চিঠিখানা মায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। মা চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া পড়িলেন। তা'রপর পিছন ফিরিয়া, লুকাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। অবশেষে গলা পরিষ্কার করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি কেন বাবা, একবার বিশালপুর যাও না?"

নির্ম্মল বলিলেন, "পরের বাড়ীতে থাকিতে আমার বড় কষ্ট হয়—আমি কোথাও যেতে পারিব না।"

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন,পুত্র স্থানান্তরে যাইতে কেন অসম্মত। তবু বলিলেন, "তুমি না হয় বজরায় থাকিও।"

নির্ম্মল উত্তর করিলেন, "ঝড় তুফানের দিন বজরায় থাকিতে সাহস হয় না।"

ফাল্গুন মাসে ঝড় তুফান! অন্নপূর্ণা আর কিছু বলিলেন না। শুধু গর্ব্বভরে প্রীতমনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, "আমায় ছেড়ে বাছা, বউকেও দেখিতে যেতে চায় না।"

এমন সময় হেম রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। উভয়ে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, হেম?"

হেম বলিল, "নূতন দাদা, শিগ্‌গির এস, দিদি বুঝি বাঁচে না।"

বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া নির্ম্মল অশ্বশালার দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্বহস্তে অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি হেমকে লইয়া লম্ফত্যাগে উঠিলেন। এবং অত্যল্প কাল-মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কালী খুড়ার গৃহ সন্নিকটে সমুপস্থিত হইবা মাত্রই অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং গৃহমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধূলার উপর সোণার সোহাগ গড়াগড়ি যাইতেছে, আর পাশে বসিয়া সোহাগের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

সোহাগের আমরা পরিচয় দিই নাই। তাহার নাম শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু ভাল করিয়া দেখি নাই। তাহার বয়স তের বৎসর মাত্র। অযত্নরক্ষিত মলিন বস্ত্রাচ্ছন্ন রূপ-রাশি এই বয়সেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নববর্ষ সমাগমে যেমন বৃক্ষদেহ নব বিল্বপত্রে সমাচ্ছন্ন হয়, তেমনই নব-যৌবন-সম্ভাষণে সোহাগের দেহতরু নব শোভায় সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে উদ্যানমধ্যে প্রস্ফুটিতপ্রায় মল্লিকা দেখিলে এই বালিকার রূপের কথা মনোমধ্যে স্বতঃই

জাগিয়া উঠে। জাগিলে তাহাকে স্পর্শ করিতে সাধ হয়। স্পর্শলাভ ঘটিলে মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতে বাসনা হয়। জীবনে যখন যাহা কিছু আশা করিয়াছিলাম, যখন যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, এই বালিকাকে দেখিলে সেই অতৃপ্ত বাসনার স্মৃতি হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রাবৃট্ কালে দিবাবসানে সুদূর আকাশপ্রান্তে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনোমধ্যে যেমন এক অস্ফুট, অব্যক্ত বাসনার সঞ্চার হয়, তেমনই এই বালিকার সরল কোমলতাপূর্ণ মুখ খানি পানে চাহিয়া দেখিলে হৃদয়ে কেমন এক অভিনব সাধের সৃষ্টি হয়, বহুদিনের বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষার কথা মনোমধ্যে স্বতঃই জাগিয়া উঠে।

সোহাগের অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মল বুঝিলেন যে, সোহাগ মূর্চ্ছিত হইয়াছে। ঘাড়ে, মুখে জলের ছিটা দিতে দিতেই সোহাগের চৈতন্য সঞ্চার হইল। পিতার মৃত্যুদিনে এই রোগ সূচিত হয়। আজ হইতে তাহা বদ্ধমূল হইল।

সোহাগকে সুস্থ করিয়া নির্ম্মল, কেদার জ্যেঠার বাড়ীতে গেলেন। জ্যেঠা তখন বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া একজন খাতকের নিকট পাওনা হিসাব করিতেছিলেন। খাতক কিছু সুদ ছাড়িবার জন্য কেদার

জ্যেঠাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল ; কিন্তু জেঠা, মোলায়েম হাসির সহিত খাতককে বুঝাইতেছিলেন যে, সুদ ছাড়িলে তিনি খাইতে না পাইয়া মারা যাইবেন। এমন সময় সেখানে নির্ম্মল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যেঠা, "এস, বাবা এস" বলিয়া আদর করিয়া নির্ম্মলকে বসাইলেন।

জ্যেঠার বাড়ীটী বেশ, অবস্থাও খুব ভাল। চক্‌মিলান বাড়ী, সাম্‌নে পূজার দালান, তাহাতে মহামায়ার পূজা হয়। অন্দর মহল স্বতন্ত্র। বৈঠকখানা, উমেদার খাতক ও প্রজায় সতত পরিপূর্ণ।

জ্যেঠার কিছু তালুক মুলুক আছে। তেজারতিও বেশ চলে। যে খাতক একবার দু'টাকা লইয়াছে সে আর দেনা শোধ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাই বলিয়া জ্যেঠা অধার্ম্মিক নহেন। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, গাত্রে হরিনামাবলী, কণ্ঠে তুলসীর মালা। সুতরাং এই ত্রিবিধ আয়ুধসমন্বিত জ্যেঠার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

তাঁহার তিন সংসার, তন্মধ্যে দুই পত্নী বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠা নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইয়াছেন। মধ্যমার একটী পুত্র।

কনিষ্ঠার দুইটী কন্যা। পুত্রের নাম হরি কিঙ্কর। কিঙ্কর বিবাহিত, বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম।

জ্যেঠার বৈঠকখানাটি সেকালের ধরণে সাজান। ঢালা বিছানা, তার উপর একখানি ছোট গালিচা। গালিচার উপর একটী তাকিয়া-বালিশ। তদগ্রে জ্যেঠা উপবেশন করেন। গালিচার উপর বড় একটা কাহারও বসিবার হুকুম নাই। তবে নির্ম্মলের কথা স্বতন্ত্র। জ্যেঠা তাঁহাকে আদর করিয়া গালিচার উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিলেন।

কেদার জ্যেঠা, দন্তহীন বদনে আকর্ণ হাস্য বিস্তার করিয়া বলিলেন, "আজ আমার ঘর আলো হ'ল, বাবা। তোমরা সব ছেলে মানুষ, তোমরা সব কি জান্‌বে। (ক্রন্দনের সুরে) আজ যদি তোমার স্বর্গীয় পিতা বেঁচে থাকৃতেন, তা'হ'লে (চ'খের জল মুছিয়া)—আহা! তিনি আমায় কত ভাল বাসতেন।"

"কেদার জ্যেঠা, একটা কথা আছে, গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।"

জ্যেঠা একটু থতমত খাইলেন। বলিলেন, "তা বই কি, কথা থাকৃবেইত। স্বর্গীয় কর্ত্তা যে কত কথা আমায় বলতেন!"

জ্যেঠার ইঙ্গিতে অনুচরবর্গেরা সারিয়া পড়িল। তখন নির্ম্মল কুমার কালী খুড়ার বিষয়ের কথা পাড়িলেন এবং গোলমাল মিটাইয়া লইতে জ্যেঠাকে অনুরোধ করিলেন। জ্যেঠা আকাশ হইতে পড়িলেন এবং কালী খুড়ার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে নামাবলীর অংশ বিশেষ দ্বারা শুষ্ক ধীরে ধীরে চক্ষু পরিষ্কৃত করিয়া বলিলেন, "গোলমাল কি, বাবা, গোলমাল কা'কে বলে তা' ত আমি জানি না। আমি হরিনাম জপি, আর দু'টো আলোচাল খাই। হরিবল, হরিবল।" ইত্যাদি।

নির্ম্মল, জ্যেঠাকে সবিশেষ চিনিতেন। তিনি সে কথায় না ভুলিয়া বলিলেন, "যিনিই গোল করুন, এখন গোল করিতে হইলে আমার সঙ্গে গোল করিতে হইবে। আপোষে মিটাইলে ভাল হয়।"

আরও কিছু কাথাবার্ত্তা হইল। নির্ম্মলের যুক্তি তর্কের উত্তরে জ্যেঠা হরিনাম শুনাইলেন। অবশেষে নির্ম্মল একটু বিরক্ত হইয়া বিদায় হইলেন।

নির্ম্মল চলিয়া গেলে কেদার, পুত্র হরিকিঙ্করকে বলিলেন, "কালীর যাহা লইয়াছি তাহার কিছুই ছাড়িতে পারিব না,—নির্ম্মল বলিলেও না, ভগবান বলিলেও না।

নির্ম্মল সমাজপতি,সে রাগিলে আমার ক্ষতি হইতে পারে ; তা'কি ক'রব ? তাই ব'লে বিষয় ছাড়িতে পারি না। সে যা'হোক এখন কালীর বিধবার সঙ্গে একটু আত্মীয়তা দেখাতে হবে—কেন, তা' পরে বলিব।"

পুত্র বলিল, "নির্ম্মল বাবু একটু শাসাইয়া গিয়াছেন। কালী খুড়ার বিষয় লইয়া নির্ম্মল বাবুর সহিত গোল বাধিতে পারে।"

কেদার বলিলেন, "তাহাতে ডরাই না। যাহা লইয়াছি তাহা আইনসিদ্ধ করিয়া লইয়াছি। সহজে কিছু ছাড়িব না—ছাড়াইতেও কেহ পারিবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা একবার বিলিকে দেখিতে যাইব। সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও যাইতে হইবে ; অসম্মত হইলে এ অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাঠ বন্ধ করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর দেখি না।

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রামে বিলির পিত্রালয়। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া তাহাকে আমরা বিশালপুর নামে অভিহিত করিব। এ গ্রাম মুর্শিদাবাদের সন্নিকট এবং বধূগ্রাম হইতে নৌকাপথে দুই দিনের পথ।

বিলির পিতা নাই। ভ্রাতা রমেশচন্দ্র এক্ষণে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর। বিধবা মাতা সংসারে স্পৃহাশূন্যা। রমেশচন্দ্র দুরন্ত জমিদার। কেহ তাঁহাকে ভয় করে, কেহবা ভালবাসে; তাঁহার নাম যশ খুব,—নিকটে বা দূরে সকলেই তাঁহাকে চিনে।

বিলি মাকে দেখিল, ভাইকে দেখিল; কিন্তু তাহার মন সুস্থ হইল না। স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্ফট্ করিতে লাগিল। এমন সময় ভাইয়ের ব্যায়রাম বাড়িল। তখন বিলি ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃসেবায় মন দিল।

রমেশের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহার শ্যালক ও শাশুড়ী আসিল, মাতুলালয় হইতে আত্মীয় স্বজন আসিল, যে যেখানে কুটুম্ব বা সুহৃদ্ ছিল, সে সেখান হইতে ধনবান আত্মীয়কে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। গ্রামস্থ বৈদ্য ও

ডাক্তারে গৃহ পরিপূর্ণ হইল—দূরদেশ হইতে চিকিৎসক ও বৈদ্য আহুত হইল—বহরমপুর হইতে সাহেব ডাক্তার আনীত হইল।

এই গোলমালের ভিতর নির্ম্মলকে প্রত্যহ পত্র লিখিতে বিলি বিস্মৃত হইত না। ভাইয়ের রুগ্ন শয্যা পার্শ্বে বসিয়াও বিলি সতত নির্ম্মলকে ভাবিত। তাঁর কথা যে আপনা হইতেই সতত মনে আসিত; চেষ্টা করিয়া ভাবিতে হইত না। নির্ম্মলের পত্রও প্রত্যহ আসিত। সব কাজ ফেলিয়া বিলি আগে নির্ম্মলের পত্র পড়িত।

রমেশের যখন শ্বশুর বাড়ী আছে তখন তাঁহার বিবাহ ঘটিয়া থাকাও সম্ভব। স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না সুন্দরী, বয়স বিংশতি বৎসর। পিত্রালয়, সন্নিকটস্থ রুদ্রপুর গ্রামে। জমিদারগৃহিণীর যেমন রূপ ও গর্ব্ব থাকা উচিত, জ্যোৎস্নারও তেমনই ছিল। তবে গরবটা যেন কিছু বেশী বেশী। তা' হইবারই ত কথা। যে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন ঐশ্বর্য্য দেখে নাই, সে রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা মধ্যে অবস্থান করিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিলে কেন না গর্ব্বিত হইবে?

জ্যোৎস্নার ভাইটিও অনেকটা ভগ্নীর মত। হারাণচন্দ্র

কখন অট্টালিকায় বাস করে নাই; সুতরাং ভগ্নীর নিকট আসিলে অট্টালিকাবাসীর চাল চলন অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইত। হারাণচন্দ্রের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। সে নিতান্ত মূর্খ নয়—কিছু লেখা পড়া জানিত; নাটুকে কথা অনেক শিখিয়াছিল। চারিবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া হারাণ দুইখানি নাটক ও একখানি নবেল লিখিয়াছিল। কিন্তু জগতে সেই অত্যুপা- দেয় গ্রন্থ কয়খানি প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ভগ্নী জ্যোৎস্না তাহা অনল দেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ক্ষোভে, অভিমানে হারাণ তদবধি পুস্তক লেখা বন্ধ করিয়াছিল। না জানি সে অভিমানের ফলে বঙ্গ সাহিত্যের কি অনিষ্ট সংঘটিত হইল। তা' বাঙ্গালার ভাগ্যে যাই হউক, হারাণ বই লেখা বন্ধ করিল। বন্ধ করিয়া একটি "ক্লব" খুলিল। সেখানে চাঁদা দিলে সকল শ্রেণীর, সকল জাতির লোক প্রবেশ করিতে পাইত। এই "ক্লবে" রাজনৈতিক, সমাজিক ব্যাপার সকলই আলোচিত হইত—সুরা, পক্ষী, চা উদরস্থ হইত। এখানে সভ্যেরা দাঁড়াইয়া গ্লাস হস্তে "হেল্‌থ" পান করিতেন—সিগারেট মুখে চেয়ারে বসিয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিতেন—মেজের

উপর গড়াগড়ি দিতে দিতে উদরস্থ সুধা উদ্‌গীরণ করিয়া বসুধা সিক্ত করিতেন।

ক্লবের সভাপতি হারাণচন্দ্র দেশপূজ্য। কেন না তিনি বিশালপুরের জমীদার ধনবান রমেশ বাবুর শ্যালক। হারাণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়; তার উপর ভগ্নীর সাহায্যে হারাণের বাবুগিরিটা স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছিল।

হারাণ ভাবিত, তাহার মত রূপবান পুরুষ দেশে বিরল। সেই কারণেই হউক, অথবা যে জন্যই হউক সে মনে করিত যে, প্রত্যেক রমণী তাহার রূপে মুগ্ধা। যদি পথিমধ্যে বা বাতায়নস্থিত কোন রমণী ঘটনাক্রমে একবার হারাণের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে হারাণ তাহার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিত, "দেখ, আমাকে দেখে মেয়েটা একেবারে মরেছে," ইত্যাদি।

হারাণ, মাকে সঙ্গে লইয়া ভগ্নীপতিকে দেখিতে আসিল। রুগ্নভগ্নীপতির শয্যাপার্শ্বে হারাণ যাহা দেখিল, সে তাহা ভুলিল না; অনিমেষ নয়নে বিলির অসামান্য সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়া রহিল। বহুদিন পূর্ব্বে হারাণ বিলিকে একবার দেখিয়াছিল। কিন্তু সে বিলি, আর এ

বিলি? অনেক প্রভেদ। প্রতিমার খড়ে মাটী লেপিতে দেখিয়াছিলাম, আর আজ সেই প্রতিমা নানাবর্ণচিত্রিতা পুষ্পালঙ্কার-ভূষিতা দেখিলাম। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ দেখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে শারদাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিলাম। একদিন যে স্থান তৃণাবৃত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা পুষ্পময় উদ্যানে পরিণত দেখিলাম। হারাণ অনিমেষ নয়নে বিলির পানে চাহিয়া রহিল।

হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বিলি, বউ দিদির কাছে উঠিয়া গেল। জ্যোৎস্না তখন কক্ষান্তরে কৌচের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। বিলিকে দেখিয়া জ্যোৎস্না বই রাখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলে এলি যে?"

বি। লোক এসেছে।

জ্যো। কে?

বি। হারাণ বাবু।

জ্যো। দাদাকে দেখে আবার লজ্জা?

বি। কি জানি ভাই, কেমন লজ্জা এ'ল।

জ্যো। দেখিস্, এর পরে যেন নিজের দাদাকে দেখে লজ্জায় জড়সড় হ'সনে।

বি। লজ্জাটা ত' আর হাত ধরা নয়।

জ্যো। না সেটা পায়ে ধরা; পায়ে ধর্‌লে তবে লজ্জা ভাঙ্গে, না?

বি। সেটা ভাই তুমি ভাল জান। দুনিয়াটাকে পায়ে ধরিয়ে এখন লজ্জা ছেড়েছ।

জ্যো। লজ্জা করিলে কি জমিদারী চলে? দেওয়ান, নায়েবকে কে হুকুম দিবে?

বি। কেন দাদা?

জ্যো। ছোট খাট জমিদারী হ'লে পুরুষে চালাতে পারে। তুই এ সব কি বুঝবি, বল্‌।

বি। আঃ বাঁচলুম্‌! আমার পিতার জমিদারী তোমার মত দেওয়ান পেয়ে এতদিনে রক্ষা হইল।

উভয়ে যেন পরস্পরের প্রতি কেমন একটু অপ্রসন্ন হইল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিলির অপরাধ এই যে, সে হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। বিলি কোন কালেই জ্যোৎস্নাতে অনুরক্ত ছিল না। জ্যোৎস্নার লজ্জাহীনতা দেখিয়া বিলি বরং বিরক্ত হইত।

বিলি উঠিয়া মায়ের কাছে গেল। মা তখন হরি

নামের মালা লইয়া ব্যস্ত। দু' চারিটা কথার পর বিলি নিজের কক্ষে উঠিয়া আসিল। পিত্রালয়ে সে দুইটী ঘর পাইত; এখনও তাহা পাইয়াছিল। বসিবার ঘরটী বেশ সুসজ্জিত। কাষ্ঠাসন আছে. পালঙ্ক আছে—পালঙ্কের উপর কার্পেট পাতা বিছানা আছে। বড় বড় আয়না, ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি দেয়ালের গায় বিলম্বিত রহিয়াছে। কোন খানি দশ মহাবিদ্যা, কোন খানি বা দশ অবতারের ছবি; কোন খানি প্রেমময় চৈতন্যদেবের, কোন খানি বা কর্ম্মময় কংসারি শ্রীকৃষ্ণের। ছবি ছাড়া ঘরে আরও অনেক জিনিস আছে;—আলমারি, দেরাজ, আন্‌লা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল নাই।

ঘরে আসিয়া বিলি একজন দাসীকে ডাকিল। রেবতী নাম্নী একজন পরিচারিকা বিলির সঙ্গে বধুগ্রাম হইতে আসিয়াছিল। বিগতযৌবনা হইলেও রেবতী বড় রসবতী। বুঝি বা যৌবনের ঝঙ্কার শ্রুত হয় না বলিয়াই রসের যোগান ধার করিয়া আনিতে হইতেছে। আঁখিতে সকল সময়েই বিলোল কটাক্ষ বিরাজমান—ওষ্ঠোপরি রসের হাসি সতত কম্পিত। পুরুষ সমক্ষে কটাক্ষটা যেন আরও মর্ম্মঘাতী হইত, হাসিটা যেন আরও মিষ্ট হইত। দুর্ভাগ্য

অথবা সৌভাগ্য বশতঃ তাহার কটাক্ষে পাখী বা ছাগল ছাড়া মানুষ মরিত না, হাসিতে ডোবার জল ছাড়া আর কিছু গলিত না।

রেবতী শ্যামবর্ণা, কৃশা। বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। চক্ষু দুটি আয়ত। শুভ্র দন্ত, মিশি-রঞ্জিত—যেন সাদা কাগজে কে কালির আঁচোড় পাড়িয়াছে। কেশ, নিতম্ব-বিলম্বিত। মদনমন্দিরদ্বয় এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে। তবে চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

রেবতী আসিল। দাদার কক্ষে কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্য বিলি তাহাকে পাঠাইয়া দিল। রেবতী গিয়া দেখিল, রমেশের কাছে হারাণ বসিয়া রহিয়াছে। হারাণের উপর দু' চারিটা ভীষণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে রেবতী ক্রুটী করিল না। পাছে সেই কটাক্ষ-অনলে হারাণ দগ্ধীভূত হয়, এই আশঙ্কায় কিছু হাস্যসুধাও বর্ষিত হইল। হারাণ ভাবিল, বুঝি বা সে, ওয়াটার্লু বা পাণিপথ জয় করিল।

রেবতী আসিয়া বিলিকে সংবাদ দিল। বিলি তখন অনন্যকর্ম্ম হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে বিলি দাদার কাছে আসিয়া বসিল। রমেশ-শয্যা-শায়িত; বিলিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ তুমি আসনি কেন, দিদি?"

বিলি। তুমি কি আমায় খুঁজেছিলে দাদা?

রমে। তোমায় আবার খুঁজিনি? তুমি ছিলে না বলে আমার যে কিছু খাওয়া হয় নি, বিজু।

বিলি দুধ গরম করিয়া আনিয়া দাদাকে খাওয়াইল। রমেশ বলিলেন, "জান না কি, তুমি না খাওয়াইলে আমার খাওয়া হয় না, বিজু? একটু আগে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ নিয়ে জ্যোৎস্না আমায় খাওয়াইতে আসিয়াছিল। অক্ষুধার অছিলায় আমি তাহা খাই নাই।"

এমন সময় হারাণ সেখানে আসিল। মাথার কাপড় একটু টানিয়া বিলি বসিয়া রহিল। হারাণ যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তাহা দেখিতে পাইল। বিলির লাজ-রঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া হারাণ আত্ম-হারা হইল,—সব ভুলিয়া

সেই মুখখানি পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হারাণের তীব্র দৃষ্টি বিলি অনুভব করিল; বিলি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ বলিলেন, "আবার কোথায় যাচ্ছ, বিজু?"

বিজু বসিল; তবে এবার ঘোমটায় মুখ সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিল। রমেশ বিস্মিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। হঠাৎ হারাণের পানে দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হারাণ, তুমি এখন বাহিরে যাও।"

অগত্যা হারাণ চলিয়া গেল। রমেশ তখন দেওয়ানকে ডাকাইলেন, দেওয়ান আসিলে বিলি কক্ষান্তরে গেল। রমেশ বলিলেন, "দেওয়ান, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁহারা আমায় দেখিতে আসিয়াছেন বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের স্থানাভাব আছে কি?"

দেওয়ান। আজ্ঞে না।

রমেশ। উত্তম, যাঁহারা আমায় দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের বলিও যে, এক্ষণে আমি বিশেষ কাতর। আমার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও আমার মহলে আসিতে দিবে না।

দে। হারাণ বাবুকেও না?

রমে। সকলের পক্ষে একই আদেশ।

দে। অন্দর মহলে প্রবেশ নিষেধ কি?

রমে। আত্মীয় স্বজনের পক্ষে অন্দর-মহল পূর্ব্ববৎ অবারিত রহিল।

দেওয়ান বিদায় হইল। বিলি আসিলে রমেশ বলিলেন, "বিজু, একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তা' আমায় মনে করাইয়া দিলে। এ বাড়ীতে লজ্জা-সরম ঠাঁই পায় না। স্ত্রীলোকদের যে লজ্জা করিতে হয় তা'ও আমার মনে ছিল না।"

বিলি কিছু বলিল না; মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। রমেশ যুবা পুরুষ। কিন্তু খর্ব্বকায় ও কুৎসিৎ-দর্শন। নিজে শিক্ষিত, এবং মেম রাখিয়া স্ত্রীকেও উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। লেখা পড়া শিখিয়া স্ত্রী বিলাস শিখিল; বিলাসের সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রী যাহা চাহিল, স্বামী সানন্দে তাহাই যোগাইলেন। অবশেষে স্ত্রী স্বাধীন হইল—পুরুষের সাম্‌নে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতে ঘৃণা বোধ করিল। তবে দয়া করিয়া অন্দর ছাড়িয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিল না। স্বাধীন হইয়া

জমিদারীর কার্য্য দেখিতে লাগিল; রোকড়-খতিয়ান না বুঝিয়াই নায়েব গোমস্তার কৈফিয়ৎ তলব করিল।

জ্যোৎস্না দরিদ্রের কন্যা হইলেও অসামান্যা রূপসী। রূপে সংসার মুগ্ধ হয়। যতদিন রূপের মোহ থাকে ততদিন আমরা দোষগুণ বিচারে অক্ষম হইয়া রূপের পানে চাহিয়া থাকি। তবে রূপের মোহে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়; সংসর্গে শয্যা-সঙ্গিনীর রূপের নূতনত্ব বিনষ্ট হয়—মোহ ক্রমে ঘুচিয়া যায়। রমেশের এক্ষণে মোহ ঘুচিয়াছে—তিনি রূপের-পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রমেশ এক্ষণে উপাসক ন'ন্—তিনি এখন সমালোচক।

রমেশ দুরন্ত ও বুদ্ধিমান; কিন্তু স্ত্রীর কাছে শান্ত ও অল্পভাষী। তিনি উন্নতচেতা ও আত্মসংযমী। তবে ক্রোধে কখন কখন আত্মহারা হইতেন।

সে কথা থাক্; এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

হারাণ রমেশের কক্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইল। হারাণ বলিল, "দত্ত মহাশয় কেমন আছেন?"

জ্যোৎস্না। তুমি দেখে এ'সো না।

হা। সেখানে আমার যাবার উপায় নাই।

জ্যো। কেন?

হা। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছি।

জ্যো। সে কি? কে তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছে?

হা। দত্ত মহাশয়।

জ্যো। কেন?

হারাণ সকল কথা বলিল—একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল। ক্রোধে জ্যোৎস্নার কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। বিলির উপরই রাগটা বেশী হইল। বলিলেন, "দাদা, তুমি আবার যাও; কোন চিন্তা নাই—আমি পিছু পিছু যাইতেছি।"

হারাণ ইতস্ততঃ করিল, যাইতে সাহসে কুলাইল না। কিন্তু বিলির সেই মুখখানি মনে পড়িল। হারাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না—উঠিল।

যে খণ্ডে রমেশ আছেন সে মহল দ্বিতল। উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই হারাণ বাধা পাইল। দেখিল, সিঁড়িতে প্রহরী। প্রহরী পথ ছাড়িল না। হারাণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথ রুদ্ধ কেন?"

প্র। হুজুরের হুকুম।

হা। আমার পক্ষেও?

প্র। সকলের পক্ষে।

হা। তবে কেমন করিয়া বাবুর কাছে যা'ব?

প্র। হুজুরের হুকুম হইলে পথ ছাড়িয়া দিব।

হা। আমি এখানে আটক রহিলাম—কেমন করিয়া হুকুম আনিব?

প্র। আমি আনাইতেছি।

প্রহরী, একজন দাসীকে প্রভুর নিকট পাঠাইল। যথা সময়ে অনুমতি আসিল। হারাণ, রমেশের কক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় বিজলী নাই। ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিল; যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথাও দেখিতে পাইল না।

হারাণের এ ব্যাকুলতা রমেশ লক্ষ্য করিলেন। একটু কর্ক্শ স্বরে বলিলেন, "কি জন্য এখানে এসেছ?"

হা। আপনি কেমন আছেন জানিবার জন্য জ্যোৎস্না আমায় পাঠাইয়া দিয়াছে।

র। তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন তখন তোমায় পাঠাইবার প্রয়োজন কি?

হা। তা' জানি না।

র। তিনি কোন্ কাজে ব্যস্ত?

হা। পিয়ানো বাজাইতেছেন।

র। উত্তম। তুমিত একটু পূর্ব্বেই আমায় দেখিয়া গিয়াছ, এর মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

হা। তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

র। আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া ডাক্তার-বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক সংবাদ পাইতে পারিতে ত?

হারাণ নিরুত্তর। তখন রমেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, হারাণ, তোমায় যখন প্রয়োজন হইবে তখন ডাকাইয়া পাঠাইব। না ডাকিলে বুঝিবে, তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। বুঝেছ ত? এখন যাও।"

হারাণ চলিয়া গেল। হারাণকে রমেশ বেশ চিনিতেন। হারাণের ভগ্নীকেও রমেশ যে একেবারে চিনিতেন না, এমন নহে; ইদানীং কতকটা চো'খ ফুটিয়াছিল। তবে ঘরের কথা পাছে বাহিরে যায়, এই ভয়ে রমেশ নীরব থাকিতেন। তদ্ভিন্ন এরূপ অবস্থায় গত্যন্তর কি?

পথিমধ্যে হারাণ, ভগ্নীর সাক্ষাৎ পাইল। জ্যোৎস্নাকে সকল কথা বলিল। রাগে জ্যোৎস্না ফুলিয়া উঠিল। স্কন্ধ

হইতে বস্ত্রাঞ্চল খসিয়া পড়িল ; কবরী হইতে দুই চারিটা গোলাপ ফুল, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল ; দাসদাসী সশঙ্কিত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া পলাইল। পদভরে হর্ম্ম্যতল কাঁপাইয়া, অলঙ্কারশিঞ্জিতে প্রতিধ্বনি উঠাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী স্বামীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া জ্যোৎস্না দেখিলেন, রমেশ মুদিত নয়নে শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। কক্ষে আর কেহ নাই। স্ত্রী ডাকিল, "রমেশ !"

কোন উত্তর নাই। শিক্ষিতা স্ত্রী, রুগ্ন স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আবার ডাকিল, "রমেশ !" এবারও কোন উত্তর নাই। বুদ্ধিমতী স্ত্রী বুঝিল, নিদ্রা কৃত্রিম ; তখন গর্ব্বস্ফীতা রমণী ক্রোধভরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রমেশের কক্ষে পরদিন জ্যোৎস্নার উদয় হইল না। রমেশও শান্তি পাইলেন। অষ্ট প্রহর জ্বরের যন্ত্রণার উপর মানসিক অশান্তি সহনাতীত। তাই সুখ ও শান্তির

আশায় তিনি সকল সময়েই বিজলীকে কাছে বসাইয়া রাখিতেন। বিজলী ঔষধ খাওয়াইত, পথ্য দিত; মাথা টিপিত, গল্প করিত। বিজলীর মত কেহ কিছু পারিত না; মামী বা শ্বাশুড়ী, মামাত বা পিসতুত ভগ্নীরা কাছে বসিয়া পরিচর্য্যা করিলে রমেশের ভাল লাগিত না। বিজলী যাহা করিত না, তাহা রমেশের পছন্দ হইত না।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিজলী নিজের ঘরে প্রত্যহ একটু বসিত। আজও যথা সময়ে ঘরে গিয়া পালঙ্কের উপর বসিল। নির্ম্মল কুমারের একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বিলির নিকট ছিল। একটী ক্ষুদ্র আধার হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া বিলি নির্নিমেষ নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষে জল আসিল। জল ক্রমে ছাপাইল, অবশেষে গণ্ড বহিয়া গড়াইতে লাগিল।

ছবি খানি আধার মধ্যে রাখিয়া বিলি চক্ষু মুছিল। একটী হস্তিদন্ত বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৌটা মধ্যে কয়েকখানি চিঠি ছিল। বিলি একে একে তাহা পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কত কাঁদিল; চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিল। চিঠি গুলি, নির্ম্মলের লিখিত; সুতরাং না কাঁদিয়া তাহা পাঠ করা বিলির পক্ষে অসম্ভব।

তারপর বিলি পত্র লিখিতে বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চ'খের জল মুছিতে মুছিতে বিলি পত্র লিখিল। নির্ম্মলকে সান্ত্বনা দিয়া, কাঁদিতে নিষেধ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বিলি পত্র সমাপ্ত করিল।

পত্র সমাপ্ত করিয়া বিলি দাদার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র প্রলয় বাধিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী কক্ষমধ্যে দ্বাদশ রবির তেজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা স্রোতে পীড়িত স্বামীকে প্লাবিত করিতেছেন। বিলিকে দেখিয়া প্রবাহ যেন বায়ুর সহায়তা পাইয়া আরও গর্জ্জিয়া উঠিল।

কক্ষে অপর কেহ নাই, জ্যোৎস্নার ভাব দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সরিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্না বলিতেছিলেন, "নিজের গৃহে পাইয়া যে অতিথিকে অপমান করে, আত্মীয় কুটুম্বকে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করে, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। যাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের বিপদের সময় আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সম্মানের পাত্র; বর্ব্বরের হস্তে কেবল তাঁহাদের নির্য্যাতন সম্ভব। এই গৃহ, (বিলির পানে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া) এই সংসার, পাপ-স্পৃষ্ট হইয়াছে। পাপ, লজ্জার আবরণ খুঁজে, ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে বিনা আবরণে

দাঁড়ায়। যাহাদের গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্য জীবন হইতে ভিন্ন পথাবলম্বী, তাহারা ভদ্রসংসারের মধ্যে প্রবেশ করিলে সংসারের সুখ, শান্তি বিনষ্ট হয়। এতদিন এ সংসারে সুখ শান্তি ছিল, অধুনা—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্না, আমার জ্বর বাড়িয়াছে, কোন কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না।"

জ্যো। উচিত কথা চিরকালই তোমার ভাল লাগে না।

র। গোলমাল বিরক্তিকর হইতেছে।

জ্যো। আমার কথায় তোমার চিরকালই বিরক্তিজন্মে। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগ্নীর কথা, অমৃত-বর্ষণ করে।

র। জ্যোৎস্না—

জ্যো। কি বল?

র। ধৈর্য্যের সীমা আছে।

জ্যো। আমায় তাড়াবে নাকি?

র। জ্যোৎস্না, তোমায় স্বাধীনতা দিয়াছি, আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ কর?

জ্যো। তুমি আমার ভ্রাতাকে দুরীভূত করিবে, আমায় পদে পদে অপমানিত করিবে, আর তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতে আসিলে আমি মন্দ হইলাম?

র। তোমার ভাই আমার কাছে না আসিলেই পারেন।

জ্যো। (ব্যঙ্গ স্বরে) গৃহস্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য। আমার পক্ষে কি হুকুম হয়?

র। জ্যোৎস্না, ক্ষান্ত হও—আমায় ক্ষমা কর, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

রোষভরে জ্যোৎস্না তখন কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বিলির পানে একবার জ্বালাময় কটাক্ষপাত করিয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না আপন কক্ষে গিয়া দ্বার, অর্গল-বদ্ধ করিলেন; দুই দণ্ড পরে দ্বার খুলিয়া হারাণকে ডাকাইলেন। হারাণ আসিলে ভাই ভগ্নীতে অনেক পরামর্শ হইল। নিম্নে তাহার কিছু নমুনা দিতেছি।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রত্যহ চিঠি আসে?"

জ্যো। প্রত্যহ আসে।

হারাণ। ঠিক জান?

জ্যো। অন্দরের সব চিঠি আগে আমার কাছে আসে, আমি আবার ঠিক জানি না?

হা। কাল চিঠি এলে আটক রাখিও।

জ্যো। তা'র পর ?

হা। তা'র পর আমার বিয়ে ত তোমার জানাই আছে।

জ্যো। দেখিও যেন কোন বিপদে পড়ো না।

হা। সে ভয় নাই ; এ ত আর কোন দলীল নয়।

জ্যো। যদি বিপদাশঙ্কা না থাকে তবে যা' ইচ্ছা করিও—এ কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে।

হা। তবে আর কি!

জ্যো। কিন্তু রেবতী ?

হা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

জ্যো। টাকার জন্য ভেব না, যত লাগে আমি দিব। যেমন করে পার বিলির সর্ব্বনাশ কর—তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাও ; তা'র পর তা'কে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে এ বাড়ী থেকে তাড়াব। আমার বাড়ীতে আমার অপমান, আমার ভাইয়ের অপমান! তা'র মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

শুধু তাই নয় ; জ্যোৎস্নার রাগের আরও একটা কারণ ছিল। জ্যোৎস্না এক সময়ে উপযাচিকা হইয়া নির্ম্মলের প্রণয় যাচিঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। লজ্জায়, রোষে জ্ঞানশূন্যা হইয়া

জ্যোৎস্না তদবধি অন্তরে অন্তরে পুড়িতেছিলেন। আজ বৈরিনির্য্যাতনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই জ্যোৎস্না আজ হিংসাময়ী পিশাচী।

পর দিন প্রাতে কতকগুলি পত্র আসিল। অন্দরের পত্র জ্যোৎস্নার নিকট প্রেরিত হইত। আজও তাই হইল। বিজলির নামে একখানা পত্র ছিল। জ্যোৎস্না সেই পত্র খানা রাখিয়া বাকী পত্রগুলা দাসীর হস্তে বিতরণের জন্য ভারার্পণ করিলেন।

বিলি সে দিন স্বামীর পত্র পাইল না। না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ানের নিকট রেবতীকে পাঠাইল। দেওয়ান কোন সংবাদ দিতে পারিল না।

অবশেষে বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু জলে চক্ষু ভরিয়া গেল। পত্র লেখা হইল না। চক্ষু মুছিয়া আবার লিখিতে বসিল। আবার জল আসিল; চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে চক্ষের জলে পত্র সিক্ত করিয়া বিলি পত্র সমাপ্ত করিল। সমাপ্ত করিয়া ডাক্ ঘরে দিবার জন্য রেবতীর হস্তে পত্র প্রদান করিল।

রেবতী পত্র লইয়া সদরে চলিল। পথিমধ্যে হারাণকে দেখিতে পাইয়া একটু দাঁড়াইল। তা'রপর মাথার কাপড় একটু টানিয়া, মিশি-রঞ্জিত দন্তে তাম্বূল-রাগবিলিপ্ত কৃষ্ণাধর টিপিয়া, একটু মধুর হাসি হাসিয়া হারাণের উপর কটাক্ষের উপর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। হারাণও একটু হাসিল। তা'র পর একটু আগু হইয়া হারাণ বলিল, "রেবতি, তোমার চোখ দুটি অতি সুন্দর।"

রেবতী গলিয়া গেল। এমন কথা অনেক দিন কেহ যে রেবতীকে বলে নাই।

হারাণ রেবতীকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। ঘরটি সদরে ; বেশ বড়, সুসজ্জিত। চেয়ার টেবিল, কৌচ, সোফা, ঘড়ি, আলমারি প্রভৃতির অপ্রতুলতা নাই। এক পাশে, সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। এক খানি কৌচের উপর রেবতীকে বসাইয়া হারাণ নিকটে বসিল। বিস্মৃত-প্রায় মনোহর সঙ্গীতের স্মৃতির মত যৌবনের সুখ-স্বপ্ন একে একে রেবতীর মনে জাগিয়া উঠিল। রেবতী ভাবিল, "এত দিনে মনের মত পুরুষ পাইলাম।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে আনিলে কেন? ওমা লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি?"

হারাণ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "রেবতি, তুমি কি সুন্দর! তোমার মত সুন্দর বুঝি তোমার মুনিব ঠাক্রুণও নন্।"

এবার রেবতী আহ্লাদে আটখানা হইল। চক্ষের তারা, স্বীয় কেন্দ্র ছাড়িয়া এমন ভাবে ঘুরিতে লাগিল যে, চক্ষের নিরাপদত্ব সম্বন্ধে সাতিশয় সন্দেহ জন্মিল; সুমধুর হাস্যে ওষ্ঠাধর এমনই ভাবে আকর্ণ বিস্তৃত হইল যে, মুখের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্য হারাণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হারাণ বলিল, "তোমার হাতে ওখানা কি, রেবতি?"

চক্ষু ও ওষ্ঠাধর স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইল। রেবতী উত্তর করিল, "চিঠি।"

হা। কার চিঠি?

রে। বউ দিদির।

হা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রে। ডাকে দিতে।

হা। কা'কে লিখেছেন?

রে। তা' জানিনা; ঠিকানা পড়ে দেখ।

হা। (পড়িয়া) নির্ম্মল কুমার বুঝি তোমার দাদা বাবুর নাম?

রে। হাঁ। আমি যাই—অনেক দেরি হ'ল, বউ দিদি কি মনে কর্‌বেন!

হা। তা' কষ্ট করে ডাক ঘরেই বা তোমার যাবার দরকার কি? টেবিলের উপর রেখে যাও, আমার চিঠির সঙ্গে ডাক ঘরে পাঠিয়ে দেব।

রে। আঃ বাঁচলাম্। বউ দিদির আবার কাউকে বিশ্বাস হয় না, আমাকেই ডাক ঘরে চিঠি নিয়ে যেতে হয়।

হা। এটা তাঁর অন্যায়। তোমার মত ভদ্র ঘরের যুবতী মেয়ে কেমন করে রাস্তায় বেরিয়ে চিঠি দিতে যায় বল দেখি।

রে। আমার কদর কি বউ দিদি বুঝেন? তা' হ'লে আর দুঃখ কি? এই রকম আমায় রোজ চিঠি নিয়ে যেতে হয়।

হা। প্রত্যহ পত্র যায়?

রে। তবে আর বল্‌ছি কি!

হা। ভাল কথা, প্রত্যহ তুমি পত্র আমার কাছে নিয়ে এস—আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

রে। তুমি কেন আমার জন্য এতটা করবে?

হা। আমি যে এই সুযোগে প্রত্যহ তোমায় এক বার দেখিতে পাইব ; তাই যে আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রেবতী বলিল, "আজ হ'তে আমি তোমার দাসী হ'লাম।" পরে পত্র রাখিয়া চলিয়া গেল।

রেবতী চলিয়া গেলে হারাণ পত্র খানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল ; তারপর খামের উপর একটু জল লাগাইয়া আবরণ উন্মোচন করিল। ফলে পত্র অপহৃত হইল, তদ্-বিনিময়ে হারাণের লিখিত অপর পত্র রক্ষিত হইল। বিলি, তোমার অশ্রুনিষিক্ত পত্র খানির দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। তোমার এই পত্র খানি পাইলে নির্ম্মলের কত আনন্দ হইত ! তাহা না পাইয়া যে পত্র নির্ম্মল পাইল তাহা পাঠান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলের দিন কাটিল।

বিলিরও কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানা ভিজাইয়া রাত্রি কাটাইল।

কষ্টের রাত্রিও প্রভাত হয়, এই দুঃখের রাত্রিরও অব-সান হইল। প্রাতে উঠিয়া ডাকের চিঠির আশায় বিলি পথ পানে চাহিয়া রহিল। অবশেষে চিঠি আসিবার সময় হইল ; বিলি তখন আকুল প্রাণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়া-ইতে লাগিল। ডাক আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য

লোকের উপর লোক বাহিরে পাঠাইতে লাগিল। ডাক আসিল; বিলির নামে একখানি পত্রও আসিল। ঠিক সেই পত্র খানা না পাইলেও বিলি একখানা পত্র পাইল। পত্র পড়িয়া বিলি স্তম্ভিত হইল। তাহাতে লেখা ছিলঃ—

আমার বিলিটুকু,

কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কাল তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। যদি মধ্যে মধ্যে পত্র না যায় তাহা হইলে রাগ করিও না। আমার অবসর কম—কাজ অনেক।

তোমারই———নির্ম্মল।"

পত্র পড়িয়া বিলির মুখ মলিন হইয়া গেল;—যেন ঊষালোকিত নদীবক্ষে হঠাৎ কালো মেঘের ছায়া পড়িল। সেই প্রেমময় স্বামীর এই পত্র! যাহার স্নেহপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র পড়িতে পড়িতে বিলির হৃদয় নাচিয়া উঠিত, চোখে জল আসিত,—তাহার এই নীরস, ক্ষুদ্র পত্র! বিলির মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে কাঁধের উপর মাথা ঢলিয়া পড়িল,—যেন মৃণালভঙ্গে কমলিনী জলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
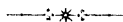
আমরা একজনের পরিচয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তাড়াতাড়ি আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিলাম। কেদার জেঠার পুত্র হরি কিঙ্করের কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ নীহারের কথা বলি নাই।

নীহার অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী। নীহার শান্ত, নম্র, পতি-প্রাণা। বোধোদয় শেষ করিবার পূর্ব্বেই নীহারের বিবাহ হইয়াছিল। পতি-গৃহে কয়েকখানা নাটক নভেল ভিন্ন আর কিছু পড়া ঘটিয়া উঠে নাই। নীহার গান জানিত, কিন্তু গাহিতে পারিত না। পঞ্চমী ব্রত, বীরাষ্টমী ব্রত করিত। রাত্রে রামায়ণ পড়িয়া স্বামীকে শুনাইত। কখন কখন স্বামীর সঙ্গে দশ-পঁচিশ বা তাস খেলিত। স্বামী যে জিনিসটি ভালবাসিত তাহা সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়া দিত। কিঙ্কর তামাক খাইত,—নীহার স্বহস্তে ফর্সি মাজিয়া, জল ফিরাইয়া, কলিকায় উত্তম তামাকু সাজিয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া

থাকিত; স্বামী ঘরে আসিলে টিকায় আগুন ধরাইয়া স্বামীর হাতে সটকা তুলিয়া দিত। বৈশাখের দিনে খিড়্কির বাগান হইতে অসংখ্য জুঁই মল্লিকা তুলিয়া, তদ্দ্বারা ছোট বড় মালা গাঁথিয়া স্বামীকে মনোমত করিয়া সাজাইত। নীহার, স্বামী ছাড়া কোন খেলা ধূলা জানিত না। স্বামীকে প্রফুল্ল করা ব্যতীত তাহার আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না—স্বামী ছাড়া তাহার আর কোন চিন্তা ছিল না।

একদিন অপরাহ্নে নীহার আপন কক্ষে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল; চুল বাঁধা শেষ হইলে পক্ষবিস্তারি উড্ডীয়মান ভ্রূযুগের মধ্যে টিপ্ পরিল, আয়ত-নয়নের নীল তারার নীচে সুরমা পরিল, সিঁথির মাঝে সিন্দুরের সূক্ষ্ম রেখা সযতনে পাড়িল। তারপর মুকুরে আপন মুখ দেখিয়া একটু হাসিল। তাম্বূল-রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, কণ্ঠ ও কেশে অলঙ্কার পরিয়া আবার দর্পণে মুখ দেখিল। মনে মনে ভাবিল, "এত'তেও তাঁর মত সুন্দর হইতে পারিলাম না।"

এমন সময়ে সহসা মুকুরের মধ্যে স্বামীর মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিল। নীহার চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া হরিকিঙ্কর টিপি টিপি হাসিতেছে। লজ্জায় জড়সড় হইয়া নীহার আবার দর্পণের দিকে চাহিল। দেখিল, দর্পণের মধ্যেও সেই দুষ্ট-দুষ্ট হাসি, মিঠা মিঠা চাহনি। তখন নীহার মুকুর উল্টাইয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল। হরি কিঙ্কর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "নীহার, তুমি এত সুন্দর তাহা আমি জানিতাম না।"

নীহার ঘোমটা দূর করিয়া স্বামীর পানে ছল্ ছল্ নয়নে চাহিয়া রহিল।

কিঙ্কর বলিল, "কি দেখ্ছ নীহার ?"

নীহার চক্ষু নামাইল ; আবার ধীরে ধীরে চক্ষু উঠাইল। গবাক্ষ পথ দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীহার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক দুই, তিন চারি, কত পাখি উড়িয়া যাইতেছে, নীহার তাহাই দেখিতে লাগিল—অনন্যমনে যেন তাহাই গণিতে লাগিল।

কিঙ্কর ডাকিল, "নীহার!"

নীহার চক্ষু নামাইয়া স্বামীর পানে চাহিল। কিঙ্কর বলিল, "কি ভাব্ছ, নীহার ?"

নী। বল দেখি কি ভাবছি ?

কি। আচ্ছা, তুমি আগে বল।

নীহারের চক্ষু দু'টী নত হইল—রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁটের উপর একটু লজ্জার হাসি ভাসিয়া গেল। নীহার অবশেষে বলিল, "তা', আমি বল্‌তে পার্‌ব না।"

কি। তবে আমি চলিলাম।

নী। বইস, বল্‌ছি।

নীহার, স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইল। আবার একটু হাসি অধরোপরি ভাসিয়া গেল, আবার চক্ষু দুইটি নত হইল। বলিল, "ভাবছিলাম এই তুমি—" আর বাক্য সরিল না।

কি। বলিবে না? তবে আমি চলিলাম।

নী। না, না, বল্‌ছি। এই—এই তুমি কি সুন্দর।

কিঙ্কর সাদরে নীহারের চিবুক উঠাইয়া বলিল, "আর, তুমি নীহার?"

সে কথার উত্তর না দিয়া নীহার বলিল, "আরও ভাবিতেছিলাম যে—"

কি। কি, বল।

নী। যদি তুমি সুন্দর না হয়ে কুৎসিৎ হ'তে।

কি। তা'হ'লে কি হইত, নীহার?

নী। তাহ'লে তোমায় বোধ হয় আরও ভাল বাসিতাম।

কি। কেন বল, দেখি?

নী। তা' ঠিক জানিনা। বোধ হয়, তুমি কুৎসিৎ হ'লে আমি ছাড়া আর কেহ তোমায় ভাল বাসিত না।

কি। সে কি, নীহার?

নী। জগৎ তোমায় সুন্দর দেখে বা তুমি জগৎকে সুন্দর দেখ, এটা আমার সহ্য হয় না। তোমাকে আমাতেই লুকাইয়া রাখিতে চাই।

কি। এখন তা পারনা কেন?

নী। এখন তোমার ওই মন-ভুলান রূপ শুধু আমার নয়। প্রত্যেক রমণীর চক্ষে তুমি এখন সুন্দর, প্রত্যেক রমণীর কণ্ঠে এখন তোমার রূপব্যাখ্যা।

কি। কিন্তু তোমার রূপব্যাখ্যা যদি কেহ আমার নিকট করে তাহা হইলে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

নী। পুরুষের মুখে আমার রূপব্যাখ্যা শুনিলে কি তোমার আনন্দ হয়?

কি। হয় বই কি?

নী। তবে তুমি আমায় ভালবাস না।

কি। আমি ভালবাসিনা?

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু, তোমায় কর্ত্তা ডাক্‌ছেন।"

দাসী চলিয়া গেল। হরি কিঙ্করও উঠিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "কাহার কত ভালবাসা একদিন বুঝা যাবে, নীহার।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিকিঙ্কর উঠিয়া পিতার কাছে সদরে আসিল। পিতা বলিলেন, "কিঙ্কর, তুমি এখন উপযুক্ত হইয়াছ। আমি আর সংসারে ক-দিন আছি। তোমার সম্পত্তি তুমি দেখিয়া লও। আমি বৃন্দাবনে চলিলাম। হরি বোল! হরি বোল।"

গত দশবৎসর হইতে কেদারনাথ বৃন্দাবন যাইবার জন্য দিনস্থির করিতেছেন; কিন্তু যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। মকর্দ্দমায় হারিলে বা গৃহিণীর নিকট লাঞ্ছিত হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে মনঃপীড়া পাইলে,

বৃন্দাবন যাইবার কথা উঠে। কিঙ্কর সেটা জানিত; বুঝিল, পিতার মনে কোন কারণে কষ্ট হইয়াছে। বলিল, "কেন, কি হইয়াছে বাবা ?"

কেদার বলিলেন, "হবে আর কি ? নির্ম্মলকে যতটা শান্ত শিষ্ট মনে করেছিলাম এখন দেখিতেছি সে তেমনটা নয়। তুমি ত জানই যে, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি কালীর সঙ্গে ভাগাভাগি হওয়াতে আমার বড় অসুবিধা হ'য়েছিল। ষোল আনা সম্পত্তি, হয় কালী লউক, নয় আমি লই। তা' সে ত আর নিতে পারলে না। এখন বিষয়টা আমি নিতে চাই। তা'তে নির্ম্মল বাধা দেয় কেন ? কেন, বাপু, আমি যদি বিষয়টা পাই, তা'তে তোমার ক্ষতিটা কি ? তোমার ত আর পৈতৃক সম্পত্তি নয়।"

কিঙ্কর বলিল, "নির্ম্মল বাবু কি করেছেন ?"

কেদার। একটা মহালের প্রজা ভাঙ্গাইয়া নাব ালক হেমের নামে কবুলতি লেখাইয়া লইতেছে।

কিঙ্কর। তবে ত বড় গোল—এখন উপায় ?

কে। উপায়ের কথা পরে হইবে, এখন তুমি এক কাজ কর।

কি। বলুন।

কে। হেমেদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা কর। আসা, যাওয়া হ'তে হ'তে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়্‌বে। তখন জজের কাছে নাবালকের অছি হ'বার জন্য দরখাস্ত কর্‌ব।

কি। মা বর্ত্তমান থাকিতে আপনি কেমন করে অছি হ'বেন?

কে। মাকে পাগল ব'লে এফিডেভিট কর্‌ব।

কি। নির্ম্মল বাবু বাধা দিতে পারেন।

কে। ওদের সঙ্গে এমনি আত্মীয়তা দেখাব যে, নির্ম্মলও তা'তে ভুলে যাবে।

পিতার পরামর্শানুসারে কিঙ্কর, কালী খুড়োর বাটীর দিকে গেল। উভয় বাটী পাশাপাশি, মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান। কালী ও কেদার উভয়ে জ্ঞাতি, উভয়ের প্রপিতামহ একই ব্যক্তি। কালীর বাড়ী জীর্ণ, পতনোন্মুখ, কেদারের বাটী মেরামতের গুণে নূতন অবস্থায় আছে।

খুড়িকে ডাকিতে ডাকিতে কিঙ্কর অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, খুড়ি, সোহাগের চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে; আর হেম পাশে বসিয়া শিশুশিক্ষা পড়িতেছে, মাঝে মাঝে দিদির কাছে কঠিন স্থানের অর্থ করিয়া লইতেছে।

কিঙ্কর একটু মুখচোরা, একটু লাজুক ; নূতন লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে বা আলাপ করিতে হইলে কিঙ্করের কথা যোগাইত না। বন্ধুদের মধ্যে কিঙ্করের বড় একটা লজ্জা থাকিত না; স্ত্রীর কাছে আদৌ না। কিন্তু কথাগুলা গুছাইয়া ঠিক করিয়া সকল সময় বলিতে পারিত না। কিঙ্কর নিতান্ত অশিক্ষিত নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে পিতার কাছে জমিদারীর কাজ শিখিতেছিল। কিঙ্করের বয়স তেমন বেশী নয়; চব্বিশের মধ্যে হইবে। দেখিতেও বেশ,—উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণের উপর সুশ্রী মুখ; সুতরাং নীহার তাহাকে পরম রূপবান বলিয়া মনে করিত।

কিঙ্কর, খুড়িকে দেখিল, হেমকে দেখিল, তারপর সোহাগকে দেখিল। আলুলায়িত নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, গণ্ড প্লাবিত করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। কিঙ্কর দেখিল, সেই কেশদামের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র মুখ; যেন অমাবস্যা নিশিতে মেঘ-প্রতিবিম্বিত বাপী-হৃদয়ে কে উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে—যেন খণ্ড খণ্ড কাল মেঘে পূর্ণিমার চাঁদকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এত সুন্দর বুঝি কিঙ্কর আর কখন দেখে নাই। গঙ্গাবক্ষে আলুলায়িত

কুন্তলা ভগবতী-প্রতিমা দেখিয়াছে, আকাশের গায় নিবিড় মেঘের কোলে বিদ্যুদ্দাম দেখিয়াছে, সরসীর তলে নক্ষত্র ফুটিতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দর সে কখনও দেখে নাই। কিঙ্কর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

খুড়ি সোহাগের চুল ছাড়িয়া কিঙ্করকে বসিতে আসন দিল। সোহাগ উঠিল না, সলজ্জ ভাবে বসিয়া রহিল। কিঙ্কর বহুকাল এ বাড়ীতে আসে নাই—বহুকাল সোহাগকে দেখে নাই। শৈশবে ধূলা মাখিয়া সোহাগ যখন খেলিয়া বেড়াইত তখন তাহাকে কিঙ্কর দেখিয়াছিল; কিন্তু তখন ভাবে নাই যে, সে কানন-লতিকা একদিন মুকুলিত হইয়া অরণ্য উদ্ভাসিত করিবে।

কিঙ্কর বড় একটা কথা কহিতে পারিল না; যা' কিছু কহিল তা' হেম ও খুড়ীর সঙ্গে। সোহাগের সহিত বাক্যালাপও করিল না। স্বল্প কাল তথায় বসিয়া কিঙ্কর উঠিয়া গেল।

রাত্রি কিছু বেশী হইলে কিঙ্কর, ঘরে শুইতে আসিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি হ'ল কেন?"

কিঙ্কর বলিল, "খেলা করিতেছিলাম।"

মিথ্যা কথা। কিঙ্কর, সোহাগের চিন্তায় বিভোর হইয়া, তা'র মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে, জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিল। কিন্তু কিঙ্কর সে কথা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা বলিল।

কিঙ্করকে অন্যমনস্ক দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত বিষণ্ন কেন?"

কিঙ্কর বলিল, "মাথা ধরেছে।"

আবার মিথ্যা। কিঙ্কর আগে স্ত্রীকে প্রতারণা করিত না; এক্ষণে বিনা সঙ্কোচে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইল। যে বিশ্বাসঘাতক—তা'র আবার মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ! যে মানুষ মারে সে, পদতলে পিপীলিকা দলিত করিল কিনা ফিরিয়া দেখে কি?

অবশেষে কিঙ্কর. পিতার আদেশ নীহারকে জানাইল। খুড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্ত্রীকে বুঝাইল। স্ত্রী তাহা বুঝুক বা নাই বুঝুক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিল; এবং পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সোহাগকে ডাকিয়া লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিল।

গ্রাম্য পথ আলো করিয়া দুই জনে গঙ্গাস্নানে চলিল। তখনও জ্যোৎস্নার আলো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই,

তখনও উষার আলো সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে নাই। উষার আলো চাঁদের গায়ে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার ম্লান আভা উষার ললাটে লাগিয়াছে। পৃথিবীর সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে, যেন পতি-প্রেম-উৎফুল্লা, লাজ-রঞ্জিতা উষা রাণী—গৃহ-বহিষ্কৃতা, পতি-লাঞ্ছিতা সতিনী চন্দ্রিমার ম্লান মুখপানে গরব ভরে চাহিয়া টিপি টিপি হাসিতেছে। তা'র সে গর-বের হাসি দেখিয়া চাঁদ যেন আরও ম্লান হইয়া পর্ব্বতান্ত-রালে বা গাছের আড়ালে বিষণ্ণ বদন লুকাইবার অভি-প্রায়ে ছুটিয়া পলাইতেছে। দুই-ই সুন্দর। তবে যে আদর হারাইয়াছে তার সৌন্দর্য্য দেখে কে?

সেই দিবা রাত্রির সন্ধি সময়ে, উষা-জ্যোৎস্নার সম্মি-লিত আলোকে—শান্ত, স্থির ভাগীরথীর উপকূলে দাঁড়া-ইয়া একজন অপরকে বলিতেছে, "দেখ, উষা উঠিতেছে।"

অপরা উত্তর দিল, "দেখ, জ্যোৎস্না কেমন ডুবিয়া যাইতেছে।"

জ্যোৎস্না, উষার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখ, ঠাকুরঝি, তুমি এত সুন্দর তা'ত কখন জানিতাম না।"

উষা বলিল, "বউ দিদি, তোমার গায়ের আলো আমার মুখে পড়েছে, তাই আমায় সুন্দর দেখাইতেছে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলের মনে সুখ নাই। বিলি আর পত্র লেখে না। আগে প্রত্যহ পত্র আসিত; ক্রমে পত্র সংখ্যা কমিয়া দুই দিন, চারি দিন অন্তর এক আধখানা আসিতে লাগিল। এক আধ খানা যাহা আসে তাহাও কর্কশ, স্নেহশূন্য। আজ কয়েক দিন কোন পত্র আসে নাই। নির্ম্মলও অভিমান ভরে পত্র লেখেন নাই।

যদি বিলির পত্র একবারে না আসিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ নির্ম্মল এতটা কাতর হইতেন না। কিন্তু তাহা না ঘটিয়া মাঝে মাঝে এমনই মর্ম্মভেদী তীব্র ভাষায় লিখিত দুই একখানি পত্র আসিত যে, তাহা পড়িতে নির্ম্মলের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। একবার পড়িয়া কোন খানা দুই বার পড়িতে সাধ হইত না। কোন খানা বা দুই এক ছত্র পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। পত্র পাঠ কালে অভিমানে অন্ধ হইয়া তিনি একবার বিবেচনা

করিয়া দেখিতেন না যে, এরূপ কঠিন পত্র লেখা বিলির পক্ষে সম্ভব কি না। অভিমান-অনল, যাহার হৃদয়ে জ্বলে তাহার বিচারশক্তি কোথায়?

তাই বলিতেছিলাম এখন নির্ম্মলের মনে কোন সুখ নাই। নির্ম্মল এখন নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার উপর বেড়াইতে যান না—বন্দুক লইয়া শীকারে বাহির হ'ন না—অশ্বারোহণে, আর তেমন আনন্দ অনুভব করেন না। বিষয় কর্ম্মাদিও দেখেন না। তবে সোহাগের বাপের বিষয় উদ্ধার করিবার আগ্রহ পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল। সে উদ্যমে, পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত বা কাতর হইতেন না। সেটা যে পরের কাজ।

মা, ছেলের জন্য বড় কাতর হইলেন। ছেলে কোথাও যায় না—কোন কাজ করে না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়। মা বুঝাইতে গেলে ছেলে হাসিয়া উঠে। মা সেই হাসি দেখিয়া চোখে জল লইয়া ফিরিয়া আসেন।

মা ব্যাকুল হইয়া বধূর তত্ত্ব লইবার মানসে দুইজন দাসী পাঠাইলেন—ফিরিয়া আসিবার জন্য বধূকে মিষ্ট কথায় অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

দাসীরা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বধূ আসিল না; বলিয়া পাঠাইল, দাদা ভাল হইলে ফিরিব।

কিন্তু নির্ম্মলের প্রাণ ফাটিয়া গেল। বিলির নিষ্ঠুরতা নির্ম্মলের হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। যাহাকে ভাবিয়া সুখ, দেখিয়া শান্তি, সে, নির্ম্মলের পানে চাহিয়া দেখিল না—নিৰ্ম্মলের যাতনা বুঝিল না। বিলি কেন এমন হ'ল! বিলি যে নির্ম্মলের চো'খে জল দেখিলে, পাগল হঁয়ে বেড়াত, নির্ম্মলের মুখ একটু ম্লান দেখিলে বিলি যে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইত,—সে বিলি কেন এমন হ'ল?

নির্ম্মল, একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ছাদে বসিয়া ভাগীরথীর তরঙ্গ-লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। আকাশে কোথাও মেঘ নাই, তবে বাতাস প্রবল। রবি-কর-প্রতিভাত উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালা অবিরাম অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। জাহ্নবী, কুঞ্চিত কেশে মণিমাণিক্য-বিজড়িত সিঁথি পরিয়া স্ফীতবক্ষে স্বামীসম্ভাষণে ছুটিয়া চলিয়াছে—আঁখিজলে ঘাট মাঠ প্লাবিত করিয়া, প্রাণের ব্যথার প্রতিধ্বনি উঠাইয়া উন্মত্ত হৃদয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশপ্রান্তে সবুজ-বরণ বিটপীর পাদমূলে আছাড় খাইয়া, মর্ত্ত্যে স্বর্গ

মিশাইয়া ক্ষিপ্তা জাহ্নবী হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নির্ম্মল দেখিলেন, দূরে—ভাগীরথী-উপকূলে, আকাশ-প্রান্ত, যেন কে সবুজ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে। নীলের তলে সবুজ, তা'র তলে ধবলতরঙ্গা গঙ্গার জল। মেঘমুক্ত নীলাকাশ—শান্ত, স্থির; সবুজ আলেখ্য স্তম্ভিত; পদতলে জলরাশি চঞ্চলা, অধৈর্য্যময়ী। নির্ম্মল ভাবিলেন, "কেন জাহ্নবি, তুমি অনন্ত নীলাকাশের ছায়া হৃদয়ে ধরিয়া ক্ষুদ্রের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? অনন্তের প্রেম পাইয়াও কেন চঞ্চল হৃদয়ে ছুটিতেছ, মা? প্রেমোচ্ছ্বাসে পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া, গর্ব্বিতকে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে কেন মা, ক্ষুদ্রের পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছ? নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বিরাট পুরুষের শিরোদেশ ছাড়িয়া কেন বিটপীর পায়ে কপাল ভাঙ্গিতেছ? যে আলেখ্য দেখিয়া ভুলিয়াছ,মা, সে আলেখ্য ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তোমার দুই কুল ভাসাইয়া, চরাচর ডুবাইয়া অনন্তে প্রাণ মিশাও, মা;—বিশ্বে যেন গাছ থাকে না, গ্রাম থাকে না—মানুষ থাকে না, স্মৃতি থাকে না; সব ডুবাইয়া দেও, মা।"

ক্রমে অন্ধকার টিপি টিপি আসিয়া গাছপালা পৃথিবী

ঢাকিয়া ফেলিল ; আকাশরাজ্যে রসিকা রূপসীরা একে একে চুপি চুপি পথ হাঁটিয়া অভিসারে চলিল ; তাহাদের বদনসমুদ্ভূত আলোকে পৃথিবীর ঘনান্ধকার কতকটা দূরীভূত হইল। সেই নক্ষত্রদীপ্ত অস্পষ্টালোকে নির্ম্মল ছাদে শুইয়া আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। পুরাতন কথা একে একে নির্ম্মলের মনে পড়িতে লাগিল ;—এই ছাদে শুইয়া, বিলির হাত বুকের উপর লইয়া, নির্ম্মল কতদিন নক্ষত্র পানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন—তাহা নির্ম্মলের মনে পড়িল। নক্ষত্রনিচয়কে অভিসারিকা বলিয়া বিলি কত বিদ্রূপ করিয়াছিল, নির্ম্মলের তাহা মনে পড়িল ; কোন্ নক্ষত্রকে বিলি কি নামে ডাকিত—সন্ধ্যা-তারা দিবালোক থাকিতে থাকিতে সকলের আগে অভি-সারে চলিত বলিয়া বিলি তাহাকে লজ্জাহীনা বলিয়া কত উপহাস করিত, তাহা নির্ম্মলের মনে পড়িল। একদিন নিবিড় মেঘের কোলে মরালকে উড়িতে দেখিয়া নির্ম্মল, বিলির দেহ-যষ্টি নীলাম্বরী সাটীতে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে লজ্জাভিভূতা বিলি কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া মরালকে কত গালি দিয়াছিল, কত শাসাইয়াছিল—নির্ম্মলের তাহা মনে পড়িল। অতীতের ছবি একে একে

নির্ম্মলের স্মৃতিপটে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; দুঃখের দিনে, সুখের ছবি, অভোগ্য স্বপ্নরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিল; অস্পর্শনীয় সুখের ছায়া, মানসসলিলে একে একে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মল সহস্রবার মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, "সে বিলি কেন এমন হ'ল?" তীব্র যন্ত্রণায় চক্ষু ফাটিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন পরে একদা মধ্যাহ্নে নির্ম্মল একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি জাল, কিন্তু বিলির লিখিত বলিয়া নির্ম্মলের ভ্রম হইল। নির্ম্মল, শুষ্ক চক্ষে, স্তব্ধহৃদয়ে পড়িলেন, "তোমার প্রতি আমার যেমন কর্ত্তব্য আছে, অপরের প্রতিও আমার সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে। তাহাতে যদি রাগ কর, আমি নাচার। না লইয়া যাও, এইখানেই থাকিব। তাহাতে সুখী বই দুঃখীত নই। তুমিও যে সুখী হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী বিজলি।"

পত্র পাঠ করিয়া অভিমানী বালকের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। অভিমান ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া একবার ভাবিলেন না যে, এরূপ পত্র লেখা বিলির পক্ষে অসম্ভব। পাঠান্তে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া গবাক্ষ পথে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শতধা ছিন্ন পত্র, নির্ম্মলের সুখাশার ন্যায়, বাত্যাতাড়িত হইয়া আকাশপথে উড়িয়া গেল। নির্ম্মল ভাবিলেন, "সব উড়ে যায়, স্মৃতি উড়ে না কেন? সুখ, সাধ, ভালবাসা ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল—আমার যা' কিছু ছিল সব একে একে গেল, তবু স্মৃতি যায়না কেন? সে বোঝা কি নামান যায় না? সেটা কি এতই ভার?"

এমন সময়ে নায়েব কতকগুলা কাগজ পত্র লইয়া তথায় হাজির হইল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" নায়েব—খাজনা, মকর্দ্দমার কথা পাড়িল। নির্ম্মল বলিলেন, "ওসব কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

নায়েব। না শুনিলে বিষয় থাকিবে কি প্রকারে?

নির্ম্মল। না থাকে—ঘুচিয়া যাক্!

না। আমি কর্ত্তার আমল থেকে আছি—কর্ত্তাদের বিষয় নষ্ট হ'বে, তা' আমি চোখে দেখিতে পারিব না।

নি। না দেখিতে পার—চলিয়া যাও।

না। তা'ও পার'ছি কই ? যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি সে কয়টা দিন এই খানেই কাটাব।

নি। যখন কাকা বিষয় গ্রাস করেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

না। তিনিও যে আমার মনিব।

নি। ভাল, তবে এখন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে যাও।

না। বিষয়, সম্পত্তি নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ?

নি। তাই বটে।

না। তারপর ?

নি। তারপর ? তারপর আবার কি ?

না। মায়ের দশা কি হইবে ?

নি। কাশীবাস।

নায়েব নীরব হইল। সে বুদ্ধিমান ও প্রভুভক্ত; মনিবকে বেশ চিনিত। চিনিত বলিয়াই কথাটা চাপা দিল; এবং একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কেদার নাথ বাবু, জজের বরাবর একটা দরখাস্ত করিয়াছেন।"

নি। কিসের দরখাস্ত ?

না। নাবালকের অছি হইবার জন্য।

নি। নাবালক কে?

না। কালীনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ।

নি। মা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কিরূপে অছি হইবেন?

না। মাকে পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নি। মিথ্যা কথা টিকিবে কেন?

না। মকর্দ্দমার জবাব না দিলে টিকিবে বই কি।

নি। মায়ের পক্ষে তুমি জবাব দিবে।

না। কি করিতে হইবে আমায় উপদেশ দিন্।

নি। নাবালকের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি; পরে উপদেশ দিব।

নায়েব বিদায় হইল। নির্ম্মল, অশ্বারোহণে অল্পকাল মধ্যে আনন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। কালী খুড়ার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হেমের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে জনৈক দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হেমকে ডাকিয়া দিল। হেম তখন খিড়কির পুকুরে মাছ ধরিতেছিল।

দাসী অনেক দিন হইতে কালী বাবুর বাড়ীতে চাকুরি

করিতেছে। এখন বেতন পায় না, তবু চাকুরি ছাড়ে না। কালী খুড়ার ইদানীং ভৃত্য রাখিবার সামর্থ্য ছিল না। সম্প্রতি নির্ম্মল একজন ভৃত্য বা দ্বারবান রাখিয়া দিয়াছেন; সে অভিভাবক স্বরূপ গৃহের পাহারায় থাকিত।

হেম আসিয়া দাঁড়াইলে নির্ম্মল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কোথায়?"

হেম। কেদার জেঠার বাড়ী।

নি। আর সোহাগ?

হে। সেইখানে।

নি। কেন গিয়াছেন? নিমন্ত্রণ হইয়াছে কি?

হে। না। অমনি বেড়াতে গেছেন।

নি। প্রত্যহ যান কি?

হে। দিদি যান; মা রোজ যান না।

নি। যাও—মাকে ডেকে নিয়ে এস।

বস্তুতই সোহাগ এক্ষণে কেদার জেঠার বাটীতে প্রত্যহ বেড়াইতে যায়। যদি কোন দিন না যায় তা' হ'লে নীহার নিজে ডাকিতে আসে। সোহাগ কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারে না—কাহারও মনে কষ্ট দিতে পারে না। নীহারও সোহাগকে না দেখিয়া থাকিতে পারেনা।

উভয়ে প্রত্যূষে উঠিয়া একত্র গঙ্গাস্নানে যায়; আবার মধ্যাহ্নে আহারান্তে একত্র খেলিতে বসে। কোন দিন তাস, কোন দিন দশ পঁচিশ। খেলাটা নীহারের কক্ষেই প্রত্যহ হয়। শুধু নীহার ও সোহাগের মধ্যেই যে খেলা চলিত এমন নহে। তাহাদের আরও সঙ্গী ছিল। তৃতীয় সঙ্গী—হরি কিঙ্কর; চতুর্থ সঙ্গী—প্রতিবাসী কন্যা যমুনা।

যমুনার বাপের বাড়ী আনন্দপুরে। সুতরাং যমুনা চুল এলো করে ষাঁড়ের মত গ্রামময়, এ-বাড়ী ও-বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যমুনা বয়সে—যুবতী; রূপে—বায়সী। কাদম্বিনী-বরণার মুখকান্তি মনোমত না হওয়াতে মূর্খ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে। তদবধি যমুনা পিতৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছে।

হরি কিঙ্করের সহিত খেলিতে সোহাগ প্রথমে সম্মতা হয় নাই। পরস্পর সম্পর্কে ভাই ভগ্নী হইলেও সুম্বন্ধ অতি দূর। তা ছাড়া ঘনিষ্ঠতাও খুব কম। এমন কি সোহাগ, কিঙ্করকে চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় কিঙ্করের সহিত খেলিতে সোহাগ বড়ই লজ্জিতা হইল। সোহাগও এখন বালিকা নয়।

প্রথম দিন, কোন মতেই সোহাগ খেলিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিন, মায়ের অনুমতি লইয়া নীহারের পীড়াপীড়িতে খেলিল। ক্রমে লজ্জা কমিয়া আসিল; এখন আর তত বাধ বাধ ঠেকে না।

বাধ বাধ না ঠেকিলেও সোহাগ বড় একটা কথা কহিত না। সোহাগ চুপ করিয়া নীরবে খেলিত। কিঙ্করের পক্ষভুক্ত হইয়া কিঙ্করের সাম্‌নে বসিয়া তাহাকে প্রত্যহ খেলিতে হইত। সোহাগ কখন মাথা তুলিয়া কিঙ্করের পানে চাহিয়া দেখিত না—বাধ্য না হইলে কখন কথা বলিত না।

খেলায় প্রত্যহ সোহাগ হারিত। দোষটা কিন্তু কিঙ্করের। সে বড় ভুলিত। বিন্তি, পঞ্চাশ হাতে আসিলে কিঙ্কর হাঁকিতে ভুলিয়া যাইত—চোদ্দর উপর গোলাম মারিতে কিঙ্করের স্মরণ থাকিত না। কিঙ্করের ভুল দেখিয়া নীহার হাসিত—যমুনা ঠাট্টা করিত; কিন্তু সোহাগ কিছু বলিত না।

কিঙ্করের ভুলটা কিছু বিচিত্র নয়। খেলাতে কিঙ্করের মন থাকিত না—হারজিতের দিকেও তা'র লক্ষ্য ছিল না। কোন দিকে সে চাহিত না—সোহাগের দিকেও না।

বিহ্বল চিত্তে যন্ত্রতাড়িত পুতুলের মত কিঙ্কর তাস ফেলিয়া দিয়া যাইত। সোহাগ কথা কহিলে কিঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। যে দিবস সোহাগ দুই চারিটা কথা কহিত, সে দিবস কিঙ্কর, কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ ভাবিবার জন্য গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইত।

সোহাগকে দেখিবার জন্য কিঙ্কর ব্যাকুল হইয়া থাকিত। সাক্ষাৎ পাইলে কথা ফুটিত না—চক্ষুও সোহাগের মুখপানে উঠিত না। কিন্তু দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া ছুটাছুটি করিত। এ আকুলতা কিঙ্করকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। প্রবৃত্তিতাড়নায় কিঙ্কর ভাসিয়া চলিল। দুর্ব্বল হৃদয়, প্রবল তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করিতে কিঙ্করের শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই।

দ্বিতলের কক্ষ বিশেষের গবাক্ষ হইতে সোহাগদের গৃহাভ্যন্তর কিয়দংশ দেখা যাইত। কিঙ্কর সুবিধা পাইলেই সেই গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইত। সেই স্থান হইতে সোহাগকে লুকাইয়া দেখিত; দেখিয়া প্রবৃত্তিতে আহুতি দিত। একে গুণশূন্য হৃদয়, তাহাতে প্রবল বাসনানল—কিঙ্করের হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইল।

যখন মন একবার উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়, যখন একবার তুফানে গা ভাসাইয়া দিই তখন ধর্ম্মের মুখের দিকে তাকাই না। কিঙ্কর প্রতারণায় নীহারকে ভুলাইতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না—যতটুকু আদর না করিলে নীহারের সন্দেহ জন্মিতে পারে তাহাকে ততটুকু আদর করিত; কিন্তু মনে মনে নীহারকে ঘৃণা করিত। নীহার কেন সোহাগের মত সুন্দর হ'ল না? নীহারের কেন সোহাগের মত মিষ্ট কথা হল না? নীহার কেন সোহাগ হ'ল না?

কিন্তু নীহারের মনে কোন অশান্তি ছিলনা। সে সোহাগকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিল। সোহাগ শান্ত, নম্র ও মিষ্টভাষী। সোহাগ আত্মীয়কন্যা, সুচরিত্রা, অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকামাত্র। নীহার তাহাকে ভাল বাসিত। একদিন সোহাগের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নীহার বলিয়াছিল, "তোমাকে আমি সব দিতে পারি।"

স্বামীর সংসর্গে রূপসী যুবতী আসিতে দেওয়া নীহার পছন্দ করিত না। যমুনা কুরূপা; সুতরাং এ দিকে নীহারের কোন ভয় ছিল না। নীহার যে ঠিক ভয় করিত, এমন নহে; তবে কিঙ্কর কাহাকেও সুন্দর

দেখিলে বা কাহারও সহিত মিষ্ট করিয়া দুটা কথা কহিলে নীহার সহ্য করিতে পারিত না—জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত।

বর্ত্তমান অবস্থায় নীহারের কোন জ্বালা নাই। বেশ মনের সুখে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে ছিল। মধ্যাহ্নে খেলাটা প্রত্যহ চলিত। আজও চলিতেছিল। তবে সোহাগের হারটা আজ বড় গুরুতর হইয়াছিল। দুই খানা ছক্কা, তিন খানা পঞ্জা ধরিয়া নীহার স্বামীকে বেশ দু'কথা শুনাইতেছিল। যমুনাও, ব্যোম ধরিবে বলিয়া শাসাইতেছিল। এমন সময় তথায় হেম আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম বলিল, "দিদি, নূতন দাদা এসেছে।"

সোহাগ তাস ফেলিয়া উঠিল। কিঙ্কর, হেমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নূতন দাদাটা কে?"

নীহার উত্তর করিল, "নির্ম্মলবাবু।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কিঙ্কর বলিল, "তা' তিনি আসিয়াছেন বলে সোহাগ উঠে যায় কেন?"

নীহার কি উত্তর দিল তাহা সোহাগ শুনিল না। সে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোহাগ উঠিয়া গেলে কিঙ্করও উঠিল। একটু এদিক্ ওদিক্ করিয়া কিঙ্কর পূর্ব্বকথিত গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সোহাগদের গৃহাভ্যন্তর দেখিতে পাইল। দেখিল, নির্ম্মল দালানে বসিয়া সোহাগের মার সহিত কথা কহিতেছেন। সেখানে হেম আছে, সোহাগ নাই। দূরত্ব বশতঃ সকল কথা কিঙ্কর শুনিতে পাইতেছিল না। মাঝে মাঝে এক একটা কথা মাত্র কাণে যাইতেছিল। নির্ম্মল বলিতেছিলেন, "সোহাগের বিয়ের কথা তোমায় ভাবিতে হবে না, আমি বুঝিব।"

সোহাগের মা বলিল, "মেয়ে আর রাখা যায় না, না ভেবে করি কি?"

নি। এত দিন ভাব নাই; আর আজ শ্রাদ্ধের পর পনর দিন যেতে না যেতে ভাবনায় অস্থির হ'য়ে পড়্লে?

সো, মা। ও-বাড়ীর ভাশুর (কেদার) সোহাগের একটি সম্বন্ধ করিতেছেন।

নি। পাত্র কে?

সো, মা। ভাশুরের গমস্তার ছেলে। পাত্রটির একটু বেশী বয়স হয়েছে, তা'বলে আর কি কর্‌ব।

নি। সোণার প্রতিমা, বানরের অঙ্কে তুলিয়া দিতে পারিব না।

সো, মা। তা'হলে উপায় ?

নি। সে ভাবনা আমার। খুড়ার মৃত্যু-শয্যায় যাহাকে ভগ্নী বলে গ্রহণ করেছি, তাহার বিবাহের ভাবনা আমার, ব্যয়ও আমার। আমার ভগ্নীর উপযুক্ত পাত্রে সোহাগকে দান করিব।

এ কথা কয়টি নির্ম্মল একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন। অন্তরালে কিঙ্করের কাণে কথা কয়টা পৌঁছিল। সে নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিল, "পাত্র কে ? তুমি স্বয়ং নাকি ? সেই জন্যই কি স্ত্রীকে সরাইয়াছ ?" যে বংশে বহু বিবাহ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে সে বংশের বংশধর এরূপ ভাবিবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

এমন সময়ে কিঙ্কর দেখিল, সোহাগ আসিয়া নির্ম্মলের হাতে তাম্বুল দিল। তারপর নির্ম্মলের পাশে বসিয়া নির্ম্মলকে ব্যজন করিতে লাগিল। নির্ম্মল, আদর করিয়া

সোহাগের মুখের উপর হইতে স্থানভ্রষ্ট কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিলেন। সোহাগ বলিল, "দাদা, এতদিন আসনি কেন?"

নির্ম্মল একটু হাসিয়া বলিলেন, "আসিলে ত তোমাদের দেখা পাই না।"

হেম বলিল, "পনর দিনের মধ্যে তুমি একবারও আসনি দাদা।"

কিন্তু সোহাগ কিছু বলিল না। সে নির্ম্মলের শেষ কথাটা ভাবিতেছিল; ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বুঝিল যে, নীহারের বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়াতে দাদা একটু বিরক্ত হইয়াছেন। তথায় আর যাইবে না বলিয়া সোহাগ স্থির করিল।

নির্ম্মল উঠিলেন। বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম; তাহা আজ আর বলা হ'ল না—কাল আবার আসিব।"

কিঙ্কর গবাক্ষ ত্যাগ করিল,—হৃদয়ে হলাহল লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সোহাগ খেলিতে আসিল না। নীহার নিজে ডাকিতে গেল, তবু সোহাগ আসিল না—বলিল, "দাদা

আস্‌বেন।” নীহার রাগ করিয়া চলিয়া গেল। স্বামীর কাছে, সোহাগের দেমাক্‌ হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিল। যমুনা সেখানে ছিল। সে বলিল, “নারে দেমাক্‌ নয়।”

নী। তবে কি?

য। তোরা যেমন নেকি; ভিতরের কথা বুঝ্‌তে পারিস না?

নী। ভিতরের কথা আবার কি?

য। সোহাগরা আগে খেতে পে'ত?

নী। কষ্টে সংসার চলিত বটে।

য। এখন কষ্ট পাওয়া দূরে থাক্‌, দেউড়ীতে দরওয়ান বসাইয়াছে।

নী। নির্ম্মল বাবু খরচ যোগাইতেছেন।

য। আমর্‌, আমিও ত তাই বল্‌ছি।

এতক্ষণে নীহার কথাটার মর্ম্ম প্রণিধান করিল। তখন সে স্কন্ধে চিবুক সংস্পর্শ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল, “ওমা, আমি কোথায় যাব! নির্ম্মল বাবু এমন! তাই বুঝি তিনি সোহাগের বিয়ে দিচ্ছেন না?”

যমুনা বলিল, “তবে আর বল্‌ছি কি? এখন বাবুকে ফেলে তোমার সঙ্গে কি সোহাগ তাস্‌ খেল্‌তে আসবে?”

কিঙ্কর সেখানে আর বসিল না। উঠিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিল। দেখিল, পথি-পার্শ্বে বৃক্ষতলে নির্ম্মলের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিল। পূর্ব্বকথিত গবাক্ষপথ দিয়া সোহাগদের গৃহমধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কিঙ্কর আবার নীচে আসিল। দেখিল, নির্ম্মলের অশ্ব পূর্ব্ববৎ বাঁধা রহিয়াছে। তখন কিঙ্কর, নিজের কক্ষে আসিয়া বসিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিন্তা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

যে ঘরে কিঙ্কর বসিল, সে ঘর সদরে। এ কক্ষের সহিত বাটীর অন্যান্য অংশের বড় একটা সংশ্রব ছিল না; কদাচিৎ কেহ কখন এখানে আসিত। তবে সন্ধ্যার পর দুই চারি জন বন্ধু বান্ধব কখন কখন আসিয়া বসিত। আজ এখন কেহ ছিল না। কিঙ্কর একা বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

পাপকলুষিত হৃদয়ের চিন্তা বা কল্পনার অনুসরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সত্য গোপন করিতেও আমাদের বাসনা নাই। যেহেতু উপন্যাস লেখকের মত সত্যবাদী জগতে বিরল।

প্রায় দুই দণ্ডের পর কিঙ্কর চিন্তা ছাড়িয়া কলম ধরিল। দুই চারি খানা কাগজ ছিঁড়িয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি খাড়া করিল ঃ—

মাননীয়া

শ্রীমতি বিজলিবালা দাসী—

আপনাকে জানাইব না ভাবিয়াছিলাম—আপনার প্রাণে ব্যথা দিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনাকে না জানাইলে আর চলিতেছে না।

কালীনাথের কন্যা সোহাগ আপনার পরিচিতা; শুনিয়াছি পূর্ব্বাবধি আপনাদের বাড়ীতে সে যাতায়াত করিত। এক্ষণে কালীনাথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি আপনার স্বামী নির্ম্মলকুমার সহায় না হইতেন তাহা হইলে কালীনাথের বিধবা, সন্তান সন্ততি সহ না খাইয়া মরিত। যদি নিঃস্বার্থভাবে নির্ম্মলকুমার এ কার্য্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নয়। এক্ষেত্রে তাঁহার স্বার্থ গুরুতর, বাসনা নীচোচিত, কামনা জঘন্য।

সোহাগ বালিকা নয়; সে এক্ষণে ভুবনমোহিনী

তরুণী। রূপানলে সব পুড়ে—নির্ম্মলের ধর্ম্ম পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। নির্ম্মল, রক্ষক হইয়া অনাথা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

আপনি সত্বর আসিয়া না পড়িলে কি ঘটে বলা যায় না। শুনিতেছি, উভয়ের মধ্যে বিবাহ হইবারও প্রস্তাব চলিতেছে।

আমি আপনার অপরিচিত; সুতরাং নাম স্বাক্ষর বৃথা বোধে করিলাম না। ইতি ২৯শে চৈত্র।

পত্রখানা ডাকযোগে বিশালপুরে প্রেরিত হইল। যথা সময়ে বিলি তাহা পাইল। বলা নিস্প্রয়োজন যে, পত্রখানা তৎপূর্ব্বে জ্যোৎস্না ও হারাণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়াছিল। জ্যোৎস্না যাহা খুঁজিতেছিল, এ পত্রে তাহা মিলিল। নির্ম্মলের স্ত্রীর সুখ, শান্তি নষ্ট করা জ্যোৎস্নার উদ্দেশ্য; তাহা এইবার সম্যক্ সাধিত হইল। বিলির ধর্ম্মনষ্ট করা হারাণের অভিপ্রায়; তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সে কথা এখন থাক্।

পত্র পাঠাইয়া কিঙ্কর ভাবিয়াছিল যে, পত্র পাইবামাত্র বিজলি ছুটিয়া আসিবে। পাঁচ দিন অতীত হইল তবু বিজলি আসিল না। সোহাগও আর খেলিতে আসে না।

তখন কিঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে এক বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইল।

বৃদ্ধার নাম, গ্রামস্থ লোকেরা ঠিক জানে না। সকলে তাহাকে হালদার বউ বলিয়া ডাকিত। সেই নামেই সে সংসারে পরিচিত ছিল। হালদারণীর পেশা কি, লোকে ঠিক বলিতে পারিত না—কেমন করিয়া তাহার উদরের কার্য্য চলিত, তাহা গ্রামের মহামহোপাধ্যায়েরা ভাবিয়া নিরাকরণ করিতে পারে নাই। তবে গ্রামের পাঁচ জনে আঁচাআঁচি করিয়া হালদার বউয়ের পবিত্র নামে কত কি বলিত। তাহাতে তাহার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না; গ্রামস্থ ভদ্র মহিলাদের নিকট হইতে পূর্ব্বাবধি যেরূপ সম্মান পাইয়া আসিতেছিল তাহা অক্ষুণ্ণ ও অটুট রহিল।

হালদার ঠাকুরাণীর কেহ ছিলনা; একাকী একখানি পর্ণ কুটীরে বাস করিত। একটি পুষ্টকায় মার্জ্জার ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণী আপাততঃ তাহার শয্যাসঙ্গী ছিল না। গৃহ-কার্য্যে সাহায্য করিবারও কেহ ছিলনা। তা'তে বড় এসে যায় না; কিন্তু কথা কহিবার দোসর না থাকায় ঠাকুরাণীর বড়ই কষ্ট হইত। হালদারণী একটু বেশী কথা কহিতে ভাল বাসিত। একটা কথা শুনিয়া আসিলে, যতক্ষণ

না ঠাকুরাণী সেই কথাটার অন্যূন পঞ্চম সংস্করণ জগতে প্রচার করিতে পারেন ততক্ষণ তিনি স্ফীত উদরে এক বিন্দুও জল গ্রহণ করিতেন না। মূল কথাটা যে, প্রতি সংস্করণে কিছু বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সকল গৃহেই তাঁহার যাতায়াত ছিল,—সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। হালদার ঠাকুরাণীর গতিরোধ করিতে পারে বা তাঁহাকে অসম্মান দেখাইতে পারে এমন মহিলা গ্রামে ছিল না। তিনি তুষ্ট থাকিলে গ্রামের সংবাদ ঘরে বসিয়া প্রত্যহ জানা যাইতে পারে। তিনি রুষ্ট হইলে, ঘরের কথা—সত্য হউক বা মিথ্যা হউক—গ্রাম মধ্যে নানাভাবে প্রচার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং গ্রামস্থ রমণীবৃন্দ, হালদার বউয়ের নামে—ভক্তিতে হউক বা ভয়ে হউক—দিশাহারা হইত। হালদার ঠাকুরাণীর অপ্রীতিকর কোন কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ঠাকুরাণী, গ্রাম শাসন করিতেন।

কিঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া, এই প্রবল পরাক্রমশালিনী রমণীকুল-ভাগ্য-বিধাত্রীর শরণাপন্ন হইল।

বঙ্গসংসার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিলির এখন কাঁদিয়া দিন যায়। দুই চারি দিন অন্তর নির্ম্মল কুমারের এক আধ খানি পত্র বিলির হস্তগত হয়। পত্রগুলি নীরস, কঠিন। বিলি যদি এককালে পত্র না পাইত তাহা হইলে সম্ভবত সে এতটা কাতর হইত না।

হৃদয়ের ব্যথা বিলি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিল না। বুকের ভিতর তুষানল চাপিয়া ধরিয়া বিলি অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিল। আগুনে জল ঢালিবার কেহ নাই। যে নিবাইতে পারে সেই ত এ অনল জ্বালিয়াছে। সুতরাং নিবায় কে?

একদিন একখানা পত্র পাইয়া বিলির যাতনা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। পত্রখানি জাল—হারাণের লিখিত। কিন্তু সে কথা বিলি অবগত ছিল না। ইদানীং যতগুলি পত্র নির্ম্মল বা বিলি, পরস্পর পরস্পরকে লিখিত, সে সমস্তই অপহৃত হইয়া তদ্‌পরিবর্ত্তে কৃত্রিম পত্র প্রেরিত হইত। নির্ম্মল যেমন ভুলিয়াছিলেন, বিলিও তেমনই

প্রতারিত হইয়াছিল। কথিত পত্রে একস্থানে লেখা ছিল ঃ—

"তুমি সুখে আছ, আমি কেন আমার দুঃখের কথা লইয়া তোমার সে সুখ নষ্ট করি? কিন্তু আমি তোমার সুখের কথা শুনিতে চাই না—তোমার পত্রও চাই না। তুমি সুখে থাক; আমি আর তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী নই।"

বিলি, পত্রখানি একবার ভিন্ন দ্বিতীয় বার পাঠ করিল না। একবার পাঠ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। স্বামীর প্রতিকৃতি বুকের উপর ধরিয়া বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেন, প্রভু, দাসীর উপর এত রাগ ক'রেছ? দাসী জিদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—এ অপরাধ কি তাহার মার্জ্জনীয় নহে? এত কাঁদিলাম, তবু কি সে পাপ ধৌত হ'ল না? কতবার কত অপরাধ করিয়াছি—তুমিত দাসীর উপর রুষ্ট হইতে না। আজ কেন, দয়াময়, দাসীকে এত কাঁদাইতেছ? তুমি আদর দিয়া দাসীকে বাড়াইয়াছ—তাই দাসীর এত গর্ব্ব, এত তেজ। তুমি দয়া করিয়া দাসীকে ভালবাস—তাই দাসীর এত সাহস, এত প্রগল্‌ভতা। নতুবা আমি কে? যতক্ষণ তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিতে পাই, ততক্ষণ

আমার গর্ব্ব, ততক্ষণ আমার সৌন্দর্য্য। তুমি পদতলে দাসীকে স্থান না দিলে—।" আর কথা সরিল না। বিলি কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইল।

কিছুকাল পরে একটু সুস্থ হইলে, বিলি, স্বামীকে এক খানি পত্র লিখিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে অনেক কথা লিখিল; কিন্তু ক্ষমা চাহিল না। একস্থানে লিখিল, "তোমায় ছাড়িয়া কি আমি সুখে থাকিতে পারি? বৃক্ষ-আলিঙ্গনে, লতার সুখ ও সৌন্দর্য্য; নতুবা লতার ভাগ্যে পদতলে নিষ্পেষণ।"

পাঁচ দিন পরে এই পত্রের উত্তর বিলির হস্তগত হইল। তাহাতে একস্থানে লিখিত ছিল, "যে লতা, বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া নিষ্পেষিত করিবার উপক্রম করে, সে লতা পরিত্যাজ্য।"

বিলি, এ পত্রের উত্তর দিল না; কেবল নীরবে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইল। অনেক কান্নার পর বিলি স্থির করিল, "ভয় কি, মরিব।" কিন্তু কি করিয়া মরিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। না পারিয়া, রেবতীকে ডাকিল। রেবতী আসিলে বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, কি করে মানুষ মরে?"

রেবতী একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিল, "এক রকমে কি সকল মানুষ মরে, বউ দিদি। কেউ ওলাউঠায় মরে, কেউ বা জ্বর বিকারে মরে, কেউ বা পেটের জ্বালায় মরে। আমার স্বামী যে মরে ছিল, বউদিদি, (হাস্য) সে কথা কি আর বলব (বিকট হাস্য)। তুমি সে কথা শুন্‌লে হেসেই মরে যাবে।"

বিলি বলিল, "হেসে আবার মানুষ মরে নাকি ?"

রেবতী বলিল, "কথাটা শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে।—(চুপি চুপি) একদিন আমার রাগ হ'য়েছিল—আমি ঘর থেকে রাত্রে উঠে গিয়েছিলাম—তাইতে আমার স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। শুন্‌লে ?"

এই তুচ্ছ কথায় একটা অনেক দিনের কথা বিলির মনে জাগিয়া উঠিল ; একদা রাত্রে সোফায় বসিয়া বিলি এক জোড়া কার্পেটের জুতা বুনিতেছিল। জুতা—নির্ম্মলের জন্য ; কিন্তু ছয় মাসেও তাহা শেষ হয় নাই। তা' সেটা নির্ম্মলের দোষ—বিলির নয়। বিলি বুনিতে বসিলে নির্ম্মল কাঁটা চুরি করিয়া, পশম ছিঁড়িয়া গোল বাধাইয়া দিতেন। যাহা হউক কথিত রাত্রে, সুদীর্ঘ কাল বিলম্বের জন্য নির্ম্মল একটু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বিদ্রূপে বিলির

মান জন্মিয়াছিল,—রাত্রি দুই প্রহরেও বিলি কার্য্যে ক্ষান্ত না হইয়া কার্পেটের উপর ফুল তুলিতেছিল। শুইবার জন্য নির্ম্মল কত ডাকিয়াছিলেন, তবু বিলি আসে নাই। অবশেষে নির্ম্মল উঠিয়া, বিলির হস্তস্থিত ছুঁচ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং দুই হস্তে বিলিকে সোফা হইতে শূন্যে উঠাইয়া শয্যার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে বিলির দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। অভিমানের প্রথম কারণ,—বুনিতে না দেওয়া; দ্বিতীয় কারণ,—শূন্যে উত্থান; তৃতীয় কারণ,— শূন্যে ভ্রমণকালে বিলির পরিহিত বসন একটু বিস্রস্ত হইয়াছিল। ত্রিবিধ কারণে বিলির দুর্জ্জয় মান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল;—বিলি, পালঙ্ক হইতে নামিয়া হর্ম্ম্যতলে ধূলার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মল তখন বিলির দেহ স্বীয় অঙ্কোপরি টানিয়া লইয়া কত রকমে, কত আদরে বিলির মান ভাঙ্গিয়াছিলেন;—সে সব কথা বিলির মনে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। সে আদর, সে সোহাগ মনে হওয়াতে বিলির দেহ কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষে জল আসিল। হায়, সে আদর এখন কোথায় গেল!

রেবতী মনে করিয়াছিল, না জানি বউদিদি কত হাসিবে। এক্ষণে বিলিকে কাঁদিতে দেখিয়া রেবতী

বিস্মিত হইল। বিস্ময় ক্ষণকালের জন্য। পর মুহূর্ত্তে রেবতী সুর ফিরাইয়া অঞ্চলাগ্রে চক্ষের কোণ মুছিতে মুছিতে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "তা' বউদিদি, কাঁদ্‌বারই কথা। জলজ্যান্ত মানুষটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরে গেল—ব্যায়রাম নয়, কিছু নয়—"

বিলি নীরবে অতীতের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিল। রেবতী আপন মনে কত কি বকিয়া যাইতে থাকিল। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাবুর জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছে। বিলি তখন চক্ষের জল মুছিয়া দাসীর অনুসরণ করিল।

সত্যই রমেশের রোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আগে চিন্তার ততটা কারণ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে জ্বরের সঙ্গে কতকগুলা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। যখন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল. তখন জ্যোৎস্না, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে জাঁকিয়া বসিলেন। কড়া হুকুমে দেওয়ান, গোমস্তা, দ্বারবান প্রভৃতিকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিলেন; ডাক্তার আনিতে হারাণকে পাঠাইলেন। রুদ্রপুর গ্রামে একজন ক্যাম্বেল-পাশকরা নবীন ডাক্তার ছিল। হারাণ তাহাকে লইয়া আসিল। জমীদার ভবনে তখনও কয়েকজন ডাক্তার

বৈদ্য ছিলেন। ব্যায়রাম বৃদ্ধি হওয়ায় জ্যোৎস্না, তাহাদের জবাব দিলেন এবং এই নবীন চিকিৎসককে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

জ্বর যখন বাড়িত তখন রমেশের চৈতন্য থাকিত না; জ্বর কমিয়া আসিলে রমেশ এত অবসন্ন হইয়া পড়িতেন যে, কথা কহিতে তাঁহার কষ্ট বোধ হইত। জ্যোৎস্নার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বিবাদ করিবার শক্তি এক্ষণে রমেশের নাই। সুতরাং তিনি নীরব থাকিতেন।

বিলি দেখিত; শুনিত, কিন্তু নীরব থাকিত। যখন দাদা নীরব, তখন প্রতিবাদ করিবার বিলির অধিকার কি? কিন্তু নবীন ডাক্তারের চিকিৎসা, বিলি পছন্দ করিল না।

প্রথম দিনেই একটু গোল বাধিল। ডাক্তার জোলাপ ব্যবস্থা করিয়াছে। বিলি তাহা খাইতে দিবে না। বলিল, "এ দুর্ব্বল অবস্থায় রোগীকে জোলাপ খাইতে দিতে পারি না।"

জ্যোৎস্না ঔষধিপূর্ণ পাত্র হস্তে শয্যার উপর বসিয়া স্বামীকে জোলাপ খাওয়াইতে উদ্যত,বিলি তাহাতে প্রতি-

বাদী। অন্যান্য পুরমহিলারা হর্ম্ম্যতলে বসিয়া এই বিচিত্র কলহ শ্রবণ করিতেছিলেন। রোগী শয্যাশায়িত—জাগ্রত কি নিদ্রিত, কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না।

জ্যোৎস্না বলিলেন, "দেখিতেছি তুমি চিকিৎসা শাস্ত্রেও পণ্ডিতা। তবে তুমিই কেন চিকিৎসাভার গ্রহণ করনা?"

বিলি উত্তর করিল, "যে রকম ব্যবস্থা দেখিতেছি, হয়ত বা আমাকেই ভার নিতে হয়।"

জ্যো। কেন, কি দেখিলে ?

বি। সব তাড়াইয়া এখন এক মূর্খ ডাক্তারের চিকিৎসা ! বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, সাহেব ডাক্তারকে আনাও।

জ্যো। যখন পরামর্শ চাহিব, তখন দিও। সাহেব আসিলে বিশ থান মোহর দিতে হইবে, তা' জান ?

বি। দাদার টাকার অভাব কি ?

জ্যো। পরের টাকা লোকে অনেক দেখে।

বি। না হয় আমি টাকা দিব।

জ্যো। তুমি কোথায় পাবে ? এক পয়সার জিনিস পাঠাইয়াও যাহার কেহ তত্ত্ব লয় না, সে বিশ থান মোহরের কথা মুখে আনিলে হাসি পায়।

কথাটা বিলির প্রাণে লাগিল, সে যে এখন বড় দুঃখী। বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া বিলি ধীরে ধীরে বলিল, "না হয় গহনা বেচিয়া দিব।"

জ্যো। সে কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে।

বি। আমি জোলাপ খাইতে দিব না।

জ্যো। আপত্তি করিবার তোমার অধিকার কি?

বি। আছে কিনা দাদা জানেন।

জ্যোৎস্না একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বই কি। আমি কে?"

বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া বিলি বলিল, "যদি একান্তই জোলাপ খাওয়াতে হয় তা'হলে গ্রামের ডাক্তার ডাকিয়া পরামর্শ লওয়া হউক।"

এ প্রস্তাবে জ্যোৎস্না হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বধূগ্রামে গিয়া তোমার মতামত প্রকাশ করিও।"

এমন সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, রমেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছেন। আজ দুই দিন একবারও যে উঠিয়া বসে নাই, সে সহসা উঠিয়া বসে কেন? বিলি তাড়াতাড়ি রমেশের মাথা ধরিয়া উপাধানের উপর রক্ষা করিল। রমেশ বলিলেন, "জোলাপ কই?"

জ্যোৎস্না হাত বাড়াইয়া পাত্র দিল। দিবার সময় বিলির পানে একটু কটাক্ষপাত করিল—গরবে ওষ্ঠ ফুলাইয়া একটু হাসিল। বিলির মুখ শুকাইয়া গেল।

পাত্র হাতে লইয়া রমেশ তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত ভিনাসের মূর্ত্তির উপর পড়িয়া কাচ পাত্র শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে জ্যোৎস্নার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেখানে আর বসিলেন না,—নয়নাগ্নিতে রমেশকে দগ্ধ করিতে করিতে বিনা বাক্যব্যয়ে জ্বালাময়ী উল্কার ন্যায়, দ্রুত পাদবিক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রমেশ তখন দেওয়ানকে ডাকাইলেন। দেওয়ান আসিলে বিলি কক্ষান্তরে যাইবার উপক্রম করিল। রমেশ বলিলেন, "বিজলি, আমার কাছে বইস।"

বিলি বসিল—একটু ঘোমটা টানিয়া বসিল। রমেশ বলিলেন, "দেওয়ান, এ সংসারে তুমি অনেক দিন আছ; আমার ভগ্নী বালিকা বিজলিকে মনে পড়ে কি?"

দেওয়ান বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, বেশ মনে আছে।"

রমেশ বলিলেন,"বিজলি আজি হইতে তোমার জননী। তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা

প্রতিপালন করিবে। আমার আদেশের উপর—সকলের আদেশের উপর তাঁহার আদেশ প্রবল থাকিবে।"

দেওয়ান সানন্দে বলিল, "যে আজ্ঞা।"

রমেশ বলিলেন, "বিজু, দেওয়ান বৃদ্ধ আমাদের পিতৃ তুল্য! তাঁহার সহিত কথা কহিতে সঙ্কোচ করিও না।"

বিজলি কিছু বলিল না—সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

একটা কথা সহসা রমেশের মনে উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "আমি মৃত্যু শয্যায় শুইয়াছি—বাঁচিবার আশা খুব কম। আমি মরিলে কে আমার বিষয় পাইবে? জ্যোৎস্না? জ্যোৎস্না আমার কে? পরিণীতা ভার্য্যা। কিন্তু জ্যোৎস্না কি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার সুখদুঃখ-ভাগিনী?" কিছুকাল রমেশ নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "দেওয়ান, সত্বর উইল করিব ইচ্ছা করিয়াছি—সুবিধামত তোমায় উপদেশ দিব।"

অবসন্ন হইয়া রমেশ শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে বিলি, ব্যাকুল হইয়া ডাক্তার সাহেবকে আনিতে দেওয়ানকে অনুরোধ করিল। সেই রাত্রেই বিশদেঁড়ে পান্‌সী সাহেবকে আনিতে বহরমপুরাভিমুখে ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটা বড় ভুল হইয়াছে ;—রমেশের বাড়ীটা কেমন তাহা কিছু বলা হয় নাই। বহির্ব্বাটীর সহিত আমাদের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অন্তঃপুরের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেই লেখকের অব্যাহতি; পাঠকেরও নিষ্কৃতি।

অন্তঃপুর চারি মহল; তা'ছাড়া আর একটী মহল আছে; সেটাকে অন্তঃপুর মধ্যে ধরিব কি না স্থির করিতে পারিতেছি না। এ মহল—সদর, অন্দরের মধ্যে অবস্থিত। যাঁহারা নিকটাত্মীয়, দুই চারি দিবসের জন্য আসিতেন,—তাঁহারা এই মহলে স্থান পাইতেন। হারাণ এই মহলে দুইটি ঘর পাইয়াছিল।

এই মহল পার হইয়া ডাহিনে গৃহিণীর খণ্ড। এ অংশ পুরাতন, রমেশের পিতা পূর্ব্বে এই অংশে বাস করিতেন। এক্ষণে রমেশের মা তথায় থাকেন। বিলি যখন পিত্রালয়ে আসিত তখন এই অংশে মায়ের কাছে থাকিত।

এই খণ্ডের সম্মুখে দ্বিতীয় মহল। আত্মীয়-কুটুম্ব-কন্যাগণ এই মহলে বাস করিতেন। এই খণ্ড পুরাকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং কক্ষনিচয় ক্ষুদ্র, অনুচ্চ ও গবাক্ষহীন।

তারপর তৃতীয় মহল। এটা প্রথম মহলের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। বিবাহের পর রমেশ, এই অংশ নির্ম্মাণ করেন। নানাদেশ হইতে কারিগর ও মিস্ত্রী আনাইয়া রমেশ এই খণ্ড সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যময়ী স্ত্রী লইয়া রমেশ এই মহলে পূর্ব্বে বাস করিতেন। এই অংশ দ্বিতল। নিম্নে পরিচারিকারা থাকিত। উপরে সুসজ্জিত শোভাময় বৃহদায়তন কক্ষনিচয়; রমেশ তথায় সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি অনেক আশা করিয়া এই ঘরগুলি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তথায় আর বাস করেন না, জ্যোৎস্না একাকী অধিষ্ঠান করেন।

এই মহলের পুরোভাগে—সদর খণ্ডের সন্নিকটে—চতুর্থ বা নূতন মহল। এই অংশ—জানিনা কেন—এক বৎসর পূর্ব্বে রমেশ নিজের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অন্যান্য মহলের সহিত ইহার সম্বন্ধ খুব কম।

মহলটি দ্বিতল। উপরে ছয়টি বড় ঘর। মধ্যস্থলে. সুপ্রশস্ত অত্যুচ্চ হল। এই হল ঘরের পূর্ব্ব দিকে তিনটি ও পশ্চিম দিকে তিনটি ঘর। দক্ষিণে বারাণ্ডা; উত্তরে সিঁড়ি। হল ঘর ভিন্ন, এই কক্ষ নিচয়ে প্রবেশ করিবার অন্যপথ নাই।

রমেশ, পূর্ব্বদিকের গৃহনিচয়ে অবস্থান করিতেছেন। মধ্যের ঘর তাঁহার শয্যাগৃহ। ঘরটি খুব বড়। এই ঘরের ভিতর দিয়া পার্শ্বস্থিত দুইটি ঘরে যাওয়া যায়। সে ঘর দুইটির উল্লেখে প্রয়োজন নাই।

শয্যাগৃহে, সাজ সজ্জার বড় একটা ঘটা নাই। কার্পেট-মণ্ডিত মেজের উপর সোফা বা কোচের আড়ম্বর নাই; ভিত্তি গাত্রে র‍্যাফেল বা রেনল্ডস্ লিখিত ছবি নাই। শুভ্র প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছোট ছবি;—রমেশের পিতৃপুরুষের প্রতিকৃতি মাত্র। ঘরের কোণ চতুষ্টয়ে পাথরের চারিটি বড় পুতুল; একদিকে একখানি বড় আয়না, কয়েকটা কেতাবের আল্‌মারি, একটা ঘড়ি, একখানি পালঙ্ক, কয়েকখানি মখমলমণ্ডিত কাষ্ঠাসন, দুইটা টেবিল, কয়েকটা দেয়ালগিরি কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

হল ঘরের অপর দিকে এই রকম তিনটী ঘর আছে। আজ দুই দিন হইতে বিলি ও তাহার মা এইখানে বাস করিতেছেন। রমেশের ব্যায়রাম বাড়িয়াছে, দূরে থাকিলে এখন চলে না।

সদর হইতে রমেশের মহলে আসিতে হইলে অন্যান্য মহল অতিক্রম করিতে হয় না। অন্যান্য খণ্ড বা চক হইতে এই মহলে আসিবার বিভিন্ন পথ আছে।

রমেশের মহলে আমাদের একটু প্রয়োজন আছে, তাই তাহার একটু বিস্তৃত বর্ণনা করিলাম। আমরা এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলিতে আর কোন আপত্তি নাই।

পরদিন মধ্যাহ্নে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া রোগীর বগলে থার্ম্মমেটার লাগাইলেন—ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা বুক পিঠ পরীক্ষা করিলেন—ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী ও শ্বাস গণিলেন। অবশেষে অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "কেস্ সিরিয়াস্।" (রোগ কঠিন।)

জ্যোৎস্না, স্বামীর পার্শ্বে শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় আছে কি, সাহেব?"

সাহেব, একবার শয্যাশায়িত অচৈতন্যপ্রায় রোগীর পানে চাহিয়া দেখিলেন,—একবার জ্যোৎস্নার সদ্যঃস্নাত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-সন্নিভ, অশ্রুসিক্ত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি পানে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি, বিবি? রোগী ভাল হইবে;—আপনি কাঁদিবেন না। আমার চিকিৎসা এতদিন চলিলে রোগী সুস্থ হইত।"

কক্ষে, দেওয়ান ও দুই একজন ডাক্তার ছিল। বিলি পার্শ্বের ঘরে দ্বার অন্তরালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিল।

জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিনে রোগী সুস্থ হইতে পারেন?"

সাহেব। চার পাঁচ দিন কাটিয়া না গেলে ঠিক্ বলিতে পারি না।

জ্যো। তবে এই চার পাঁচদিন রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন বলুন?

সা। ঠিক তা নয়। জ্বর কমিবার সময় একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন—কি জানি যদি নাড়ী ছাড়ে। প্রতিকারার্থ আমি একটা ঔষধ দিতেছি।

জ্যো। আপনার বাক্স হইতে ঔষধ দিতে হইবে না; এ গ্রামে ঔষধ পাওয়া যায়।

সা। পাওয়া যাইতে পারে,—কিন্তু এমন টাট্‌কা ঔষধ মিলিবে না।

জ্যো। আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম; কিন্তু গ্রামের ঔষধালয়ে আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ।

সাহেব ঔষধের বাক্স খুলিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা বন্ধ করিয়া কয়েকটা ব্যবস্থাপত্র লিখিতে বসিলেন। লেখা হইলে দেওয়ানকে কিছু উপদেশ দিয়া হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইত্যবসরে বিলি পাশের ঘরে দেওয়ানকে ডাকাইল। দেওয়ান আসিলে বিলি বলিল, "দুইটি কথা বলিতে আপনাকে ডাকিয়াছি। আপনি পিতৃতুল্য, অপরাধ লইবেন না।"

দেওয়ান বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

বিলি। সাহেব যাহাতে প্রত্যহ একবার করিয়া আসেন এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাকার মায়া করিবেন না।

দে। যে আজ্ঞা। দ্বিতীয় আদেশ কি?

বি। গ্রামের ঔষধ লওয়া হইবে না, সেগুলা তত টাট্‌কা নয়।

দে। সাহেবের নিকট হইতে ঔষধ লইব ?

বি। তাহাই আমার অভিপ্রায়। যদি সকল ঔষধ সাহেবের নিকট না থাকে তাহা হইলে বহরমপুরে লোক পাঠাইয়া দিন্।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ান বিদায় হইল; এবং বিলির ইচ্ছামত সকল ব্যবস্থা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
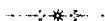
সাহেব বিদায় হইলে জ্যোৎস্না নিজের কক্ষে উঠিয়া আসিলেন। তথায় বাতায়ন সন্নিধানে বসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া যখন একটা মতলব স্থির হইল তখন তিনি হারাণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হারাণ আসিয়া একখানা কৌচে বসিল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছ ?"

হারাণ। কি ?

জ্যো। উইল হ'বে।

হা। কা'র ?

জ্যো। কা'র আবার ? বাবুর।

হা। ব্যায়রাম কি তবে সাংঘাতিক ?

জ্যো। তা ঠিক নয় ; তবে কঠিন বটে।

হা। উইলের উদ্দেশ্য ?

জ্যো। প্রকৃত ওয়ারিশকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়।

হা। প্রকৃত ওয়ারিশ কে ?

জ্যো। আমি।

হা। সম্পত্তি কাহাকে দেওয়া উদ্দেশ্য ?

জ্যো। সম্ভবত বিজলিকে।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল। উইলের উপর নিজের ইষ্টানিষ্ট কতটা নির্ভর করিতেছে তাহা একবার ভাবিয়া লইল। দেখিল, বিষয় ভগ্নীর থাকিলে তাহার থাকিবে। অতএব স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক বিষয় রাখিতে হইবে। জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি উইল করি-বার পূর্ব্বে বাবু মারা যান্ তা হলে—?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম। ডাক্তারকে ডাক, একটা পরামর্শ এখনি স্থির করিতে হইবে।"

কিছু পরে ডাক্তার আসিল। জ্যোৎস্নার মহলে পুরুষ মানুষকে আসিতে দেখিলে কেহ বিস্মিত হইত না। নায়েব, গোমস্তা, প্রায় সকল সময়ে আসিত, যাইত। ডাক্তারও হারাণের সঙ্গে পূর্ব্বাবধি আসিত, এখনও আসিল।

ডাক্তারের বাড়ী রুদ্রপুরে। তাহার কিছু জমী-জমা আছে; কিন্তু তাহাতে কুলায় না। ক্যাম্বেলে পাশ করিয়া এখন সে স্বগ্রামেই ডাক্তারি করিতেছে। ডাক্তারের নাম নবীন। সে বয়সেও নবীন। ডাক্তারের রূপের অভাব নাই, কিন্তু গুণের অভাব ছিল। বেশ ও কেশের পারিপাট্যের ক্রুটি নাই। পরিধানে মিহি সিমলার ধুতি, গায়ে বেল্‌দার পিরাণ, হাতে ছড়ি, সুরঞ্জিত কেশ, অধর প্রান্তে মৃদুহাসি, প্রভৃতি আয়ুধে সজ্জিত হইয়া ডাক্তার, জ্যোৎস্নার কক্ষে উদয় হইল।

জ্যোৎস্না একখানি পালঙ্কের উপর শয়ান ছিলেন; শুভ্র শয্যার উপর শুভ্র লতিকা—যেন জ্যোৎস্নার কোলে বিদ্যুল্লতা। ডাক্তারকে দেখিয়া জ্যোৎস্না শয্যোপরি উঠিয়া বসিলেন এবং মাথার কাপড় উঠাইয়া দিবার একটু ভাণ করিলেন। কাপড় তত উর্দ্ধে উঠিল না—কবরী পর্য্যন্ত পৌছিয়াই ক্ষান্ত হইল।

ডাক্তার একখানা কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিল। হারাণ বাহিরে পাহারায় রহিল। সকলই হইল, কিন্তু কি বলিয়া কথা তুলিতে হইবে জ্যোৎস্না ঠিক করিতে পারিলেন না; সুতরাং নীরব রহিলেন। ভাব দেখিয়া ডাক্তার একটু বিস্মিত হইল। লজ্জাহীনা মুখরা, জ্যোৎস্নার এমন ভাব কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাধনার ফল কি মিলিবে না, জ্যোৎস্না? দয়া কি হ'বে না?"

জ্যোৎস্না। যাহা এক বৎসরে উপায় করিতে পার না, তাহা দিবার জন্য রুদ্রপুর হইতে তোমায় আনিয়াছি, ইহা কি যথেষ্ট দয়া নয়?

ডা। কৈশোরে যাহার লোভ দেখাইয়াছিলে তাহাই আমি চাই; তা'র নিকট তোমার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার অতি তুচ্ছ।

জ্যো। আত্মবিস্মৃত হইওনা, ডাক্তার।

ডা। দর্পণে কি নিজের মুখ কখন দেখ নাই? যদি দেখিতে তাহা হইলে তুমিও আত্মবিস্মৃত হইতে।

কথাটায় জ্যোৎস্না প্রীত হইলেন। বলিলেন, "বাল্যকালের কথা আজও ভুল নাই?"

ডা। তাহা ভুলিতে পারি, কিন্তু যৌবনের রেখা?

জ্যো। বিবাহের পর নির্জ্জনে তোমার সহিত কখন দু'টা কথা কহি নাই।

ডা। সে কথা বলিতেছি না; যৌবনে তোমার রূপ-বিকাশের কথা বলিতেছি।

জ্যো। দেখিতেছি, তুমি রূপোন্মাদ। ছিঃ।

ডা। সে উন্মত্ততা কি দোষণীয়? তাই যদি হয়, তবে ঠাকুর দেবতাকে সুন্দর করিয়া সাজাই কেন?

জ্যো। আত্মতৃপ্তির জন্য।

ডা। আমারও তাই। তোমাকে ভাবিলে আমি তৃপ্তি পাই, দেখিলে উন্মাদ হই। এত রূপ বুঝি ঠাকুর দেবতারও নাই।

জ্যো। যে পরস্ত্রীকে ভালবাসে সে কি ধার্ম্মিক?

ডা। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম, শান্তি—তোমার রূপানলে অনেক দিন ভস্মীভুত হইয়াছে।

জ্যো। তবে আর আছে কি?

ডা। আছে—কামনা।

জ্যো। সেটা পুড়ে নাই?

ডা। না, সেটা অবিনশ্বর।

জ্যো। কামনাপূর্ণ দগ্ধীভূত হৃদয় আমায় দিতে আসিয়াছ?

ডা। আমার সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে ঢালিতে আসিয়াছি।

জ্যো। সর্ব্বস্ব দিবে?

ডা। সর্ব্বস্ব দিব।

জ্যো। ভাল, পরীক্ষা করা যাইবে।

ডা। এখনি কর।

জ্যো। এখনি? এখনি কেমন করিয়া পরীক্ষা করি?

বলিয়া জ্যোৎস্না একটু ভাবিলেন। ক্ষণপরে কর্ণফুল দোলাইয়া, মধুর হাসিতে রক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ও সুবিস্তৃত উজ্জ্বল, চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়া তোমার ভালবাসার পরিচয় দেও।"

ডা। তিনি ত আমার চিকিৎসাধীন নন।

জ্যো। গোপনে চিকিৎসা চলিতে পারে।

ডা। সে কিরূপ?

জ্যো। এই মনে কর, তুমি আমায় একটা ঔষধ দিলে, আমি তাহা গোপনে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে শিশির ভিতর মিশাইয়া দিলাম।

ডাক্তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। জ্যোৎস্নার এ কথাটা তাহার ভাল লাগিল না। মনে কেমন একটু খট্‌কা জন্মিল। স্বল্পকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "একটা ঔষধে যদি রোগ সারাইতে পারিতাম তাহা হইলে জগতে আমি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইতাম।"

জ্যো। শুনিয়াছি এমন একটা ঔষধ আছে যে, তাহা সেবন করাইবা মাত্র জ্বর ত্যাগ হয়।

ডা। একটা কেন, এমন তিনটা ঔষধ আছে।

জ্যো। তবে আর ভাবনা কি?

ডা। ভাবনা সম্পূর্ণ। এ ঔষধ, সকল রোগীকে দেওয়া নিরাপদ নয়।

জ্যো। কেন?

ডা। দুর্ব্বল রোগীর নাড়ী ছাড়িতে পারে।

জ্যো। তা' হ'লে?

ডা। তা' হলে মৃত্যু।

জ্যো। উত্তেজক ঔষধে বাঁচান যায় না?

ডা। সেটা রোগীর বলের উপর নির্ভর করে।

জ্যো। যে রোগীর কথা হইতেছিল তাঁহাকে বোধ হয় এ ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে?

ডা। খাওয়ান সম্পূর্ণ বিপজ্জনক।

জ্যো। কেন?

ডা। মৃত্যু সুনিশ্চয়।

উভয়ে নীরব। ক্ষণপরে জ্যোৎস্না বলিলেন, "আমার সন্দেহ হয়, ডাক্তার সাহেব ঐ রকম একটা কি ঔষধ দিয়াছেন। ঔষধের নাম কি?"

ডাক্তার তীব্র দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিল। জ্যোৎস্নার মনোভাব ডাক্তারের নিকট অবিদিত রহিল না। জ্যোৎস্নাও তাহা বুঝিলেন। ডাক্তার উত্তর করিল, "কই, ঔষধের নাম ত মনে হচ্ছে না। কেতাব দেখিলে বলিতে পারি।"

জ্যো। কেতাব সঙ্গে আছে?

ডা। সে কেতাব খানা বুঝি সঙ্গে আনি নাই।

এবার জ্যোৎস্না তীব্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া দেখিলেন। ডাক্তারের দৃষ্টির কোন ব্যতিক্রম নাই, তবে চক্ষু দু'টা যেন আরও উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ তোমার কাছে আছে?"

ডা। আছে।

জ্যো। দিতে পার?

ডা। পারি, কিন্তু—

জ্যো। কিন্তু কি?

ডা। এখন নয়।

জ্যো। কখন? কোথায়?

ডা। রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এইখানে।

লজ্জায়, ঘৃণায় জ্যোৎস্নার মুখ আরক্তিম হইল। ডাক্তারের স্পর্দ্ধা ও প্রগল্‌ভতা দেখিয়া জ্যোৎস্নার যে রাগ হইল না তা' বলা যায় না; তবে ততটা নহে। কেন না জোর কম।

যাই হউক জ্যোৎস্নার রাগিলে চলে না। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধের কি মূল্য নাই?"

ডা। মূল্যই ত চাহিয়াছি।

জ্যোৎস্না আর কোন উত্তর করিলেন না—নীরবে বসিয়া রহিলেন। ডাক্তার উঠিয়া একটা গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোৎস্না, চিন্তার অবসর পাইলেন। তিনি একখানি সংবাদ পত্র চোখের সাম্‌নে ধরিয়া চিন্তা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন।

ইত্যবসরে ডাক্তার গবাক্ষ ছাড়িয়া, একখানি চিত্র

সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রখানি—ক্লিওপেট্রার। সেখানি অতি সুন্দর। দেখিল, অনন্তব্যাপী সমুদ্রতলে কুসুমিত লতামণ্ডপ মধ্যে ভুবনমোহিনী সুন্দরী ক্লিওপেট্রা। উপরে নীলাকাশ, নীচে নীল জল; পশ্চিমে বারিধিহৃদয়ে, ভানু অস্তপ্রায়; মধ্যাকাশে লালছটা। সেই অনন্তের তলে, সেই অনন্তের কূলে—বিহঙ্গম-কূজিত, নবপত্রবিশোভিত, কুসুমিত লতামণ্ডপ মধ্যে—পুষ্পিত লতাপুঞ্জের উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় লোকললামভূতা, পূর্ণ বিকসিতা যুবতী। পদতলে বারিধিবক্ষে, সুবর্ণ কোকনদ; মাথার উপর—গগনোপরি হৈমছত্র। হাস্যময়ী প্রকৃতির হাস্যময় উদ্যান মধ্যে বিবশা, অর্দ্ধনগ্না, ফুল্লযৌবনা, প্রেম-নায়িকা ক্লিওপেট্রা। পুষ্পিত লতিকা-নিচয় সেই ফুল্ল কুসুমিত দেহতরু অবলম্বন করিবার আশায় চারিধার হইতে হেলিয়া পড়িয়াছে। সেই সৌন্দর্য্যময়ী সুবর্ণ প্রতিমার সংস্পর্শে, সেই পুষ্পময়ী লতিকা—ফুলের পাশে পাতার ন্যায়—মলিন হইয়া পড়িয়াছে। বায়ুসঞ্চালিত, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত বেণীসম্বদ্ধ কুন্তলরাশি অনাবৃত বক্ষের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যেন স্মরহর-গঙ্গাধরশিরোভূষণ ভুজঙ্গ-নিচয়, মদনমন্দির ভস্ম করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

চিত্র দেখিয়া ডাক্তার মুগ্ধ হইল। আঁখি ফিরাইয়া পার্শ্বস্থিত জীবন্ত প্রতিমা পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, চিত্র ও প্রতিমায় সাদৃশ্য আছে—উভয়ের মুখে বাসনা ও ভোগলিপ্সা পরিব্যক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে জ্যোৎস্না তাহা জানে না। জ্যোৎস্না ভাবিত, নিজের বাসনা পরিতৃপ্তিই জীবধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই। বাসনা পরিতৃপ্তির প্রথম সোপান—ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির পথে কেহ কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলে, জ্যোৎস্না, সর্ব্বধর্ম্ম পদদলিত করিয়া সেই কণ্টকোদ্ধার করিতে সঙ্কুচিত হইত না। মানাপমান, পদগৌরব, এ সকল বিষয়ে জ্যোৎস্নার বেশ লক্ষ্য ছিল। কে কোন্ কথায় তাহাকে অপমান করিল, কে কোন্ কার্য্যের দ্বারা তাহাকে অসম্মান দেখাইল, জ্যোৎস্না তাহা লক্ষ্য রাখিত। জ্যোৎস্না, দাস দাসীদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না; ভাবিত, তাহাতে বুঝিবা খর্ব্বতা হইবে। একদা একজন ভৃত্য ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল; তদ্দৃষ্টে রমেশ ছুটিয়া গিয়া স্বহস্তে তাহার ক্ষত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই অপরাধে জ্যোৎস্না, রমেশকে ছোট লোক বলিয়া গালি দিয়াছিল।

জ্যোৎস্না, পতিব্রতা না হইলেও ঠিক কলঙ্কিনী নয়। ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া যে জ্যোৎস্না সতী ছিল তাহা নয়; সম অবস্থাপন্ন প্রণয়াস্পদ মিলিত না বলিয়া সম্ভবত জ্যোৎস্না সতী ছিল। দেওয়ান-নায়েবের বা নবীন ডাক্তারের মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত প্রেম করা জ্যোৎস্নার পক্ষে অগৌরবের কথা। একবার বৎসরেক পূর্ব্বে জ্যোৎস্না, মনের মত প্রণয়াস্পদ পাইয়াছিল। পাইয়া তাহার পায়ে অযাচিত ভালবাসা ঢালিয়াছিল; কিন্তু প্রতিদান মিলে নাই। এ প্রণয়াস্পদ—নির্ম্মল-কুমার। বৎসরেক পূর্ব্বে নির্ম্মলকুমার একবার সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন। নির্ম্মলের রূপে মুগ্ধ হইয়া জ্যোৎস্না কুরূপ স্বামীর শয্যাত্যাগ করিয়া, ফুটন্ত রূপ-যৌবন লইয়া নির্ম্মলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। নির্ম্মল, প্রথমে ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নাকে বুঝাইয়াছিলেন, পরে জ্বালাময়ী তীব্রভাষায় জ্যোৎস্নার অযাচিত ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সম্ভবত রমেশের মনে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জন্মিয়া থাকিবে; নতুবা কেন তিনি বৎসরেক হইতে স্বতন্ত্র মহলে অবস্থান করিবেন? যাই হউক, এই ঘটনার পর হইতে নির্ম্মলকুমার শ্বশুরালয়ে

যাতায়াত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদবধি জ্যোৎস্না, নির্ম্মলের শত্রু—বিজলীর শত্রু। সে কথা এখন যাক্।

এক্ষণে জ্যোৎস্নাতে ক্লিওপেট্রার সাদৃশ্য দেখিয়া ডাক্তারের সাহস বাড়িয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে আসিয়া পালঙ্কের উপর জ্যোৎস্নার পার্শ্বে বসিল। জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎগতিতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমার ঔষধে প্রয়োজন নাই—তুমি দূর হও।"

ডাক্তার উঠিল না, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "রাগ করিও না, জ্যোৎস্না; তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কিন্তু তোমার আশা কোন মতে ছাড়িতে পারিব না।"

জ্যো। এখন আমার মন স্থির নাই—তুমি যাও।

ডা। তবে আবার কখন এখানে আসিব?

জ্যো। এখানে? কেন? এখানে আর নয়।

ডা। তবে কোথায়?

জ্যো। কোথাও না। বলিয়াছি ত ঔষধে আর প্রয়োজন নাই।

ডা। প্রয়োজন না থাকিলেও আমি ঔষধ দিব। তুমি

না লও, তোমার স্বামীকে দিয়া আসিব। তাঁহাকে বলিব, তুমি চাহিয়াছিলে।

জ্যোৎস্নার মুখ শুকাইয়া গেল। নিজেই এ বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে উপায়ান্তর কি? জ্যোৎস্না বলিলেন, "যাহাকে ভালবাস বলিতেছ তাহার উপর অত্যাচার কর কেন?"

ডা। ভালবাসি বলিয়াই অর্থ বিনিময়ে তোমায় চাহিয়াছি।

জ্যোৎস্না চিন্তাভিভূতা হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মতলব আঁটিয়া বলিলেন, "ভাল, ঔষধি আনিও।"

ডা। কোথায় আনিব? এইখানে?

জ্যো। না; এখানে নয়;—উদ্যান মধ্যে ঘাটের উপর—বকুলতলায়।

ডা। কখন আসিব?

জ্যো। রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

ডা। কেমন করিয়া তথায় প্রবেশলাভ করিব?

জ্যো। উদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত রাখিব।

ডাক্তার কক্ষত্যাগ করিল। তখন হারাণ আসিয়া দেখা দিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "সে কথা পরে বলিব। আগে আমার কথা মন দিয়া শুন।"

তখন ভ্রাতা ভগ্নীতে অনেক কথা হইল। ফলাফল কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। পরামর্শ স্থির হইলে জ্যোৎস্না বলিলেন, "আগামী কল্য প্রত্যূষে ডাক্তারকে তাহার প্রাপ্য দিয়া বিদায় করিয়া দিতে দেওয়ানকে বলিবে। ডাক্তার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে আসিতে দিবে না।"

উপদেশ মত কার্য্য করিতে হারাণ চলিয়া গেল। চিন্তাক্ষুব্ধ হৃদয়ে জ্যোৎস্না, স্বামীর কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেখানে আসিয়া জ্যোৎস্না দেখিলেন, বধূগ্রাম হইতে দুইজন দাসী দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছে। নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী,—বেদানা, কিস্‌মিস্, নাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, মিশ্রী, বাতাসা,—রমেশের কক্ষমধ্যে

বিস্তৃত রহিয়াছে। বিজুর শ্বশ্রূ-প্রেরিত দ্রব্যনিচয় রমেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শয্যাশায়িত, বিজু পদতলে উপবিষ্টা। দাসীরা হর্ম্ম্যতলে বসিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতেছে। জ্যোৎস্না, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে দাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। জ্যোৎস্না বলিলেন, "কিগো, এতদিন পরে মনে পড়েছে? ভেবেছিলাম, আমাদের বুঝি তোমরা ত্যাগ করেছ।"

এ কটাক্ষপাত বিজলীর উপর—রমেশ তাহা বুঝিলেন। কিন্তু দাসীরা বুঝিল না। তাহাদের মধ্যে যে প্রাচীনা সে বলিল, "মা, আমরা আপনাদের চরণের দাসী, আমাদের অমন কথা বল্‌বেন না।"

জ্যো। আমাদের এত বড় বিপদ, তোমাদের বাবু একবার আমাদের খোঁজও নিলেন না। স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়ে কি তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন?

দা। তিনি একটু গোলে পড়েছেন, কোথাও গেলে চলে না।

জ্যো। গোলটা কি?

দাসী তখন কালী খুড়ার মৃত্যুশয্যায় নির্ম্মলের দায়িত্ব গ্রহণের কথা, সোহাগের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা, বিষয় লইয়া

কেদার জেঠার সহিত মামলা-মকর্দ্দমার কথা, সবিস্তারে বিবৃত করিল।

শুনিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোহাগের বয়স কত?"

দা। বয়েস তের চোদ্দ হবে।

জ্যো। দেখিতে কেমন?

দা। যেন চিত্তির করা দুর্গা ঠাকুরুণ। এমন সুন্দর মেয়ে দেখিনি, মা।

জ্যোৎস্না একটু হাসিলেন; একবার বিলির পানে একটু কটাক্ষপাত করিলেন। বিলি সেটুকু লক্ষ্য করিল; তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, সোহাগ কি আমাদের পাল্টি ঘর? আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় না? তা'র প্রথম স্ত্রী মারা গিয়াছে।"

দাসী। তা' মা বল্‌তে পারি না। শুনেছি বাবু বলেছেন, 'আমার বোন থাকলে যেমন ঘরে তা'র বিয়ে দিতুম, তেমনি ঘরে সোহাগের বিয়ে দেব।'

এমন সময়ে রমেশের মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। আবার নূতন

করিয়া কুটুম্ব বাড়ীর কুশল সম্বাদ দিল। তা'র পর বস্ত্রাঞ্চল হইতে দুই খানি পত্র লইয়া গৃহিণীর চরণ সমীপে রক্ষা করিল। দুই খানিই নির্ম্মলের মায়ের লিখিত। একখানি গৃহিণীর, অপরখানি বিজলীর শিরোনামাঙ্কিত। দুই খানিতেই এক কথা ;—বিজলীকে লইয়া যাইবার জন্য সকাতর প্রার্থনা।

পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া রমেশ অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন, "নির্ম্মলের মা আমার মায়ের মত। তাঁহার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তাঁহার জিনিষ তিনি লইয়া যাইবেন, সে জন্য আমার মতামতের প্রয়োজন কি? যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি বিজুকে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু—এ যাত্রা আমার নিস্তার নাই,—সে এখন চলিয়া গেলে তাহার সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না।"

গৃহিণী, চৈত্রমাসে বিজুকে পাঠাইতে সম্মতা হইলেন না। বিশেষতঃ সংক্রান্তি মাথার উপর। দাদার পীড়া গুরুতর; এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে বিজুরও ইচ্ছা নাই। ইঙ্গিতে বিজু তাহা জানাইল। বিজুর মনোভাব অবগত হইয়া রমেশ আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অন্যান্য অনেক কথা হইল। তার পর বিজলী গৃহ বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিতে দাসীদের ডাকিল। তাহারা আসিলে, বিলি নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাদের বসাইল; এবং একে একে শ্বশুরালয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কেবল স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এটি লজ্জাবশতঃ নয়। দাসীদের সম্মুখে বিলি, স্বামীর সহিত কথা কহিত, বসিত, হাসিত, গঙ্গাবক্ষে বেড়াইত। স্বামীর প্রসঙ্গ দাসীদের নিকট উত্থাপন করিতে বিলি কখন লজ্জিতা হইত না। তথাপি এক্ষণে সকলের কথা তুলিল, কেবল স্বামীর কথা তুলিল না। উদ্যানের মালীর কথা তুলিল, লাল ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি-মাল্লা-বজরার কথা তুলিল, কিন্তু স্বামীর কথা তুলিল না। তুলিল না বটে, কিন্তু সকল কথার চেয়ে স্বামীর কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র। অন্য কথার প্রসঙ্গে স্বামীর কথা উঠিলে, বিলি উৎকর্ণ হইয়া শুনে; স্বামীর কথা ফুরাইলে বিলির ব্যাকুলতাও নিবিয়া যায়। কাহার কথা, কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহাও বিলির স্মরণ থাকিতেছে না। যাহা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে। যাহা

দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহা অশান্ত প্রাণে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে। যাহা শুনিতেছে তাহাও বুঝিতেছে না। স্বামীর কথা, স্বামীর প্রসঙ্গ ছাড়া বিলি আর কিছুই বুঝিতেছে না। যাহা বুঝিতেছে না তাহাও বুঝিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করিতেছে না। কেবল অধৈর্য্য হৃদয়ে, আকুলি বিকুলি করিয়া প্রসঙ্গের উপর প্রসঙ্গ তুলিতেছে। স্বামীর কথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করা হইল না, দাসীরাও কিছু বলিবার নাই বলিয়া, বলিল না। অবশেষে বিলি—অনন্তকে, ক্ষুদ্র মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলি ভাল! সকলি বেশ খায় দায় বেড়ায়?"

দাসীরা বুঝিল না যে, স্বামীই বিলির 'সকলি'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীরা রজনী। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ অস্তপ্রায়। সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান মধ্যে জ্যোৎস্না একাকী। সব স্থির, নিঃশব্দ। —যেন সকলকে ঘুম পাড়াইয়া চাঁদ ঘুমাইতে যাইতেছে।

চারিদিকে ফুলের গাছ; মধ্যস্থলে, মণিমুক্তাখচিত নীলাম্বরী সাটীর মত বিস্তৃত বাপীসলিল। রমণীর ন্যায় কটিতে সাটী জড়াইয়া উদ্যান হাসিয়া উঠিয়াছে। সেই সবসনা, পুষ্পালঙ্কারা, ক্ষীণ চন্দ্রকরদীপ্ত উদ্যান মধ্যে জ্যোৎস্না একাকী বৃক্ষাশ্রয়ে উপবিষ্টা।

পৃথিবী অবসাদময়ী—ক্লান্ত, সুপ্ত। সুপ্ত হইলেও অস্ফুটস্বরে যেন কাহাকে কি বলিতেছে—যেন ঘুম ঘোরে স্বপ্নাবেশে কাহাকে চুপি চুপি সম্ভাষণ করিতেছে।

আকাশ নির্ম্মল—লোচন-কণ্টকিত। কোথাও একটু আধটু শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইতেছিল। নক্ষত্র নিচয়, যেখানে শুভ্রমেঘাবৃত, সেখানে—অবগুণ্ঠনান্তরালে রমণীকটাক্ষের ন্যায় আরও সমুজ্জ্বল।

উদ্যানে সৌন্দর্য্যময় ফুলরাশি স্তবকে-স্তবকে, পুঞ্জে-পুঞ্জে ফুটিয়া রহিয়াছে। যে বিকসিত-যৌবনা, সে ঊর্দ্ধ-মুখে সালঙ্কার গগনের সহিত স্ফুরিতাধরে প্রেম সম্ভাষণ করিতেছে। যাহার দিন গিয়াছে, সে নিম্নতুণ্ডে অবগুণ্ঠন টানিতেছে।

চন্দ্রিমা আলস্যময়ী,—আবেগে ঢলিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইতে চলিয়াছে। সৌরভরাশি—ভাসিয়া ভাসিয়া

নাচিয়া নাচিয়া, চাঁদের কিরণ গায় মাখিয়া আপন ভাবে অধৈর্য্য হইয়া মজাইতে চলিয়াছে।

ঘাটের উপর বকুল তলায় জ্যোৎস্না একাকিনী উপবিষ্টা। জ্যোৎস্নার পরিধানে নীলাম্বরী সাটী।—শুভ্রবরণ-নীলবসনে বেষ্টিত—যেন শুভ্রবরণ চাঁদকে নীলাকাশ জড়াইয়া ধরিয়াছে। জ্যোৎস্না আজ চাঁদ দেখিতেছিলেন না, ফুল দেখিতেছিলেন না। তাঁহার মনে আজ সুখ নাই—শান্তি নাই। তাঁহার মুখ আজ বৈশাখের মেঘের মত গম্ভীর।

যত গোল বিলি বাধাইয়াছে। জ্যোৎস্না বেশ সুখে ছিল;—গৃহের কর্তৃত্ব, জমিদারীর কর্তৃত্ব, রমেশের উপর কর্তৃত্ব, সকলই তাঁহার ছিল। এখন একে একে সকলই হস্তস্খলিত হইয়াছে। অবশেষে অতুল ঐশ্বর্য্যও যাইতে বসিয়াছে।

জ্যোৎস্না প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সম্পত্তির ভাগ কাহাকেও দিতে পারে না। সে যে সম্পত্তির খাতিরে রমেশকে বিবাহ করিয়াছিল। যে সম্পত্তির লোভে কুৎসিতদর্শন রমেশকে শয্যা-প্রান্তে স্থান দিয়াছিল, সে সম্পত্তি হারাইলে জোৎস্না প্রাণে বাঁচিবে না।

গাছের তলায় বেদীর উপর বসিয়া জ্যোৎস্না ভাবিতে-ছিলেন, "কেন এমন হ'ল? আগে ত আমার সকলি ছিল। এখন একে একে সব যাইতে বসিয়াছে। হায়, হায়! অবশেষে কিনা একজন নীচ-কুলোদ্ভব অপদার্থ কামুকের নিকট দেহ বিক্রয় করিতে বসিয়াছি?"

জ্যোৎস্না একবার উদ্যানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন। মনুষ্যাবয়ব কোথাও দৃষ্ট হইল না। জ্যোৎস্না আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বাল্যকালের প্রেম? সে কথা এখন কেন? যখন আমার জ্ঞানোদয় হয় নাই, যখন আমার বিবাহ হয় নাই, যখন আমি দরিদ্র ছিলাম, তখন আমি কাহাকে কি বলিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। তখন আর এখন? এখন আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী রূপসী শিরোমণি, আর সে পদলেহনকারী দরিদ্র ভিক্ষুক। আমি রাজা, সে প্রজা। আমি তার ভাগ্যবিধাতা, সে পদানত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। এত স্পর্দ্ধা! আমার কাছে প্রেম যাচিঞা করে! আগে কার্য্যোদ্ধার করি, তা'র পর তাহাকে বুঝাইব আমি কে?"

এমন সময়ে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি সন্নিকটবর্ত্তী হইল।

এ ব্যক্তি ডাক্তার। জ্যোৎস্না, তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার, জ্যোৎস্নার কাছে আসিয়া বলিল, "জ্যোৎস্না, এখানে আসিতে বড় ভয় পাইয়াছিলাম। পথি-মধ্যে যেন কে আমার পাছু লইয়াছিল।"

জ্যোৎস্না। যে পাছু লইয়াছিল সে কোথায় গেল?

ডাক্তার। তা' জানিনা, সম্ভবত বাগানের মধ্যে কোথাও লুকাইয়াছে।

জ্যো। ঔষধি আনিয়াছ?

ডা। আনিয়াছি—এই লও।

ঔষধি লইবার অভিপ্রায়ে জ্যোৎস্না ব্যগ্র হইয়া ডাক্তারের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। ডাক্তার তখন বাহু বিস্তার করতঃ জ্যোৎস্নাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবেগ ভরে আলিঙ্গন করিল। অন্ধকারে জ্যোৎস্নার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু জ্যোৎস্না নড়িল না,—ডাক্তারের বাহু মধ্যে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ রহিল। সেই অবস্থাতেই জ্যোৎস্না পুনরায় ঔষধি চাহিল। এবার ডাক্তার একটা কাগজের মোড়ক জ্যোৎস্নার হাতে দিল।

এমন সময়ে ডাক্তার সভয়ে দেখিল, সন্নিকটস্থ লতা-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নির্গত হইয়া

তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন ডাক্তার, মনুষ্য মূর্ত্তি পানে দ্বিতীয়বার না চাহিয়া বিপরীতদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

আগন্তুক—হারাণ। জ্যোৎস্নারই উপদেশ অনুসারে সে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হইল। ঔষধি মিলিল এবং ডাক্তারের ঘৃণিত আলিঙ্গন হইতে জ্যোৎস্নাও রক্ষা পাইল। হারাণ, জ্যোৎস্নার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতীর দেখা পাইয়াছিলে?"

হারাণ বলিল, "হাঁ; হলঘরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে রেবতী স্বীকার পাইয়াছে।"

তখন ভ্রাতা ও ভগ্নী বিভিন্ন পথে উদ্যান ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। রমেশ শয্যায় শুইয়া বিভীষিকা-ময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। রমেশের মা হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিতা। পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিজলী বসিয়া রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তন্নিকটে কয়েকটি ঔষধিপূর্ণ শিশি।

আজ রমেশের বড় বিপদ গিয়াছে। রাত্রি প্রহরেকের সময় রমেশের নাড়ী বড়ই ক্ষীণ হইয়াছিল। স্থানীয় ডাক্তারেরা নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে সে যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশ অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ; কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হয় নাই।

এই তিন প্রহর রাত্রি আনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া একটু পূর্ব্বে রমেশ নিদ্রিত হইয়াছেন। এ নিদ্রাটুকুও সুনিদ্রা নয়—কেবল স্বপ্নপূর্ণ। বিলি অনেক কষ্টে দাদাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজে একটু বিশ্রাম লইতেছিল। বিলির আবার বিশ্রাম কোথায়? রমেশের শুশ্রূষা করিয়া যেটুকু

অবসর পাইত সেটুকু তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতেই কাটিত। আজ বিলির ভাবিবার অনেক কথা আছে। আজ বিলি, শ্বাশুড়ীর পত্র পাইয়াছে—স্বামীর সংবাদ পাইয়াছে।

শ্বাশুড়ীর পত্রে একস্থানে লেখা ছিল, "বউমা, তোমাকে ছাড়িয়া নির্ম্মল কি ভাবে দিন কাটাইতেছে তাহা যদি বুঝিতে, তা' হলে তুমি সেখানে একদিনও আর থাকিতে না।" এ কথা কয়টি বিলি শতবার পড়িয়াছিল, শতবার মনে মনে আন্দোলন করিয়াছিল। দাদার পাশে বসিয়া বিলি ভাবিতেছিল, "আমি পাখী হইয়া একবার দেখিয়া আসিতে পাই না তিনি আমায় ছাড়িয়া কি করিতেছেন?" কতবার কত সাধ মনে জাগিতেছিল, কতবার কত কল্পনা জল-বুদ্বুদের ন্যায় মানস-সলিলে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কখন বিলি ভাবিতেছিল, "একবার কি ছদ্মবেশে দেখিয়া আসিতে পাই না তিনি রাত্রে ঘরে আসিয়া কি করেন? ঘরে আসিয়া কি আমায় খুঁজেন? শয্যা শূন্য দেখিলে আমাকে কি তাঁহার মনে পড়ে?" কখন বিলি ভাবিতেছিল, "বেল মল্লিকা কি তেমনই ফুটিতেছে? ফুল দেখিলে কি আমার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়? এখন

কার গলায় তিনি মালা পরাইয়া দেন?" সে কথা ছাড়িয়া বিলি আবার ভাবিল, "আচ্ছা, আমাকে কি তাঁর একবারও মনে হয় না? হয় বই কি। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ কালে আমাকে আদর করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতেন; মধ্যাহ্নে আহারান্তে আমাকে সোহাগ করিয়া কাছারী বাটী যাইতেন; অপরাহ্নে আমাকে আদর করিয়া অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন,—এখন তিনি চুম্বনের আশায় আমায় কি একবারও খুঁজেন না? একবারও কি দাসীকে মনে করেন না? যদি করিতেন তাহা হইলে তিনি কেন দাসীদের হাতে একখানা পত্রও দিলেন না? দুই ছত্র লিখিতেও কি তাঁহার সময় হ'ল না? বিদায় কালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমায় পত্র লেখা ভিন্ন আমার যে আর কোন কাজ থাকিবে না, বিলি।' তিনি কেন এমন নিষ্ঠুর হ'লেন? তিনি যে দেবতা। রাধাবল্লভ, বলিয়া দেও—আমার দেবতা কেন এমন হ'ল?"

বিলি, ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পালঙ্ক পার্শ্বস্থিত একখান কাষ্ঠাসনে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অরুণ-কিরণ-প্রতিভাত মৃণালতুল্য

ক্ষুদ্র ভুজবল্লীর উপর কাদম্বিনী-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমা সদৃশ ক্ষুদ্র কপোল রক্ষা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলি নিদ্রিত হইল।

একটু পরে বিলি ঘুমঘোরে শুনিল, যেন কে 'বিজু' 'বিজু' বলিয়া ডাকিতেছে। দুই তিন ডাকে বিলির ঘুম ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অজ্ঞাত ভয়ে পিষ্ট হইয়া বিলি নীরব. নিশ্চল রহিল। এমন সময়ে বিলি সবিস্ময়ে দেখিল, যেন কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যমূর্ত্তি গৃহমধ্য হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। বিলি আরও ভীত হইল। রমেশ ডাকিলেন, "বিজু!"

বিলি। তুমি ডাকৃছিলে, দাদা?

রমেশ। হাঁ, দিদি।

বি। কেন, দাদা?

র। দেখেছ কি?

বি। কি, দাদা?

র। যেন কি একটা অন্ধকারের মত ঘর থেকে চলে গেল।

বিলিও তাই দেখিয়াছিল; কিন্তু কিছু বলিল না। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আলো নিবাইল কে?"

রমেশ বলিলেন, "তা'ত আমি জানি না। ভেবেছিলাম তুমি নিবাইয়াছ।"

বিলি, মাকে উঠাইল। মা আলো জ্বালিল। তখন রমেশ ও বিলি সবিস্ময়ে দেখিল যে, সামাদানে প্রচুর বাতি রহিয়াছে; অথচ আলো নিবিয়া গিয়াছে। কোন দিক হইতে বাতাস আসিবারও পথ নাই। তবে আলো নিবিল কেন? বিলি ভাবিল, একি ভৌতিক কাণ্ড? সে রাত্রে আর কেহ কিছু বলিল না। আপন আপন চিন্তা লইয়া উভয়ে নীরব রহিল।

রজনী প্রভাত হইলে রমেশ প্রহরীকে ডাকাইলেন। প্রহরী পশ্চিম দেশীয়, নাম লালসিংহ। সে বহুকাল হইতে রমেশের গৃহে চাকুরি করিতেছে। স্বদেশীয় ভাষা ও রীতি নীতি এক্ষণে কতকটা বিস্মৃতপ্রায়। মৎস্যাদি ভক্ষণও চলে—তবে গোপনে। যাহা হউক এক্ষণে সিংহ মহাশয় পাগড়ি ও দাড়ি ঠিক করিয়া লইয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষে আর কেহ ছিল না। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত দিন হইতে এ বাড়ীতে নকৃরি করিতেছ?"

লা। তেইশ বরষ হোগা, মহারাজ।

র। কত দিন হইতে অন্দরের পাহারায় আছ?

লা। তিন বরষ, হুজুর।

র। বাড়ীর সকলকে চেন?

লালসিং একবার চারিদিকে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল, "সব্ কইকো পৃছনৃতা, মহারাজ।"

র। বেশ, কাল রাত্রে তুমি আমার মহলে পাহারায় ছিলে?

লা। হুজুর।

র। রাত্রি দুইটার পর কাহাকেও উপরে আসিতে দেখিয়াছিলে?

লালসিং এবার একটু মুস্কিলে পড়িল। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত উপরে আসিতে কাহাকেও দেখে নাই; দুইটার পর একটু নিদ্রা আসিয়াছিল। তখন সে প্রাচীরাশ্রয়ে একটু ঘুমাইয়াছিল। তাহার নিদ্রিতাবস্থায় উপরে কেহ গিয়াছিল কি না সে বলিতে পারে না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একথা বলিতে সিংজির সাহসে কুলাইল না, মনিবের নিকট মিথ্যা বলিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং সে 'হুজুর' 'হুজুর' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রমেশের মনে সন্দেহ জন্মিল।

রমেশ বলিলেন, "লালসিং, তুমি আমার পুরাতন বিশ্বাসী নকর, তাই তোমায় আমার মহলে পাহারায় রাখিয়াছি; তুমি কেন আমার কাছে কথা লুকাইতেছ?"

লালসিংহের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সে তখন কম্পিতকণ্ঠে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

রমেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; একটু বিশ্রাম লইয়া বলিলেন, "ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিও— এখন যাও।"

কিন্তু লালসিং নড়িল না। রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

লা। হুজুর, কইকো হিঁয়া আনে নেহি দেখা, মগর্ যানে দেখা।

র। কাহাকে যেতে দেখেছ?

লা। বহু মাকো।

পুরাতন দাস দাসীরা, জ্যোৎস্নাকে বউ মা বলিয়া ডাকিত। রমেশ তাহা জানিতেন। প্রহরীর উত্তর শুনিয়া রমেশ নীরব হইলেন। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার কাপড়ের রং কি রকম দেখেছিলে?"

লালসিং ভাবিয়া চিন্তিয়াও সেটা ঠিক করিতে পারিল

না। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত রাত্রে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছ?"

প্রহরী বলিল, "তিন পহরকা বাদ।"

আর কিছু তাহার বলিবার নাই দেখিয়া রমেশ তাহাকে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের শিশি কয়টি পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সকল ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করান হয় নাই। তা'ছাড়া আরও দেখিলেন, একটা শিশির ঔষধ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। সাহেব বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিশ্চয় কোন দ্রব্য এই ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইয়াছে।"

রমেশ, ঔষধের শিশিটি চাহিয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। তখন কক্ষাভ্যন্তরে সাহেব ও দেওয়ান ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। সুতরাং জ্যোৎস্না কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সাহেব চলিয়া গেলে, রমেশের আদেশে উইল প্রস্তুত হইল। বিজলীর গর্ভজাত পুত্র, তদভাবে বিজলী স্বয়ং

রমেশের যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইল। কয়েকজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর সম্মুখে রমেশ উইলে স্বাক্ষর করিলেন। উইলে কি লেখা ছিল হারাণ ব্যতীত বড় একটা কেহ জানিল না। হারাণকে ইচ্ছা পূর্ব্বকই জানান হইয়াছিল। অপর সকলে কেবল মাত্র জানিল যে, রমেশের উইল হইয়াছে। যাহা হউক উইল করিয়া রমেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তারপর আরও কয়েকদিন অতীত হইয়াছে। রমেশ আজ পঞ্চাশ দিনের পর অন্ন পথ্য পাইয়াছেন। পথ্য পাইয়াছেন বটে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া বসিবার তাঁহার সামর্থ্য নাই। আত্মীয় স্বজন যে যেখান হইতে রমেশকে দেখিতে আসিয়াছিল, সে সেখানে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু হারাণ যায় নাই; আগামী কল্য যাইবার দিন স্থির করিয়াছে।

ভ্রাতার শুশ্রূষায় বিলি শরীরপাত করিয়াছে। শরীর-পাত সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মন আজ একটু প্রফুল্ল। কিন্তু তাহার সে প্রফুল্লতা টুকুও সত্বর বিনষ্ট হইল।

রমেশের আহার সমাপনান্তে বিলি নিজের কক্ষে আসিয়া বসিল। বিলি এক্ষণে নির্ম্মলের পত্র পায় না—পত্রেরও অপেক্ষা করে না। তবে ডাকে পত্র আসিবার সময় বিলির বুকের ভিতর কেমন কাঁপিয়া উঠে। আজ কোন পত্রের বিলি প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার নামে এক থানি পত্র আসিয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে পত্র উঠাইল। সবিস্ময়ে দেখিল, শিরোনামা অপরিচিতের হস্তলিখিত, নির্ম্মলের নয়। পত্র উন্মোচন করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। পরে হঠাৎ মনে হইল—বুঝিবা নির্ম্মল পীড়িত হইয়াছেন, তাই অপর কেহ বিলিকে এই দুঃসংবাদ দিয়াছে। বিলি ক্ষিপ্রহস্তে পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িল। পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আবার পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আর পারিল না,—চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

পত্র খানি কিঙ্করের লিখিত। সে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাহার যাহা উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কেবল অকারণ একটি কানন-বল্লরীকে হলাহলে জর্জ্জরিত করা হইল।

চৈতন্যোদয়ে বিলির আবার সকল কথা মনে পড়িল। অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বিলি মনুষ্যচক্ষু-অন্তরালে উদ্যান মধ্যে আশ্রয় লইল। তথায় বেদী ছাড়িয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাঁদিল।

বিলির কান্না একজন লুকাইয়া দেখিল। উদ্যানের উপর জ্যোৎস্নার মহল; সেই মহলের একতম বাতায়নে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না বিলির অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন। পাষাণে কর্দ্দম নাই, জ্যোৎস্নার হৃদয়েও দয়া নাই। বাণাহত হরিণীর যাতনা দেখিয়া ব্যাধ যতটুকু মনঃপীড়া পায়, বিলির হৃদয়বিদারক কান্না দেখিয়া জ্যোৎস্নার মনে তত-টুকু দুঃখ হইল। যেমন ব্যাধ, জালাবদ্ধ কুরঙ্গীর কাতরতা অপরকে ডাকিয়া দেখায়, তেমনই বিলির ফাটা প্রাণের রোদনোচ্ছ্বাস দেখাইবার জন্য জ্যোৎস্না পুলকিত হৃদয়ে হারাণকে ডাকিলেন। হারাণ আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে

সে বিমোহিত হইল। দেখিল, মাটীর উপর অশ্রু-নিষিক্ত মুখখানি রক্ষা করিয়া বিলি অবিরত কাঁদিতেছে; উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া তাহার মৃণালসদৃশী দেহলতা উঠিতেছে, নামিতেছে—আলুলায়িত কেশরাশি মুখখানি ঢাকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুলসমাচ্ছাদিতা কমলিনী, হিল্লোলতাড়নে বারিসিক্ত হইয়া, মৃণালোপরি উঠিতেছে, নামিতেছে।

বিমুগ্ধ প্রাণে হারাণ, গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে আসিল। লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একবার গবাক্ষ-পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তথায় জ্যোৎস্না বা অপর কেহ নাই। তখন সে সরিয়া আসিয়া বিলির কাছে দাঁড়াইল। বিলি তখন বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। হারাণ ডাকিল, "বিজলি!" উত্তর নাই। পুনঃ পুনঃ ডাকিল; তথাপি উত্তর নাই। তখন হারাণ, পাপ-পঙ্কিল হস্তে বিলির বাহু স্পর্শ করিল। স্পর্শিত হইবামাত্র বিলি চক্ষু উন্মীলিত করিল। প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিল না, ঠিক বুঝিতে পারিল না—শূন্য নয়নে হারাণের পানে চাহিয়া রহিল। হারাণ আবার ডাকিল—আবার বাহু স্পর্শ করিল। এবার বিলি সকলই বুঝিল। বুঝিবামাত্র, বিদ্যুদ্বেগে

উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। তার পর হংসিনীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া, কল্লোলিনীর ন্যায় দেহ ফুলাইয়া, অঙ্গুলি হেলা-ইয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “দূর হও।”

বিলি কি বলিল, হারাণ ঠিক বুঝিল না। হারাণ তখন আত্মহারা হইয়া সেই সর্ব্বশোভাময়ী ভগবতীতুল্যা মূর্ত্তি পানে চাহিয়াছিল। বিলির বস্ত্রাঞ্চল ভূপৃষ্ঠে লুটাই-তেছে—আলুলায়িত কুন্তলরাশি গণ্ড, বক্ষ, নিতম্বের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দক্ষিণ চরণ ঈষৎ অগ্রে স্থাপিত— বাম হস্ত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত, লতাকুঞ্জতলে বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া বিলি অঙ্গুলি হেলাইয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিতেছে, “দূর হও।” কুসুমিতা লতিকা বিলির মাথার উপর হেলিয়া পড়িয়াছে—শ্যামোজ্জ্বল পত্ররাশি অঙ্গের উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—রবিকরচ্ছটা, ক্রোধরঞ্জিত মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সদ্যস্নাত, বিস্ফারিত নয়নদ্বয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতেছে—গোপিকাবল্লভালিঙ্গনবদ্ধা কাঞ্চনবরণা রাধিকার দেহলতা তুল্য সেই শ্যামোজ্জ্বল পত্র রাশি মধ্যে বিলির দেহ আবেগ ভরে ঈষৎ স্পন্দিত হই-তেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে—অলক্তক-লাঞ্ছিত-স্ফুর-দোষ্ঠাধর-মধ্যপরিদৃষ্ট মুক্তাবিনিন্দিত দন্তরাজি,—বাল-

তপন-মধ্যাহ্নচ্ছটাদামিনীলতার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই ফুলদল-প্রফুল্ল উদ্যান মধ্যে, বাপীতটে, লতাবিতান-তলে দণ্ডায়মানা সেই ভুবনমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া হারাণের বাসনানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "বিজলি, বিজলি, তুমি কি সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য বুঝি স্বর্গেও নাই।"

ঘৃণায় বিলির ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। অঙ্গুলী হেলাইয়া আবার বলিল, "দূর হও, এখনি উদ্যান ত্যাগ কর।"

হারাণ বলিল, "চলিয়া যাইতে আসি নাই—তোমায় একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিলি। তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না—তুমি দূর হও।

হা। তোমার স্বামীর কথা তোমায় বলিতে আসিয়াছি। আনন্দপুর হইতে একজন কর্ম্মচারী খাজনা লইয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট নির্ম্মল বাবুর চরিত্রের কথা শুনিলাম।

বিজলী কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া গজেন্দ্রগমনে অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া হারাণ বলিল, "একটা কথা শুন—তার পর তুমি যাইও।

রমেশ বাবু তাঁহার সমস্ত বিষয় তোমাকে দান করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে নির্ম্মলের মুখাপেক্ষী নও। তবে তুমি কেন পাষণ্ড স্বামীর হাতে লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ কর?"

বিজলীর দেহ ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "যে পুণ্যময় নাম উচ্চারণে দেবতারাও পবিত্র হ'ন, সে নাম তোমার কণ্ঠে শুনিতে চাই না।"

হারাণ একটু হাসিয়া বলিল, "যিনি তোমার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী স্ত্রী ছাড়িয়া বিশ্বাসন্যস্তা অনূঢ়া বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, তিনি পুণ্যময়? আর এই এই পুণ্যময়কে যে পাষণ্ড বলে সে পাপিষ্ঠ? শুন, বিজলি, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি আত্মহারা হইয়াছি—তোমাকে পাইবার আশায় আমি—"

বিজলী আর শুনিল না। অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে বিজলী জ্ঞানশূন্যা হইল। বলিল, "তুমি অদ্যই এ গৃহ হইতে কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইবে।"

বিজলীর ক্রোধ দেখিয়া হারাণ একটু হাসিল। বলিল, "রমেশ বাবুকে এ কথা বলিলে আগুন জ্বলিবে, সত্য; কিন্তু আমরাও দুর্ব্বল নই। বুঝিয়া কার্য্য করিও—তাঁহাকে মারিও না।"

বিলি চলিয়া গেল। হারাণ দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "একদিন বিজলি, তোমার, এ দর্প চূর্ণ করিব—একদিন তুমি আমার হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অজ বধূগ্রামে বড় ধুম। বাসন্তী পূজা শেষ হইয়াছে; আজ প্রতিমা বিসর্জ্জন। গঙ্গার ঘাটে সারি দিয়া প্রতিমা-নিচয় সংরক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে, জমিদার বাড়ীর প্রতিমা। কিন্তু জমিদার কোথায়?

নির্ম্মল তখন আপন চিন্তারাশি লইয়া ছাদে বসিয়া আছেন। যে বিজয়া উপলক্ষে তাঁহার আনন্দ উছলিয়া উঠিয়া বধূগ্রামকে মাতাইয়া তুলিত, আজ সে বিজয়ায় নির্ম্মলের আনন্দ নাই। গৃহিণীর মনেও সুখ নাই। উভয়ের মনে একই কথা জাগিতেছিল। উভয়েই ভাবিতেছিলেন,—যে প্রেমময়ী জীবন্ত সোণার প্রতিমা, পাষাণহৃদয়া মৃন্ময়ী দশভূজা মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিত, আজ সে প্রতিমা কোথায়?

বিলি আসে নাই। তাহাকে আনিতে বৈশাখের প্রারম্ভে দাস দাসী আবার প্রেরিত হইয়াছিল; তবু বিলি আসে নাই। তা' ছাড়া বিলি একটা কড়া কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিল। বিলি বলিয়াছিল যে, "শ্বাশুড়ীকে প্রণাম জানাইয়া বলিও যে, বধূগ্রামে যাইবার এক্ষণে আমার বাসনা নাই—প্রয়োজনও দেখি না। যখন যাইবার ইচ্ছা হইবে তখন তাঁহাকে জানাইব। বার বার অনর্থক লোক পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই।" নির্ম্মলকে বলিতে, বিলি কিছু বলিয়া দেয় নাই—একটা স্নেহের কথা কাহাকেও জানাইতে বলে নাই। বিলির নির্দ্দয় আঘাতে, নির্ম্মলের বালক-হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

বিবাহাবধি নির্ম্মল কখন দশদিনের উর্দ্ধকাল একাদিক্রমে বিলিকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। বিলি যখন পিত্রালয়ে যাইত, নির্ম্মলও সঙ্গে যাইতেন; এবং দুই চারি দিন, তথায় থাকিয়া বিলিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। বিলিকে ছাড়িয়া থাকা নির্ম্মলের সাধ্যাতীত। বিলি তাঁহার সংসার—বিলি তাঁহার সুখ।

বিলি জিদ্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; নির্ম্মল, তাহার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। বিলি, দুই দিন থাকিয়া

ফিরিবে বলিয়া গিয়াছিল, দুই মাস অতীত হইল, বিলি তবু ফিরিল না—নির্ম্মল এ অপরাধও বিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু বিলির নিষ্ঠুর পত্র, মমতাশূন্য ব্যবহার, নির্ম্মলের সহনাতীত।

হৃদয় লুটাইয়া যাহাকে ভালবাসিলাম, ধর্ম্ম কর্ম্ম সংসার ভুলিয়া, হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া কৈশোর হইতে যাহার পূজা করিলাম, স্ফুটনোন্মুখ যৌবন লইয়া অপরের ছায়া-বর্জ্জিত অকলঙ্কিত হৃদয় যাহার চরণে উৎসর্গ করিলাম—সে আজ নির্দ্দয় ব্যবহারে আমার প্রেমোন্মত্ত হৃদয় মথিত করিল, আমার নবযৌবনোদ্গত সুখসাধ দগ্ধ করিল। সংসার ঘুরিয়া রত্নরাজি সংগ্রহ ও গ্রথিত করিয়া যাহার গলায় পরাইলাম, সে ঘৃণাভরে মালা ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিল—আমার এ কোমল হৃদয়ের নূতন সাধ, নূতন আশা প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই হলাহলে জর্জ্জরিত করিল।

নির্ম্মল, আজীবন কখন প্রাণে ব্যথা পান নাই। শৈশবে মাতৃস্নেহে লালিত, বর্দ্ধিত; কৈশোরে প্রেমময়ী পত্নীর আদরে সঞ্জীবিত। আজ এই প্রথম আঘাত। আঘাত কোমল হইলেও প্রথম আঘাত, ক্ষেত্রবিশেষে

বড়ই বাজে। তাই নির্ম্মল, বিলিকে দুই দিন না দেখিয়া, দুই দিন তাহার পত্র না পাইয়া, দুইটা কঠিন কথা পত্রে পড়িয়া অভিমানোন্মত হৃদয়ে সংসারময় হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

নির্ম্মলের এক্ষণে লক্ষ্যহীন জীবন। উৎসাহ নাই, আশা নাই, ভবিষ্যৎ নাই। নির্ম্মলের উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, সংসারস্পৃহা, সকলই নিবিয়া গিয়াছে; কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান যায় নাই।

নির্ম্মল এক্ষণে কাঁদিয়া শয্যা সিক্ত করেন না, কিন্তু সাধের শয্যাগৃহ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফুলমালা আর গলায় পরেন না, পুষ্পোদ্যানে আর বসেন না। সুখের স্মৃতিপূর্ণ বজরায় আর পদার্পণ করেন না, ছাদে বসিয়া অমাবস্যার সন্ধ্যাকাশে আর নক্ষত্র গণনা করেন না। সে নিষ্প্রয়োজনে হাসি, অর্থশূন্য কথা, নয়নের আনন্দ, এক্ষণে আর নাই। গভীর গাম্ভীর্য্যময় বিষাদরাশি, সে সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে।

নির্ম্মল সকলই ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ছাদের উপর পরিভ্রমণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যেখানে বসিয়া বিলিকে বিদায় দিয়াছিলেন, নির্ম্মল সেই খানে বসিয়া, যে

দিকে গঙ্গা বক্ষ বহিয়া বিলির বজরা গিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দিবস যামিনী অতিবাহিত করিতেন। দূরে, গঙ্গাবক্ষে, কোন বজরা উত্তর দিক্ হইতে আসিতে দেখিলে নির্ম্মলের হৃদয়, আশার সঞ্চারে কাঁপিয়া উঠিত; আবার বজরা বধূগ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলে নির্ম্মলের হৃদয় নিরানন্দে মগ্ন হইত। দিবারাত্রির মধ্যে নির্ম্মলের হৃদয় এইরূপে শতবার আশায় উৎফুল্ল হইত, আবার শতবার নিরাশায় নিমজ্জিত হইত।

আজ অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া নির্ম্মল, সুদূর গঙ্গাপ্রান্তে চাহিয়া আছেন। নিকটে—জাহ্নবী-হৃদয়ে সুসজ্জিত তরণীর উপর সংখ্যাতীত সুশোভিতা দেবী প্রতিমা। নীল চন্দ্রাতপ তলে, দশদিকব্যাপী অনন্তপ্রসারিণী, হিংসাদলনী, পাপনাশিনী বাসন্তী প্রতিমা। নির্ম্মলের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। যেখানে তরঙ্গশিরে একখানি প্রকাণ্ড-কায় বজরা, বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়ার ন্যায় ধীরে ধীরে গঙ্গা বহিয়া আসিতেছিল, নির্ম্মলের দৃষ্টি সেইখানে। বজরা ক্রমে নিকটস্থ হইল, ক্রমে বধূগ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা নির্ম্মলের সম্মুখে মনুষ্য-ছায়া পতিত হইল;

তিনি ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সম্মুখে জননী অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রের পাশে দাঁড়াইলেন।

উভয়ে নীরব, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। ক্রমে অন্ধকারে জাহ্নবী-বক্ষ ঢাকিয়া আসিল—তরণীনিচয়ে অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা তুমি কেন একবার বিশালপুরে যাও না?"

নির্ম্মল। সেখানে যাইতে আমার আর ইচ্ছা নাই।

অন্ন। ছি, বাবা, ছেলে মানুষের উপর রাগ করতে আছে।

নির্ম্ম। মা, বাপের বাড়া গেলে কি লোকে ছেলে মানুষ হয়?

কথাটা কি অন্নপূর্ণা বুঝিলেন। নির্ম্মলসকাশে বিজলী, প্রেমময়ী যুবতী; পিত্রালয়ে প্রেমশূন্যা বালিকা। তাই নির্ম্মলের এ অনুযোগ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমার বউ তেমন মেয়ে নয়। কে কি ওষুদ ক'রেছে; তাই বলি একবার তুমি নিজে যাও।"

নি। আমি গিয়ে কি করব, মা? যদি কেউ ওষুদই করে থাকে আমি গেলে তার কি প্রতিকার হবে, মা?

অ। বউমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

নি। না, মা; আমি তা' পার্‌ব না। যদি তিনি নিজের ইচ্ছায় কখন এখানে আসেন তবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিব।

অ। গ্রহণ কর্‌বে! কি বল্‌ছ? কা'কে ত্যাগ করেছ যে, গ্রহণ করবার কথা বল্‌ছ? যে লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর, সরস্বতী অপেক্ষা গুণবতী, সাবিত্রীর চেয়ে সতী, শিশুর মত সরল,—তা'কে কি তুমি ত্যাগ করেছ, যে, গ্রহণ কর্‌বার কথা বল্‌ছ? যাকে পেয়ে আমার শ্বশুরকুল উজ্জ্বল, আমার গর্ভস্থ সন্তান পবিত্র, তা'কে তুমি গ্রহণ করবে কি না ভাবছ?

নি। না, মা, আমি সে কথা ভাবি নাই, সে কথা বলি নাই। আমার মনের কথা আমি ঠিক্ তোমায় বুঝাতে পারি নাই। আমার বলা উদ্দেশ্য যে, অনর্থক অভিমানের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

অ। তুমি সেখানে যাইতে চাহিতেছনা কেন বল দেখি? সেটা কি তোমার অভিমান নয়?

নির্ম্মল নিরুত্তর। মনে ভাবিয়া দেখিলেন, মায়ের কথা অনেকটা ঠিক।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কি স্থির করিলে, নির্ম্মল? তুমি না যাও, আমি যাব।"

নির্ম্মল বলিলেন,"রাগ করিও না, মা; তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে আজ রাত্রিশেষে যাত্রা কর।"

নির্ম্মল মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিশালপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যাকালে নির্ম্মল, বিশালপুরে উপনীত হইলেন। ঘাটে বজরা বাঁধিয়া নির্ম্মল তটে উঠিলেন; এবং ধীর পাদবিক্ষেপে জমিদার ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে রমেশের জনৈক ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নির্ম্মল জানিলেন যে, রমেশ সপরিবারে বজরায় উঠিয়া বায়ুসেবনার্থ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেছেন।

নির্ম্মল ফিরিলেন। ঘাটে আসিয়া, গঙ্গাবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সন্নিকটে একখানি বজরা দেখিতে পাইলেন। বজরা খানি রমেশের। তদ্দৃষ্টে জানি না কেন, নির্ম্মল গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই; দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জ্যোৎস্না তখনও ফুটে নাই।

যে ঘাটে নির্ম্মলের বজরা লাগিয়াছিল, সে ঘাট, জমিদার ও তৎপরিজনবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা ব্যবহৃত হইত না। এই ঘাটের অতি সন্নিকটেই জমিদার ভবন। দুইধারে, রমেশের স্বহস্তরোপিত পুষ্পোদ্যান; মধ্যে প্রশস্ত পথ। এই পথ, ঘাট হইতে সোজা গিয়া জমিদার ভবনের খিড়কী দ্বারে পড়িয়াছে।

ক্ষণপরে নির্ম্মল, রমেশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। নির্ম্মলের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল,—রমেশের সঙ্গে যে বিলি আছে!

রমেশ আজও দুর্ব্বল। ডাক্তারের পরামর্শানুসারে সমস্ত দিন গঙ্গাবক্ষে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সঙ্গে বিলি ও জ্যোৎস্না থাকিতেন;

আজও ছিলেন। যখন তাঁহারা ঘাটে পৌঁছিলেন তখন নির্ম্মলের বজরা দৃষ্টিপথে পড়িল। বিলি সেই চির-পরিচিত বজরা দেখিবামাত্র চিনিল। উল্লাসে বিলির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আবার পর মুহূর্ত্তে, মেঘ-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায়, গভীর বিষাদে সেই চন্দ্রমা-বিনিন্দিত মুখ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল।

নির্ম্মল আসিয়াছেন শুনিয়া রমেশ ব্যস্তভাবে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পিছনে, জ্যোৎস্না ও বিলি। পথের ধারে, উদ্যান মধ্যে, সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে, যেখানে বৃক্ষাশ্রয়ে নির্ম্মল বসিয়া আছেন, বিলি তাহার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মলকে কেহ দেখিল না; কিন্তু নির্ম্মল সকলকে দেখিলেন। সকলের মধ্যে, নির্ম্মল, বিলিকেই কেবল দেখিলেন। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া শুদ্ধ শ্বাসে নির্ম্মল, বিলিকে দেখিতে লাগিলেন।

এই কি আমার সেই বিলি? আমার স্মৃতির আধার, সুখের পারাবার, হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর—এই কি সে? যে আমার কৈশোর-উদ্যানে ফুল ফুটাইয়াছিল, যৌবন-গাঙ্গে তরঙ্গ উঠাইয়াছিল, হৃদয়-সরসী তলে তারকা জ্বালাইয়াছিল—এই কি সেই? যাহাকে লইয়া আমার

বিলাসে আনন্দ, ভোগে তৃপ্তি, চিন্তায় সুখ—এই কি আমার সেই ?

বিলি দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। অচিরে অন্ধকার মধ্যে তাহার দেহ লুকাইল—যেন সুখের স্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে, অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু রাখিয়া অনন্ত কোলে মিলাইয়া গেল। বিলির শুভ্র বসন লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মল, সেই দিকে অনিমেষ নয়নে, চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে বসন আর দেখা যায় না, তবু নির্ম্মলের দৃষ্টি সেই দিকে ; ব্যগ্রতায় অন্ধকার ভেদ করিয়া বাঞ্ছিতের বসন খানি মাত্র দেখিবার জন্য চেষ্টিত।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ সেইখানে সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত জনৈক ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে ভবন মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল।

রমেশ নির্ম্মলকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন ; এবং মহা সমাদরে নূতন মহলের একতমকক্ষে নির্ম্মলের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে নির্ম্মলের প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি হইল। বিলি তখনও আসে নাই। কক্ষ মধ্যে উজ্জ্বল

দীপ জ্বলিতেছিল। দ্বার পানে চাহিয়া, বিলির প্রত্যাশায় নির্ম্মল, শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল; তবু বিলি আসিল না। নির্ম্মলের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিল, নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন—চন্দ্র, নক্ষত্র নিবিয়া গিয়াছে। উদ্যান, জাহ্নবী অন্ধকারে লুকাইয়াছে - গভীর অন্ধকারে স্থাবর জঙ্গম সকলই আচ্ছন্ন হইয়াছে। গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। আবার শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের নিম্নে উদ্যান মধ্যে কি একটা শুভ্র পদার্থ নির্ম্মলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন নির্ম্মল বিস্মিত নয়নে দেখিলেন যে, ইহা কোন শুভ্রবসনা রমণীমূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে মনুষ্য-মূর্ত্তি সরিয়া অন্ধকারে লুকাইল। নির্ম্মলও শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ক্ষণকাল পরে কক্ষদ্বারে ঈষৎ শব্দ হইল। আশা-উৎফুল্ল প্রাণে নির্ম্মল শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। একটু একটু করিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; দ্বার-পথে একটি অব-

গুণ্ঠনাবৃতা রমণী আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণী ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। নির্ম্মল দেখিলেন, এ বিলি নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া রমণী বলিল, "ইহার মধ্যে ভুলে গেছ?"

নির্ম্মল বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, সম্মুখে জ্যোৎস্না। নির্ম্মলের সাধ, আশা চূর্ণ হইল। কোথায় রৌদ্রে পুড়িয়া গৃহে ফিরিলাম—পিপাসায় পীড়িত হইয়া গৃহিণীর নিকট জল চাহিলাম—জলের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, এমন সময় গৃহে আগুণ লাগিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলই পুড়িয়া গেল! জলের আশা বুকে চাপিয়া নির্ম্মল সশঙ্কিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "এখানে কেন, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "একবার দেখিতে আসিলাম, ঠাকুরঝি অনেক দিন পরে স্বামীর আদর পেয়ে কি করছে। একি, ঠাকুরঝি কোথায়?"

নির্ম্মল নিরুত্তর। জ্যোৎস্নার বিম্বাধরে ঈষদ্ধাস্য রেখা মুহূর্ত্তের জন্য স্ফুরিত হইয়া মিলাইয়া গেল।

জ্যোৎস্না বলিলেন, "ঠাকুরঝি আসে নি? ছি, ছি,

আজ তুমি এসেছ, আজকেও বাগানে যাওয়া! গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।”

নির্ম্মল নীরব। কথা বলা দূরে থাক্, তাঁহার ভাবিবার শক্তিও তখন বিলুপ্ত-প্রায়। কার কথা ভাবিব? কি ভাবিব? বিলি আমার কুপথগামিনী—তাই ভাবিব? হা ভগবান, বাক্য, ভাষা দগ্ধ কর—স্মৃতি মুছিয়া দেও—ভাবিবার শক্তি নিবাইয়া দেও।

সেই সময়ে কি একটা কথা মনে পড়িল। নির্ম্মল বিদ্যুদ্বৎ উঠিয়া গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্নাও নির্ম্মলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে দেখিলেন, গবাক্ষনিম্নে উদ্যান মধ্যে কি একটা শুভ্র পদার্থ। লক্ষ্য করিতে করিতে পদার্থটী, ক্রমে মনুষ্য-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইল। জ্যোৎস্না তখন মূর্ত্তির পানে অঙ্গুলী হেলাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “বুঝি কোন স্ত্রীলোক।”

মূর্ত্তি চঞ্চল পাদবিক্ষেপে দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত হইল। জ্যোৎস্না বলিলেন, “একি!—ঠাকুরঝি নাকি! এস, ঠাকুর জামাই, আমরাও বাগানে একবার যাই।”

নির্ম্মল নীরব। কথা কহিবার ক্ষমতা, চিন্তা করিবার শক্তি তখন তাঁহার নাই। নির্ম্মলের প্রকোষ্ঠ, জ্যোৎস্না হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রমেশ আরোগ্য লাভ করিলে বিলি নূতন মহল ছাড়িয়া পুরাতন মহলে মায়ের সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুরাতন মহলে বিলির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটিতে শুইত, অপরটিতে দিবসে বসিত। পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র ঘরে রেবতী শুইত। নির্ম্মলকে লইয়া রমেশ যখন আদর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, বিলি তখন শয়ন কক্ষে। রাত্রি আন্দাজ একপ্রহর। বিলি শয়ন করে নাই, শুইবার উদ্যোগও করে নাই। রেবতী কাছে বসিয়া পাখা করিতেছিল, আর কত কি বকিতেছিল। সকল কথা বিলি শুনিতেছিল কিনা জানি না; কিন্তু একটা কথা বিলির মন আকর্ষণ করিয়াছিল। কথাটা গোড়া হ'তে বলাই ভাল।

এ-কথা সে-কথার পর রেবতী বলিল, "মনে আছে কি, বউদিদি, এক বছর আগে তুমি একবার এখানে এসেছিলে? সেবার তোমার সঙ্গে বাবু এসেছিলেন। এবার তুমি একা এসেছ।"

বিলির মনেও সেই কথার প্রতিধ্বনি উঠিল। এবার বিলি একা এসে একা হয়েছে; স্বামীর হৃদয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বিলি এবার সত্যই একা।

রেবতী বলিল, "কিন্তু সেবার যা, দেখেছি, বউ দিদি, তা' তোমায় কি বল্‌ব। এক বছর আগে এই ঘরে, এমনি সময়ে দাদাবাবু তোমার ভাজকে নিয়ে যে কাণ্ডটা করেছিলেন, তা' দেখে শুনে কত লোকে কত কি বলেছিল।"

বিলি চুপ করিয়া রহিল। কথাটা কি জানিবার ঔৎসুক্য থাকিলেও স্বামীর গ্লানিকর কথা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে বিলির রুচি হইল না। কিন্তু রেবতী ছাড়িল না। সে শূন্যমার্গে এক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এক বিচিত্র আখ্যায়িকা আরম্ভ করিল। অতিরঞ্জিত করিয়া নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া, নির্ম্মল-জ্যোৎস্নার প্রেমাভিনয়ের কথা রেবতী বলিল। সে ক্ষেত্রে নির্ম্মলের বস্তুতঃ কোন অপরাধ ছিল না, তবু তাহাকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে

সমান অপরাধী করিয়া প্রেমাভিভূত নায়কের চিত্রে চিত্রিত করিতে রেবতী ছাড়িল না। কথাটা দাসীরা কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিল; তাহাও রেবতী বলিল। সকল কথা শুনিয়া বিলির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না। ক্ষণপরে বিলিকে নীরব দেখিয়া রেবতী আহার করিতে চলিয়া গেল। বিলি চিন্তামগ্ন হইল।

স্বামী আজ আসিয়াছেন, নূতন মহলে শুইয়াছেন; বিলি তাহা জানে। স্বামীর কাছে যাইতে বিলিকে কেহ বলে নাই, বলিবারও কেহ নাই। মা উদাসীন, ভাই নীরব, ভ্রাতৃজায়া অনিচ্ছুক। বলিতে আর কে আছে?

যাহা হউক বলিবার অপেক্ষা বিলি রাখে না। পিত্রালয়ে কাহারও সঙ্কোচ থাকে না, বিলিরও ছিল না। স্বামীসন্দর্শনে যাইতে আবার লজ্জা কি? কিন্তু বিলি গেল না।

রাত্রি ক্রমে দেড় প্রহর হইল। বিলি তখনও পালঙ্কের উপর বসিয়া রহিয়াছে। কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। বিলি ভাবিতেছিল, "রেবতী যা' বলিল, তা'কি সত্য? না সত্য হ'তে পারে না। কখনই সত্য নয়। তিনি যে দেবতা, এ যে পশুর কাজ। ছি, ছি, আমি কর্‌ছি কি? তাঁকে পশু ভাবছি। যাক্—এ কথা আর মনে তুলিব

না। তবে এখন আমি করি কি? তাঁর কাছে যাব? না, যাব না—তাঁর কাছে শোব না। যিনি আমায় চান না, কেন তাঁর কাছে যাচিয়া যাব? যিনি অন্যত্র সুখ খুঁজেন, কেন তাঁকে দুঃখ দিতে জোর করে যা'ব? আচ্ছা, সত্য কি তিনি অন্যত্র সুখান্বেষণ করেন? আমায় খুঁজেন না? সত্য কি তিনি আমায় ভালবাসেন না? আমিত জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমার দেবতা কেন এমন হ'লেন? তিনি যে ছুটে ছুটে সকল সময়ে আমায় দেখিতে আসিতেন—তাঁর সাধ, সুখ সকলই যে আমায় নিয়ে ছিল—আমি ছাড়া যে তাঁর আর কোন চিন্তা, বাসনা ছিল না। রাধাবল্লভ, দীনবন্ধু, আমার সে স্বামী কেন এমন হল? আমি কেন আমার মাথা খেয়ে তাঁকে ছাড়িয়া আসিলাম? কেন আমি তাঁর কথা শুনিলাম না? আমার গতি কি হবে, দয়াময়?"

বিলি কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "একবার তাঁহাকে দেখিতে সাধ হয়—একবার তাঁর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হয়; তিনি দয়ার সাগর, ক্ষমা চাহিলে দাসীকে ক্ষমা করিবেন। যাই, তাঁর কাছে যাই, সকল ব্যথা তাঁহাকে জানাই। কিন্তু—কিন্তু

তিনিত আমায় দেখিতে আসেননি, দাদাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।”

বিলি এবার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চুলের গোছা মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া কাপড়টা গুছাইয়া পরিল। পরিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণ পরে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইল; শুইয়া, আবার কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, “তবে কি এ জীবনে তাঁহার সঙ্গে আর দেখা করব না? এইখানে এমনি ভাবেই কি জীবনটা কাটুবে? কি নিয়ে থাকৃব? আমার যে সাধ, আশা, উল্লাস তাঁহাতেই নিহিত—আমার কাম্য, ভোগ্য, উপাস্য সকলই যে তিনি—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ঈশ্বর সকলেই যে আমার স্বামী। দেবতার দেবতা স্বামীকে ছাড়িয়া, এই কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন জীবন লইয়া কি করিব? যাঁর সেবার জন্য এই দেহ, যাঁর তৃপ্তির জন্য আমার রূপ, যাঁর সুখের জন্য আমার জীবন, তাঁর ভোগে যদি এ জীবন না লাগিল তবে এ নিষ্ঠীবন-তুল্য জীবন ধারণে ফল কি?”

বিলি কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইল। কাঁদিয়া, হৃদয়বেদনা কিছু উপশমিত হইলে বিলি শয্যায় উঠিয়া বসিল; ভাবিল,

একবার তাঁর কাছে যাই—একবার তাঁকে দেখে আসি। যদি তিনি আদর না করেন তবে চলে আস্‌ব।"

বিলি, শয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল; দীপ হস্তে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কপাট উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্গলে হাত দিল; কিন্তু দ্বার না খুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, "না, যাব না। যিনি অন্য রমণীতে অনুরক্ত, তাঁর কাছে আর যাব না। যতদিন তিনি আমার অনুরাগী ছিলেন ততদিন আমি তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ছিলাম। যখন তিনি নিজের মর্য্যাদা ভুলিয়া, ধর্ম্ম খোয়াইয়া পাপানুরক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি আমার ভক্তির পাত্র হইলেও, আমি আর তাঁহার চরণে লুটাইবার জন্য উপযাচিকা নহি।"

বিলি আবার শয্যায় আসিয়া বসিল। আবার কত কি ভাবিল, আবার স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। অবশেষে ভাবিয়া, চিন্তিয়া স্থির করিল যে, অন্তরাল হইতে একবার স্বামীকে দেখিয়া আসিবে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বিলি, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর এক ব্যক্তি চলিল। এ

ব্যক্তি হারাণ। বিলির শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে রেবতী শুইত। রেবতীর ঘরে থাকিয়া হারাণ আপন সুযোগ খুঁজিতেছিল। স্বামী-স্ত্রী সম্মিলনে বিঘ্ন ঘটান সম্ভবত হারাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিলি যখন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল, হারাণও তখন অদৃশ্য থাকিয়া বিলির অনুসরণ করিল।

এই উদ্যান, অন্তঃপুরসংলগ্ন—গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই উদ্যানের একাংশে নির্ম্মল কিছু পূর্ব্বে বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। এই উদ্যান মধ্যে একদিন জ্যোৎস্না, নবীন ডাক্তারের সহিত নিশাকালে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই উদ্যানের এক ভাগে একদা বিজলী হারাণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন। এই উদ্যান সুবিস্তৃত, নানাবিধ পুষ্পলতায় পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে দীর্ঘিকা। পাড়ের উপর অসংখ্য, অগণিত নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অন্ধকার কোলে পাতা-লতা, ফুল-ফল সকলই লুক্কায়িত। সব নিস্তব্ধ; চারিদিকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার; আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে সব স্থির। যেখানে গাছ-পালা, সেখানে আরও অন্ধকার—যেন অন্ধকারের ভিতর মূর্ত্তিময়ী তামসী ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিলি সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই জনশূন্য উদ্যানে নির্ভীকচিত্তে একাকী প্রবেশ করিল। দ্বিতলোপরি যে কক্ষ মধ্যে নির্ম্মল বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কক্ষের একতম গবাক্ষ-নিম্নে বিলি আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে বৃক্ষান্তরালে হারাণও লুকাইল।

নির্ম্মলের কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—গবাক্ষও উন্মুক্ত ছিল। ক্ষণপরে বিজলী গবাক্ষ পথে নির্ম্মলের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র বিলির দেহ মধ্যে তাড়িত ছুটিল; পরক্ষণই অবসাদে অবসন্ন হইয়া বিলি মাটীতে বসিয়া পড়িল।

তুমি কে? গবাক্ষ পথ উদ্ভাসিত করিয়া নবগ্রহের রূপ ধরিয়া তুমি কে? অনেক দিন পূর্ব্বে তোমায় দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার চারি ধারে আলো ছিল, তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, এখন তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাই না কেন? এখন তোমার সামনে অন্ধকার, পিছনে আলো কেন?

অন্ধকার ছাড়িয়া একবার তুমি আলোকে এস; তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখি। অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, একবার তোমায় দেখি। যেরূপেতে আগে দেখা

দিতে সেই রূপেতে একবার—একবার মাত্র দেখা দেও। আমি যে তোমায় না দেখিলে বাঁচিতে পারি না; তুমি যে মেঘ, আমি যে নিদাঘ-সন্তপ্ত বিশুষ্ক তড়াগ। তুমি যে পূর্ণিমার শশধর, আমি যে আঁধারাবৃত অরণ্য মধ্যে পথহারা পথিক। কোথায় আমার শান্তি, কোথায় আমার আলো, একবার এস—একবার আমায় দেখা দেও—একবার আমার মরুদগ্ধ প্রাণ শীতল কর।

আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না—তোমার চিন্তা বই আর কিছু শিখি নাই। প্রভাতে উঠিয়া পূরব আকাশে তোমারই ছটা দেখিয়া তোমাকে প্রণাম করি—মধ্যাহ্নে, তোমার অন্ধকারশূন্য, ছিদ্রহীন, জ্যোতির্বিমণ্ডিত মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখি—নিশাকালে, স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোদ্দীপ্ত পুষ্পময় উদ্যান মধ্যে তোমারই গন্ধে প্রফুল্ল হইয়া, তোমারই রূপ অঙ্গে মাখিয়া, তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া, তোমাতেই মিশাইয়া যাই! তুমি যে আমার কর্ম্ম, তুমি যে আমার জ্ঞান।

ক্ষণকাল আত্মহারা হইয়া বিলি, গবাক্ষ-পথ-মধ্যবর্ত্তী নির্ম্মলের মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "এত রাত্রি হইয়াছে তবু এখনও শয়ন করেন নাই কেন? আমার

জন্য? আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি কি জাগরণে নিশি অতিবাহিত করিতেছেন?” এই সুখের চিন্তাটুকু হৃদয়ে লইয়া নির্ম্মলের মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিলির গণ্ড, বক্ষ প্লাবিত করিয়া অশ্রু-ধারা ছুটিল; অভিমান, গর্ব্ব, নিরাশা ভাসিয়া গেল।

বিলি আর স্থির থাকিতে পারিল না,—স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইবার আশায় উন্মাদিনীর ন্যায় সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ছুটিল। কিন্তু উদ্যান অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তরুলতা পায়ে লাগিয়া পড়িয়া গেল। পায়ে বড় ব্যথা লাগিল; কিন্তু বিলি তখন জ্ঞানশূন্যা, ব্যথা অনুভব করিবার তাহার শক্তি ছিল না। উঠিয়া, আবার ছুটিল। সত্বর উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল। উদ্যান মধ্যে অন্ধকার, প্রাঙ্গণে অন্ধকার, ভবন মধ্যে আরও ঘনীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বিলি সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়িতে আলো ছিল, কিন্তু ক্ষণ পূর্ব্বেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—দীপ তখনও অগ্নিমুখ। বিলির কোন দিকে লক্ষ্য নাই; চো’খে আলো অন্ধকার কিছুই ঠেকিতেছে না। জ্যোতি-র্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধরিয়া, সুখের আশায় আকুল হইয়া বিলি

ছুটিয়াছে। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান নিবিয়া গিয়াছে। বিলি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে, উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। দুই, তিন ধাপ উঠিতে না উঠিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। মাথায় দারুণ আঘাত লাগিল, কপাল ফাটিয়া রুধিরধারা ছুটিল। কিন্তু বিলি তাহা জানিল না, যন্ত্রণাও অনুভব করিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া আবার অগ্রসর হইল। এবার নির্ব্বিঘ্নে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হলঘরের দ্বার সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু দ্বার খোলা পাইল না—ভিতর হইতে রুদ্ধ। বিলি অনেক ঠেলিল, কিন্তু দ্বার খুলিল না। অবশেষে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, তবু কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। হতাশ হইয়া বিলি হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। করযোড়ে, কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, দয়াময়, স্বামিন্, দ্বার খুলে দেও; আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছি, আমায় দেখিতে দাও। আর আমি তোমার উপর অভিমান করুব না, আমায় ক্ষমা কর। আমার সব অপরাধ ভুলে গিয়ে, আমায় একবার দ্বার খুলে দেও, আমি একবার তোমার কাছে গিয়ে তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি।"

দ্বার কেহ খুলিল না। চক্ষের জলে, দেহের রক্তে

হর্ম্ম্যতল সিক্ত হইল, তবু কেহ দ্বার খুলিল না। বিলি জানিত না যে, কিছু পূর্ব্বে জ্যোৎস্না, সিঁড়ির আলো নিবাইয়া হল ঘরে প্রবেশ করতঃ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

হঠাৎ বিলির স্মরণ হইল যে, উদ্যান হইতে গবাক্ষ পথে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে স্বামী, দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন। এই নব আশা মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইবামাত্র বিলি হর্ম্ম্যতল ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি নামিয়া আবার উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

---o*o---

বিলি উদ্যানে ফিরিয়া কথিত জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর গবাক্ষ পথে স্বামীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু একি! স্বামীর পাশে এ কে? শিহরিয়া দেখিল, স্বামীর পাশে একটি রমণী মূর্ত্তি। মুহূর্ত্তে বিলি তাহাকে চিনিল। চিনিবা মাত্র বিলির আশা, উল্লাস নিবিয়া গেল—বুকের উপর

যেন পাষাণ চাপিয়া বসিল। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া বিলি অবসন্ন দেহে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।

পরমুহূর্ত্তে গবাক্ষপথাগত জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বর বিলির কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই স্বর শুনিবা মাত্র বিলি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং গবাক্ষপানে আর একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিল, একজন অপরের অঙ্গের উপর ঢলিয়া পড়িয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বিলিকে দেখাইতেছে। তখন রেবতীর কথা বিলির স্মরণ পথে উদয় হইল। বিলি সেখানে আর দাঁড়াইল না—ক্ষিপ্র পদে সে স্থান ত্যাগ করিল; অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অন্ধকার মধ্যে ছুটিয়া পলাইল।

আর একজন বিলির পিছু ছুটিল। এ ব্যক্তি হারাণ। সে বরাবর অদৃশ্য থাকিয়া বিলির অনুসরণ করিতেছিল। কিন্তু বিলি যখন ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হারাণ তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে হারাণ গৃহমধ্যে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় শুভ্রবসনা উন্মাদিনীর মূর্ত্তি হারাণের নয়নপথে পড়িল। হারাণ নীরবে বিলির পাছু পাছু ছুটিল।

এমন সময় আকাশে ঝড় উঠিল। গগনপ্রান্ত হইতে অগণিত কৃষ্ণকেশী ভীষণদর্শনা পিশাচীর দল মধ্যাকাশাভিমুখে ধাবিত হইল। সেই হুঙ্কারশব্দে প্রকৃতি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া, চক্ষের রোষাগ্নিতে স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করিয়া, উন্মত্ত রাক্ষসীর দল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া চলিল। জীব, জন্তু, যে কেহ তাহাদের বিশ্ববিনাশন হুঙ্কার ধ্বনি শুনিল, সে-ই সভয়ে আশ্রয়ান্বেষণে ছুটিল। কেবল বিলি আশ্রয়প্রার্থী নয়। ক্ষিপ্তা রাক্ষসী অপেক্ষা ক্ষিপ্তচরণে বিজলী ছুটিল। অশ্রুজলে বসন সিক্ত, গাত্র শোণিতার্দ্র, বসন স্খলিতপ্রায়; নিরাশানিপীড়িত, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়খানি লইয়া তমসাময়ী ঘনঘটাচ্ছন্ন গভীর নিশিতে সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা, উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে ক্ষিপ্তা জাহ্নবী সলিলে সহ্যাতীত যাতনা নিবাইবার উদ্দেশে ছুটিল।

এমন সময় পিছন হইতে কে আসিয়া বিলির হাত চাপিয়া ধরিল। বিলি না ফিরিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও; আমায় ধ'রে রেখনা, মর্‌তে দাও।"

যে হাত ধরিয়াছিল, সে হারাণ। হারাণ বলিল, "কেন

মরিবে, বিজলি? কি দুঃখে, এই নবীন বয়স, এই অতুলনীয় রূপ, ডুবাইয়া দিতে ছুটিয়াছ? যা'কে দেখিলে জগতের দুঃখ ঘুচে, তা'র আবার দুঃখ কি? যা'র নয়নের পলকে পলকে সংসারের সুখ, জগতের সৌন্দর্য্য, ত্রিদিবের সুধা সৃজিত হয় তা'র আবার দুঃখ? রমণীর সার, সংসারের সার, সৃষ্টির সার, এস, আমার হৃদয়ে এস; নীল আকাশে চাঁদ যেমন ফুটিয়া থাকে—সরসীবক্ষে নলিনী যেমন বাপীদেহ আলোকিত করে, তেমনি তুমি আমার হৃদয়ে এসে আমার হৃদয় আলোকিত কর।"

কাহাকে কি বলিতেছ, হারাণ? আর কি বিলির চেতনা আছে? স্বর্গের যে ফুলটি পাপাকুলিত হৃদয়ে টানিয়া, ছিঁড়িয়া গলায় পরিতে বাসনা করিয়াছ, তোমার পাপদগ্ধ হৃদয়ের ঝঙ্কার শুনিবার পূর্ব্বেই সেই সদাপ্রফুল্লময়ী কাননলতিকা, বজ্রাহতা পক্ষিণীর ন্যায়, চৈতন্যশূন্য হইয়াছে।

বিলির চেতনাহীন, পতনশীল দেহ, বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া হারাণ, ধীরে ধীরে উদ্যানের কাঁকরের উপর শোয়াইল। জল আনিয়া বিলির চৈতন্য সম্পাদন করিবে কিনা ভাবিতেছিল, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে

আরম্ভ হইল। চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। সেই বিদ্যুতালোকে হারাণ, একবার ধরা-লুণ্ঠিতা দামিনীলতার পানে চাহিয়া দেখিল। মরি, মরি, কি সুন্দর! আকাশে জলভরা জলদের মাঝে জলমাখা বিজলীর খেলা, হারাণ অনেক দেখিয়াছে—কল্লোলিনী-হৃদয়ে ধারাসিক্ত ঝটিকাছিন্ন কমলিনীর কান্না অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য হারাণ কখন দেখে নাই; হারাণ মুগ্ধ, বিমোহিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার পশুভাব দূরে গেল; সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা, কি সুন্দর! সংসারে বুঝি এমনতর আর কিছুই নাই।"

জলধারায় সিক্ত হইয়া বিলির সহজেই চৈতন্যোদয় হইল,--বিলি উঠিয়া বসিল। জ্ঞানের সঙ্গে আবার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; হারাণ হাত ধরিয়া বসাইল। এমন সময় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সেই বিদ্যুতালোকে বিজলী ও হারাণ, দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি নিকটে দেখিল। দুই জনেই তাহাদের চিনিতে পারিল। চিনিবামাত্র হারাণ ছুটিয়া পলাইল।

আর বিজলী? বিজলী সেই ভাবেই সেই খানে চেতনাবিহীন প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতেছিল না—তার চো'খের সাম্‌নে সব ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

আগন্তুকদ্বয়—নির্ম্মল ও জ্যোৎস্না। তাঁহারা বিদ্যুতালোকে হারাণ ও বিজলীকে পাশাপাশি বসিয়া থাকিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যুৎ নিবিয়া গেল, হারাণও পলাইল। অপর তিন জন সেই ঝড়বৃষ্টিময়ী তামসীর মধ্যে নীরব। মাথার উপর অজস্র বৃষ্টিধারা, চারিপাশে প্রভঞ্জন-হুঙ্কার, সম্মুখে জাহ্নবীর গর্জ্জন, চারিধারে দিক্‌-প্রতিধ্বনিত বজ্রনির্ঘোষ,—আর সেই শব্দময়ী উন্মত্তা প্রকৃতির কোলে উন্মত্ত হৃদয়ে তিন জনে নীরব।

বিলির কাছে হারাণকে দেখিবেন জ্যোৎস্না এরূপ আশা করেন নাই। এক্ষণে এবম্বিধ অন্ধকার নিশীথে তাহাদের একত্র অবস্থান করিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। পুরাতন কথা একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। বিলিকে পাইবার আশায় হারাণ যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া লইতে জ্যোৎস্নার একটু বিলম্ব হইল। একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া, সেই নীরবতা

ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্না বলিলেন, "এই যে ঠাকুর ঝি। আমরা তোমায় সমস্ত বাগান খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ বৃষ্টির মধ্যে এমন সময়ে এখানে কেন?"

বিলি নিরুত্তর। নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-লেন "বিলি বিলি,—এই কি আমার সেই বিলি? হা, ভগবান, এ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে আমায় অন্ধ করিলে না কেন? বিলি মরিল না কেন?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "ছি, ছি, ঠাকুরঝি, তোমার এই কাজ? আমি যে লোকের কথা বিশ্বাস না ক'রে তোমায় ভাল ব'লে জানিতাম।"

জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে বিলির চমক ভাঙ্গিল। বিলি উঠিয়া, ধীরে ধীরে একবার জ্যোৎস্নার সমীপস্থ হইল, অন্ধকারের মধ্যে একবার জ্যোৎস্নার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল। পর মুহূর্ত্তে ভাগিরথীগর্জ্জন, বায়ুর হুঙ্কার ডুবা-ইয়া ভাঙ্গা গলায় মর্ম্মদগ্ধপ্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সব গেল—আমার সব গেল গো।" চীৎকার করিতে করিতে পাগলিনী গঙ্গার দিকে ছুটিয়া পলাইল।

জাহ্নবীজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশে গঙ্গার উপকূলে আসিয়া বিলি দাঁড়াইল। তার পর ধীরে ধীরে

—অতি ধীরে, একটু একটু করিয়া জলে নামিল। নির্ম্মল একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন বিলি তাহা শুনিয়াছিল মাত্র—অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এক্ষণে সেই কথা কয়টির অর্থ একটু একটু করিয়া মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। যখন অর্থ, সম্যক্ উপলব্ধি হইল, তখন বিলি থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল—আর নামিল না। আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিছুই দেখিতে পাইল না। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; সম্মুখে অন্ধকারময় অজ্ঞাত অনন্ত জলরাশি,—অনন্ত যাত্রার পথ মুক্ত। পিছনে অন্ধকারের মধ্যে স্মৃতির আলো। বিলি চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন সে অন্ধকারাবৃতা জাহ্নবী, তমসাচ্ছন্ন গগনতল, কিছুই দেখিতে পাইল না; দেখিল, কেবল অনন্ত আকাশ জুড়ে,অনন্ত আকাশ আলো ক'রে নির্ম্মলের মূর্ত্তি। নির্ম্মল যেন অঙ্গুলী হেলাইয়া ঘৃণার সহিত বলিতেছে, "ছি, ছি, এই কি সেই বিলি!"

বিলি আর সহ্য করিতে পারিল না—ফিরিল। জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া ভাবিল, "তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবিবেন, এ কলঙ্ক লইয়া আমি মরিতে পারিব না। আমি মরিয়া গেলে, কে

তাঁহার এ ভ্রম ঘুচাইবে? একবার তাঁহার কাছে যাই, একবার তাঁকে বলে আসি, আমি কলঙ্কিনী নই, আমি তোমা বই আর কিছু জানি না। কিন্তু আমি তোমাতে কলঙ্ক দেখিয়া আজ মরিতে চলিলাম।"

বিলি ফিরিয়া আবার উদ্যান মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল; চারিদিকে খুঁজিল, কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, নির্ম্মলের ঘর অন্ধকার। ধীরে ধীরে ডাকিল,"আমি এসেছি, একবার একটা কথা শুন।" কাহারও কোন সাড়া পাইল না। বিলি সেখান হইতে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া নির্ম্মলকে উদ্যান মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ক্ষীণকণ্ঠে উদ্যান মধ্যে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একবার এস; একবার একটা কথা শুন।" ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টিময়ী নিশিতে, সেই বৃক্ষলতাসমাকুল উদ্যান মধ্যে বিলি উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহা খুঁজিতেছিল তাহা কোথাও পাইল না। অবশেষে নিরাশা ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া উদ্যান মধ্যে পড়িয়া গেল—যেন শিশির-

নিষিক্ত পদ্মটি, ঝটিকাবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মল, বজরায় উঠিয়া বজরা ছাড়িয়া দিলেন। জ্যোৎস্না সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

বঙ্গসংসার।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হালদার ঠাকুরাণী এক্ষণে সোহাগদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। সোহাগের জন্য তাঁহার মায়া মমতা সহসা উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বস্থানে বলিয়া বেড়াইতেন যে, সোহাগের বিবাহ দিয়া দিতে না পারিলে তাঁহার মনে আর সুখ নাই। আহা, এত বড় মেয়ে, আজও বিবাহ হয়নি; মা দেখে না, পাড়ার লোকেরা দেখে না। মেয়ে যে আজও ঘরে আছে, এই ঢের—ইত্যাদি।

দ্রব্যসম্ভার উপহার দিতেও হালদারণীর ত্রুটি ছিল না। তবে সে গুলি অতি সামান্য। কখন দু'টা বেগুণ, কখন বা দু'টা এঁচোড় আনিয়া ঠাকুরাণী, সোহাগের মাকে দিতেন। তা'ছাড়া সাংসারিক দুই একটা কাজেও সাহায্য করিতে হালদারণী উদাসীন ছিলেন না।

ঠাকুরাণীর এবম্প্রকার নানাবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া সোহাগের মা বলিতেন, "ঠাকুরাণী, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে?" ঠাকুরাণী প্রত্যুত্তর স্বরূপ বস্ত্রাঞ্চলে চো'খের কোণ মুছিয়া নাকি সুরে বলিতেন, "এ সংসারে আর ক'দিন

আছি, বোন্? তোমায় দেখ্‌ব নাত কা'কে দেখ্‌ব বল?"

এইরূপে কয়েকদিন কাটিল। আজ বৈকালে ঠাকুরাণী, দু'টা লাউয়ের ডগা ও একটা বেল হাতে করিয়া আসিয়াছে। গৃহিণী পরম আপ্যায়িত হইয়া সযতনে তাহা ঘরে তুলিলেন। হালদারণী, সোহাগের চুলের রাশি লইয়া কবরী বন্ধনে ব্যাপৃতা হইল। সেকালের মেয়ে হ'লেও হালদারণী চুল বাঁধিতে বড় দক্ষ ছিল। খোঁপাটি বেশ বাঁধা হ'ল,—দেখ্‌তে ঠিক যেন চিড়িতনের টেক্কা। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে টিপ দিয়া হালদারণী বলিল, "তোর মুখ খানি খুব সুন্দর, যেন হরতনের টেক্কা।" সোহাগ শুধু একটু হাসিল।

টিপ পরাইয়া হালদারণী, সোহাগকে বলিল, "আয়, আমাদের পাড়ায় কাপড় কাচ্‌তে যাবি আয়।" সোহাগ উত্তর না দিয়া, মায়ের পানে চাহিল।

মা বলিলেন, "তা' যাও না কেন, জেঠাইয়ের সঙ্গে যাবে তা'তে আর দোষ কি?"

সোহাগ একখানা কাচা কাপড় হাতে লইয়া ধীরে ধীরে হালদারণীর পাছু পাছু চলিল। জানালা হইতে কিঙ্কর তাহা দেখিল।

ঠাকুরাণীর বাড়ী সন্নিকটে। তবে সড়ক ছাড়িয়া নির্জ্জন পথ ধরিলে একটু দূর হয়। ভদ্রঘরের মেয়েরা সচরাচর নির্জ্জন পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। হালদার ঠাকুরাণী তাহাই করিল।

বাড়ীতে আসিয়া হালদারণী ঘরের চাবি খুলিল। ঘর খানি ছোট খাট, বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দাওয়াতে রান্না হয়। সাম্‌নে বেশ একটু বড় উঠান; তা'তে একটা লাউমাচা, একটা লেবুগাছ, তার পাশে দুটা বেল, দুটা পিয়ারা ইত্যাদি কয়েকটা গাছ আছে। ঘরের পাশে গোটা কতক লঙ্কা গাছ—তার পাশে মঞ্চের উপর তুলসী গাছ; গাছের মাথায় ঝারা; তাহা হইতে অবিরাম জল পড়িয়া নিদাঘ-সন্তপ্ত তুলসীকে শীতল করিতেছে।

হালদারণী, ঘর দ্বার, গাছপালা সকলই সোহাগকে দেখাইল। দেখাইয়া দত্তদের পুকুরে গা ধোয়াইতে লইয়া চলিল। পুকুরটি বেশ বড়, সান্‌বাঁধান ঘাট; চারিদিকে আম কাঁঠাল গাছ। জলও বেশ পরিষ্কার। পাড়ার যুবতীরা জলের লোভেই হউক অথবা যে কারণেই হউক বৈকালে এই পুকুরে আসিয়া পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠাইত। দীর্ঘি-কায় কুমুদিনী কহ্লার ছিল না; কিন্তু সুন্দরীরা যখন

বুকে ঘড়া দিয়া জলের উপর ভাসিত, তখন মরিরে! ছার কুমুদিনী কহ্লার! পারিজাতও বুঝি সে রূপের কাছে হারি মানে ;—তাই বুঝি বা সে মনের দুঃখে ধরা ছাড়িয়া স্বর্গে পলাইয়াছে। আবার যখন সন্ধ্যাকালে ভামিনীকুল আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া হাসির ফুয়ারা ছুটাইত, তখন শতচন্দ্র সরসীবক্ষে ফুটিয়াছে বলিয়া স্বর্গসুন্দরীদের ভ্রম হইত; যতক্ষণ না সেই রূপসীদল বাপীতট ছাড়িয়া অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিত, ততক্ষণ তারকাকুল রূপগর্ব্ব খর্ব্ব ভয়ে আকাশের মধ্যে শঙ্কিতান্তঃকরণে লুকাইয়া থাকিত। যখন চন্দ্রাননীরা সরসীমুকুর-প্রতিবিম্বিত রূপবিভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিত, তখন বাপীতটস্থিত বৃক্ষশাখা-বলম্বী বিহঙ্গমকুল, শত শশধরের একত্র সম্মিলন দেখিয়া আনন্দে কলরব করিত; কিন্তু যখন ললনাকুল সন্ধ্যা সমাগমে সরসী ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিত, তখন পাখীর দল পুষ্করিণীর আলো, তা'দের চোখের আলো নিবিয়া গিয়াছে ভাবিয়া শোকে নীরব হইত।

আজও বৈকালে নানা রকমের নানা মেয়ে ঘাটে গা ধুইতে আসিয়াছিল। যা'র খোঁপার বাহারটা কিছু বেশী, সে পিছন ফিরিয়াই কথা কহিতেছে। আবার যার

সামনেটা খুব গুলজার, সে সম্মুখ ছাড়া পিছন দেখাইতেছে না। যাহাকে ভগবান মারিয়াছেন, সে পরের চুল লইয়া কোন রকমে কবরীর সাধ মিটাইয়াছে। ঘাটে সম্মিলিত হইয়া কেহ বা বয়স্যার কাছে স্বামীর রূপ গুণের পরিচয় দিতেছে; কেহ বা গহনা দেখাইতেছে, আর ঘরে কি কি গহনা আছে তাহারও ফর্দ্দ দিতেছে। আবার যে সীমন্তিনী স্বামীর নিকট দু'চারিটা রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছে, সে তাহা স্থানে অস্থানে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছে। কোন মসীবরণা ভামিনী, অঙ্গে সাবান ঘসিতেছে; কোন পক্কবিম্বাধরা, ওষ্ঠ প্রান্ত কাপড় দিয়া মাজিতেছে; কেহ বা খানকা জল ছিটাইয়া সঙ্গিনীদের ব্যতিব্যস্ত করিতেছে।

এমন সময় ঘাটের উপর হালদারণী ও সোহাগ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসিদ্ধা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সোহাগকে দেখিয়া যুবতীদল মধ্যে বড় গোল পড়িয়া গেল। কেহ বা অধর টিপিয়া একটু হাসিল, কেহ বা বয়স্যাকে আঁখি ঠারিল, কেহ বা সঙ্গিনীর গা টিপিল। ইঙ্গিতে, ইসারায় অনেক ঠাট্টা, বিদ্রূপ চলিল। হালদারণী, বুড়া ঘাগী—সে সকলই বুঝিল। কিন্তু সোহাগ, সরলপ্রাণা, নিষ্কলঙ্কা বালিকা মাত্র; সে কিছুই বুঝিল না। একধারে সঙ্কুচিত ভাবে

কাপড় কাচিয়া ঘাটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গ বহিয়া জলধারা ছুটিল। সিক্ত বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তপ্ত কাঞ্চন গৌর-বরণ ফুটিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, সোহাগ সুন্দরী বটে। ঈর্ষায় হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। সোহাগ চলিয়া গেলে রমণী মহলে সোহাগের নিন্দা উঠিল। কুৎসার মত এমন তৃপ্তিকর, চিত্ত আকর্ষক আর কি আছে? সকলে প্রাণ ভরিয়া গরল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আমাদের সে সকল জঘন্য কথায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

হালদারণীর উঠানে দাঁড়াইয়া সোহাগ ভিজা কাপড় ছাড়িল। তা'রপর ঠাকুরাণী সোহাগকে কিছু জল খাইতে ঘরের ভিতর ডাকিল। ঘরের ভিতর আসিয়া সোহাগ আহারে বসিল। এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া দ্বার দেশে পড়িল। সোহাগ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, কিঙ্কর। ঠাকুরাণী, কিঙ্করকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইল; এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। সোহাগ কিছু বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কুচিতভাবে ঘরের এক পাশে সরিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
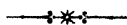
বিশালপুর হইতে নির্ম্মল পূর্ব্ব রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া দাস দাসী, নায়েব, গোমস্তা সকলেই ভয় পাইল। মায়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, মাকে প্রণাম না করিয়া নির্ম্মল শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। যে কক্ষে নির্ম্মল, বিলিকে লইয়া কত সুখের নিশি অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ সেই কক্ষে—সেই বহু স্মৃতিপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলের মন একবার একটু চঞ্চল হইল, তারপর সব স্থির। যেমন সরসীবক্ষে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে সরসীদেহ একবার কাঁপিয়া উঠে, তারপর সব স্থির, প্রশান্ত, তেমনই নির্ম্মলের হৃদয় একবার স্পন্দিত হইয়া সব স্থির হইল।

মা আসিয়া ডাকিল; ছেলে সাড়া দিল না, দ্বারও খুলিল না। মা চলিয়া গেল; ভাবিল, ছেলে ঘুমাইয়াছে। কিন্তু মায়ের প্রাণ সুস্থির হইল না; কেন না, ছেলে আসিয়া অবধি দেখা করে নাই। মা আবার দুই চারি দণ্ড পরে

ছেলের তত্ত্ব লইতে আসিল। দেখিল, দ্বার উন্মুক্ত, ঘরে নির্ম্মল নাই। এঘর সেঘর খুঁজিয়া কোথাও নির্ম্মলের সাক্ষাৎ পাইল না। তখন অন্নপূর্ণা ব্যাকুলান্তঃকরণে, ক্ষিপ্রপদে ছাদে উঠিলেন।

ছাদে আসিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, কাপড়, জামা, পুস্তক, পত্র, পুতুল, পশম প্রভৃতি নানাবিধ বিলির ব্যবহৃত দ্রব্য নির্ম্মলের সম্মুখে স্তূপীকৃত রহিয়াছে। নির্ম্মল, সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিতে উদ্যত; এমন সময় অন্নপূর্ণা পিছন হইতে ডাকিলেন, "নির্ম্মল!" নির্ম্মল নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা আবার ডাকিলেন, "নির্ম্মল!" এবার নির্ম্মল সাড়া দিলেন; কিন্তু উঠিলেন না। মায়ের পানে ফিরিয়া না চাহিয়া তিনি সেই পত্ররাশিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। সেই স্তূপমধ্যস্থিত প্রত্যেক পত্র নির্ম্মল কতবার বক্ষোপরি ধারণ করিয়াছেন—কতবার আঁখিজলে সিক্ত করিয়াছেন। আজ সেই অতীতের স্মৃতিটুকু ডুবাইবার আশায় নির্ম্মল, প্রাণতুল্য প্রিয় পত্রগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। পত্ররাশি জ্বলিয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "নির্ম্মল, এ কি করিতেছ?"

নির্ম্মল উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মা,

ছেলেকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'য়েছে, বাবা?"

নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া লইলেন—কোন উত্তর করিলেন না। মার প্রাণ তখন অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল। সকাতরে নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে ত কোন কথা কখন লুকাতে না, বাবা! তবে আজ এমন করিতেছ কেন? বউমা কেমন আছেন? তাঁকে আন নাই কেন, বাবা?"

নির্ম্মল এবার উত্তর করিলেন। তাঁহার স্বর অবিকম্পিত। বলিলেন, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আজ হইতে ভাবিও, তোমার পুত্রবধূ মরিয়া গিয়াছে।"

অন্ন। ষাট, ষাট, সে কথা কি বল্‌তে আছে? আমার বৌমা ভাল আছেন ত?

নি। ভাল আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা না দেখিয়া যদি তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিতাম তাহা হইলে অধিকতর সুখী হইতাম।

অন্ন। সে কি! এ কি বল্‌ছ? আমি তোমার কোন কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

নি। মা, সেই পাপিষ্ঠা কুলকলঙ্কিনীর কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না।

অন্নপূর্ণা, নির্ম্মলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কা'র কথা বল্‌ছ? আমি বউমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

নি। আমিও সেই মহাপাপিষ্ঠার কথা বলিতেছি।

অন্ন। স্থির হও; আত্মবিস্মৃত হইও না, নির্ম্মলকুমার।

নি। আত্মবিস্মৃতি এখন আর নাই, এতদিনে ঘুচিয়াছে।

অন্ন। তুমি ক্ষেপিয়াছ, নইলে এতটা মতিভ্রম মানুষে সম্ভব নয়।

নি। ক্ষেপিতে পারিলেও সুখের হ'ত, মা; তা'হলেও যে, সে কুলটাকে সময়ে সময়ে ভুলিতে পারিতাম।

অন্ন। কুলটা? কুলটা বল্‌ছ? আমার বৌমাকে কুলটা বল্‌ছ? তুমি অধঃপাতে গিয়াছ। আপন ধর্ম্মপত্নীকে যে ভ্রমেও কলঙ্কিনী মনে করে, সে নারকী।

নি। আমি নিজের চো'খে যা' দেখেছি তা' আমায় অবিশ্বাস কর্‌তে বল্‌ছ?

অন্ন। তোমার চো'খ! শুধু তোমার চো'খ কেন,—এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকলে যদি বলে—আকাশের তেত্রিশ কোটি দেবতা যদি একবাক্যে বলে,—আমার বউমা অসতী, পাপস্পর্শিত, তা'হলেও আমি বলিব যে, ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ ও দেবতা মিথ্যাবাদী—তোমারই ন্যায় ভ্রান্ত ও দুর্ব্বলচিত্ত।

নির্ম্মল বিস্মিত হইলেন; মুগ্ধচিত্তে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিকে অন্ধকার, মধ্যস্থলে—পত্র, পুস্তক, বস্ত্র প্রভৃতি ধু ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আলোকে নির্ম্মল দেখিলেন, মায়ের মুখের উপর অপূর্ব্ব ছটা পড়িয়াছে। সে ছটা, সে জ্যোতি এ পৃথিবীর নয়। তাঁহার মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবীমূর্ত্তি, মরুভূমিতে জল ছিটাইতে, শ্মশানে মৃতসঞ্জীবনী ঢালিতে অন্ধকার মধ্যে আলোকময়ী রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ভক্তিতে নির্ম্মলের প্রাণ আপ্লুত হইল—তিনি মায়ের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি মা, বলে দেও, চোখে যা' দেখেছি তা' কেমন করে ভুলে যাব?"

অন্ন। ভুলতে তোমায় বলি নাই—কি দেখেছ তা'ও

শুনিতে চাই না; সে জঘন্য কথা তোমার হৃদয়ে লুকান থাক্। কিছুদিন বাদে তুমি নিজেই তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এখন এ কি করিতেছ?

নি। চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতেছি।

অন্ন। স্মৃতি মুছিতে পারিবে কি?

নির্ম্মল নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে এ বাতুলতা কেন? পাগলামী ছাড়িয়া আমার কথা শুন। তুমি আবার যাও—আবার বিশালপুরে যাও—বৌমাকে সকল কথা খুলিয়া বল; তিনি তোমার অলীক সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।

নি। আবার সেখানে? এ জীবনে আর নয়, মা।

মাতাপুত্রে তা'রপর অনেক কথা হইল। অনেক কথার পর নির্ম্মলকে কতকটা শান্ত করিয়া, গুরুভার হৃদয়ে লইয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন।

বস্ত্রাদি পুড়িয়া শেষ হইল। নির্ম্মল সেই ভস্মরাশির মধ্যে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে, নির্ম্মলকুমার অশ্বারোহণে সোহাগদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোহাগ তখন হালদারণীর সঙ্গে দত্তদের পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। নির্ম্মল বলিলেন, "সোহাগকে এখনই চাই-তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে—আজ সন্ধ্যার পর পাত্র স্বয়ং ক'নে দেখিতে আসিবে।"

সোহাগকে ডাকিবার জন্য হেমের তলব হইল; কিন্তু কোথাও হেমের দেখা পাওয়া গেল না। তখন প্রহরী স্বরূপ বাড়ীতে যাহাকে রাখা হইয়াছিল তাহাকে পাঠান হইল। তাহার নাম শিউরতন মিছির। লোকটা পশ্চিম দেশীয়; গয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি গয়াধাম পবিত্র করিয়াছেন। তবে বহুকাল হইতে বাঙ্গ্‌লা মুলুকে বাস করায় বাঙ্গালীর মত চালচলন কতকটা হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তাতেও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি বেশী দেখা যাইত।

শিউরতন মিছির মহাশয়ের ভাষাজ্ঞান যাহাই হউক,

তিনি একজন পরাক্রমশালী বীরপুরুষ,—একথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। তাঁহার ওজন একমণ তের সের—দীর্ঘ ও প্রস্থে, তিনি গির্জ্জার চূড়ার মত—রূপে, কন্দর্প—বয়সে মান্ধাতা।

নির্ম্মলের পিতার আমল হইতেই মিছির মহাশয় নকরি করিতেছেন। প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া মিছিরের একটু খ্যাতি ছিল। সেই দর্পেই হউক অথবা স্বভাবগত দোষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, মিছির মহাশয় একটু ক্রোধী ছিলেন ; এবং কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে বলিলে তিনি হাতকড়া লাগাইয়া আনিতেন। তবে ক্ষমতায় না কুলাইলে তিনি বীরবেশে রণাঙ্গন হইতে অপসৃত হইতেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিছির মহাশয় চারিহস্ত পরিমিত এক সুদীর্ঘ লগুড় ঘাড়ে করিয়া সোহাগকে ডাকিতে চলিলেন। মাথায় প্রকাণ্ডকায় পাগড়ী, পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে থান। বস্ত্রখানি এমনভাবে কোমরের চারিধারে বেষ্টিত হইয়াছে যে, কাপড়ে আগুন লাগিলে মিছিরের পরিত্রাণের উপায় নাই—বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

মিছির মহাশয়ের আহারের লোভটা কিছু বেশী ছিল। পরের ঘাড়ের উপর দিয়া আহারের ব্যাপার চালাইবার জন্য তিনি অহর্নিশি চেষ্টিত থাকিতেন। আজ একটু সুযোগও হইল।

হালদারণীর বাড়ীতে পৌছিবার পূর্ব্বে মিছির মহাশয়ের সহিত এক গোপনন্দনের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। গোপনন্দনের ঘরখানি রাস্তার উপর। সে তখন আপন দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে মিছির মহাশয় পথের উপর দর্শন দিলেন। তখন ঘোষজা করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল, "মিছির ঠাকুর, অনেক দিন তোমায় দেখিনি; আমার গাছে আঁব পেকেছে—দু'টা খাবে কি?"

মিছির ঠাকুর গম্ভীর বদনে বলিলেন, "লে, আও।"

গোপনন্দন তখন মিছির ঠাকুরকে গৃহমধ্যে আনিয়া বসাইল। দুইটা আম্র উদরস্থ করিয়া মিছির ঠাকুর বলিলেন, "চূড়া হ্যায়?"

"বহুত হ্যায়" বলিয়া গোপনন্দন সেরটাক চূড়া লইয়া আসিল। চিঁড়ে আসিল দেখিয়া মিছির ঠাকুর "দহি" চাহিলেন। দধি না থাকায় দুধ আসিল। দুধ আসিল

দেখিয়া মিছির ঠাকুর আরও আম চাহিলেন। ঘরে যাহা কিছু আম ছিল বিপন্ন গোপনন্দন তাহা আনিয়া যোগাইল। ইচ্ছামত সকল দ্রব্য পাইয়া মিছির ঠাকুর তখন স্তিমিতনয়নে উদরের সেবায় ব্যাপৃত হইলেন।

এদিকে সোহাগের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া নির্ম্মল স্বয়ং অশ্বারোহণে তাহাকে ডাকিতে চলিলেন; এবং সত্বরই হালদারণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মিছির ঠাকুর গাছ হইতে দু'টা লঙ্কা তুলিতেছেন। নির্ম্মল বলিলেন, "একি করছ, মিছির?"

গাছের লঙ্কা গাছে রহিয়া গেল, যাহা তোলা হইয়াছিল তাহাও হাত হইতে পড়িয়া গেল। মিছির ঠাকুর তাড়াতাড়ি মনিবের সমীপস্থ হইলেন। বলিলেন, "হুজুর, এ ঘরমে কহি নাহি হ্যায়, আধা ঘণ্টা হিঁয়া হাম খাড়া হ্যায়।"

এটা কিন্তু মিছিরের মিথ্যা কথা। সেরভর চিপিটক গলাধঃ করতঃ মিছির মহাশয় সবেমাত্র আসিয়া লঙ্কাগাছে হাত দিয়াছেন। নির্ম্মলও কতকটা তাহা বুঝিলেন। কিন্তু তাঁহার মন তখন আর সে দিকে নাই। তিনি দেখিলেন, গৃহদ্বারের শিকল সহসা একটু নড়িয়া উঠিল। নির্ম্মল

ঘোড়া হইতে নামিলেন; এবং একটু আগু হইয়া রোয়াকের নীচে দাঁড়াইলেন। তখন গৃহ-মধ্যাগত মনুষ্যকণ্ঠ স্পষ্ট শ্রুত হইল। বিন্দু মাত্র সঙ্কোচ না করিয়া নির্ম্মল রোয়াকের উপর উঠিলেন এবং দ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কে আছ, দ্বার খোল।"

কেহ কোন উত্তর দিল না, দ্বারও খুলিল না। কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল।

নির্ম্মল আরও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শীঘ্র দ্বার খোল—নতুবা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।"

সব স্থির, নিস্তব্ধ—কেহ দ্বার খুলিল না। নির্ম্মল তখন দ্বারে পদাঘাত করিলেন; অর্গল ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, সোহাগ পালঙ্কোপরি শায়িতা; তাহার মুখ, কাপড়ে বাঁধা; হাত বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছিল,—হালদারণী, সোহাগের একখানা হাতের উপর বসিয়া হাতে কাপড় বাঁধিতেছিল। কিঙ্কর সম্ভবত দ্বারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া পাহারা দিতেছিল; কিন্তু যখন নির্ম্মল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন সে পালঙ্কের নিম্নে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ম্মল সকলই দেখিয়া লইলেন; দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। ক্রোধে, ঘৃণায় নির্ম্মলের মুখ বিকৃত হইল। নির্ম্মল হালদারণীকে কেশে ধরিয়া সজোরে ভূমিতে পাতিত করিলেন; এবং সোহাগের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া কিঙ্করকে ধরিলেন। কিঙ্কর তখন লাফাইয়া উঠিয়া নির্ম্মলের হাতে কামড়াইয়া দিল। নির্ম্মল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কিঙ্করকে যষ্টিরমত ভূমি হইতে উঠাইয়া দ্বার হইতে সজোরে উঠানের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কিঙ্কর ভগ্ন হস্ত লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার কোলে লুকাইল। পলায়ন কালে কিঙ্কর, মিছির মহাশয়ের লগুড়ের আস্বাদন কিছু পাইয়াছিল। মিছির মহাশয় সময় বুঝিয়া বীররসের অবতারণা করিয়াছিলেন; কেন না, শত্রু রিক্তহস্ত, দুর্ব্বল ও পলায়মান।

কিঙ্করকে তাড়াইয়া মিছির, গৃহ মধ্যে সদর্পে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল,—হালদারণী, নির্ম্মলের পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আমায় ক্ষমা করুন—আমার কোন অপরাধ নাই—কিঙ্করকে ডাকি নাই. সে আপনি আসিয়াছিল। আমায় পুলিসে দেবেন না, আমি বড় গরীব, আমার

কেহ নাই। আপনি আমার বাপ মা, আমায় রক্ষা করুন।”

নির্ম্মল দারুণ ঘৃণাভরে বলিলেন, “তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতেও আমার আর ইচ্ছা নাই। তোমাকে পুলিশে দেওয়া দূরে থাক্, তোমার সংস্রবে সোহাগ যে কখন আসিয়াছিল, এ কথাও কাহাকে জানিতে দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। যদি কখন এ কথা প্রচার হয় তা’ হলে তোমাকে এগ্রাম হ’তে তাড়াইব। বুঝেছ?”

হালদারণী। আমার উপর আপনার যথেষ্ট দয়া। আপনি যেমন বলিবেন আমি তেমনি করিব।

নির্ম্মল। তোমাকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই। কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাস্য যে, নিজে আকণ্ঠ পাপে ডুবিয়া পাপের পথ কত সুখের তা’ দেখিয়াছ; তবে একজন নিরপরাধী বালিকার সর্ব্বনাশ সাধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে কেন?

হাল। আপনি ত সকলি বুঝিতেছেন—পোড়া পেটের জ্বালায় সকলি করিতে হয়।

নি। আমার কাছে ভিক্ষা চাহিলে না কেন?

হাল। যেখানে ভিক্ষায় পাঁচ পয়সা মিলিবে সেখানে এরূপ কার্য্যে আমি পাঁচ টাকা পাইতে পারিব।

সোহাগ কাঁদিতে কাঁদিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "দাদা, বাড়ী চল।"

"চল, দিদি।"

উভয়ে সে পাপগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। নির্ম্মল, সোহাগের হাত ধরিয়া পদব্রজে চলিলেন। মিছির, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আসিবার সময় মিছির লঙ্কাগাছটি উপড়াইয়া আনিতে বিস্মৃত হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o*o—

সোহাগের উদ্ধার সহজে হইল বটে; কিন্তু ফল অনেক দূর গিয়া দাঁড়াইল। কিঙ্কর ছাড়িল না,—সর্পের মত কামড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। পিতার নিকট বেশ একটা ছোট গল্প সাজাইয়া বলিল। বলিল যে, লম্পট নির্ম্মল

হালদারণীর অনুপস্থিত কালে তাহার গৃহে সোহাগকে লইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিঙ্কর তাহা অবগত হইয়া সোহাগকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল; এবং অবশেষে দ্বারবান কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। দ্বারবান না থাকিলে নির্ম্মলের সাধ্য কি, কিঙ্করের কিছু করিয়া উঠিতে পারে?

সকল কথা শুনিয়া সেই রাত্রিতেই কেদারজেঠা হালদারণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিঙ্কর গোপনে যাহা শিখাইয়া দিল, হালদারণী,কেদারের কাছে তাহাই বলিল। জেঠা সে রাত্রিতে কাহাকেও কিছু বলিলেন না। একটা মতলব ঠিক করিয়া পরদিন প্রভাতে নির্ম্মলের খুড়া অমরীশ বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেশময় সকলেই জানে অমরীশ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মল কুমারের কতক বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করিয়া লইয়াছেন। এ জন্য উন্নতচেতা ব্যক্তিমাত্রেই অমরীশ বাবুকে ঘৃণা করিতেন। গ্রামের দুই চারি জন লোক ছাড়া সকলেই নির্ম্মলের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু সেই দুই চারি জন লোক অমরীশ বাবুর কথায় উঠিত বসিত। কেদার জেঠা সাহায্য প্রার্থনা করিলে অমরীশ বাবু তাহাদের ডাকাইয়া

পাঠাইলেন। তাহারা আসিল। এবং কি করিতে হইবে জানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কেদার জেঠাও বিদায় লইলেন। বিদায় কালে অমরীশ বাবু বলিয়া দিলেন, "দেখ কেদার দা, আমি এর ভিতরে আছি যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়; কেন না, তা'হলে নির্ম্মল কি মনে করিবে।"

পরদিন কেদারজেঠা, হালদারণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কাটোয়াতে নালিশ রুজু করিয়া আসিলেন। হালদারণী বাদী। অনধিকার প্রবেশ, মারপিঠ প্রভৃতি অপরাধে নির্ম্মল ও মিছির অভিযুক্ত। কিঙ্কর প্রভৃতি দশ পনরজন লোক, অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য বাদিনীর পক্ষে সাক্ষীরূপে দাঁড়াইল। আসামীদের নামে সমন বাহির হইল। ঘটনার পনর দিন পরে মকর্দ্দমার দিন ধার্য্য হইল।

কিন্তু সমন ধরান সহজ হইল না। মিছির, ফেরার; নির্ম্মল প্রবল জমীদার। কেদারজেঠা সহস্র চেষ্টা করিয়াও নির্ম্মলের উপর সমন জারি করাইতে পারিলেন না। যে পিয়াদা সমন লইয়া আসিয়াছিল, সে দুই দিন বসিয়া রহিল, তবু কিছু হইল না। তৃতীয় দিবস জেঠার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল

মকর্দ্দমার ধার্য্য দিনে আসামী হাজির না হওয়ায় ওয়ারেণ্ট বা গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল। নির্ম্মল ধরা দিলেন এবং পাঁচশত টাকা জামিনে খালাস পাইলেন।

আত্মরক্ষার্থ নির্ম্মল কোন চেষ্টা বা উদ্যোগ করিলেন না। ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া মায়ের প্রাণ অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা পরামর্শ করিবার জন্য নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নায়েব আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মকর্দ্দমার কি বুঝিতেছ?"

নায়েব বলিল, "দেখ্‌ছি এবার ঘোর বিপদ।"

অন্ন। কিসে বুঝ্‌লে।

নায়েব। শুন্‌ছি ছোট কর্ত্তাও যোগ দিয়াছেন।

অন্ন। ঠাকুরপো? বাছাকে জেলে দিবার জন্য ঠাকুরপো যোগ দিয়াছেন?

না। শুন্‌ছিত তাই।

অন্ন। শুনা কথায় আমি প্রত্যয় করি না। প্রমাণ পেয়েছ?

না। পেয়েছি। তাঁহার অনুগত কয়েকজন লোক, বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী আছে।

অন্ন। তবে বিপদ গুরুতর বটে।

না। শুধু তাই নয়, গিন্নি মা; তা'রা আবার গ্রামময় বাবুর নিন্দা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে।

অন্ন। তা'তে তাদের লাভালাভ কি ?

না। যিনি পৃষ্ঠপোষক তাঁহার লাভ আছে।

নায়েবকে বিদায় দিয়া অন্নপূর্ণা চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর একটা যুক্তি স্থির হইল। তখন তিনি পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র খানি রমেশের উদ্দেশে লিখিত। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

"বাবা রমেশ

পত্র পাইবামাত্র এখানে আসিবে। নির্ম্মল বড় বিপদে পড়িয়াছে। তুমি ভিন্ন আমাদের আর কেহ নাই—তাই তোমায় ডাকিলাম। ইতি

তোমার মা অন্নপূর্ণা।

পুনশ্চ—পারত বধুমাতাকে সঙ্গে আনিও।"

বিশ্বাসী ভৃত্যহস্তে বাহিত হইয়া পত্র যথাকালে রমেশের হস্তগত হইল। পত্র পাঠান্তে, রমেশ বড়ই চিন্তিত হইলেন। পত্রবাহককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে, মকর্দ্দমার বিবরণ আদ্যন্ত

জানিয়া লইয়া বলিলেন, "বুঝিতেছি হালদারণী দুশ্চরিত্রা ; কিন্তু সোহাগের চরিত্র কেমন ?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হুজুর, আমি গরীব মানুষ, কা'র কি রকম চরিত্র আমি কেমন করে জান্‌ব।"

রমেশ। গরীব হ'লে চরিত্র কেমন জানা যায় না ?

ভৃত্য। হুজুর, আমার বাপ আমায় লেখা পড়া শিখায়নি, কাজেই ও-সব গোলমেলে কথা আমার ঠাওর হয় না।

রমেশ। ভাল, তোমার বাবুর চরিত্র কেমন ?

ভৃত্য। বাবুকে আজ কাল কেমন কেমন দেখ্‌ছি।

রমেশ মনে মনে বলিলেন, "আমিও তাহাকে কেমন কেমন দেখ্‌ছি।" তার পর ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি আনন্দপুর দেখেছ ?"

ভৃত্য বলিল, "অনেক বার দেখেছি, হুজুর।"

রমেশ তখন তাহাকে আনন্দপুরের মানচিত্র অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলেন। পাঁচ বছরের ছেলেরা যেমন আঁক পাড়ে, ভৃত্য সেইরূপ আঁক পাড়িয়া আনন্দপুরের এক অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিল। রাস্তা গুলা লাঠির মত—গঙ্গানদী ঠিক একটা বড় পাশ বালিসের ন্যায়—গাছ পালা, এক

একটা ছাতার মত করিয়া আঁকিল। যাহা হউক, সোহা-গের বাড়ী হালদারণীর বাড়ী, কোথায়, কোনদিকে, রমেশ তাহা উত্তম করিয়া বুঝিয়া লইলেন।

তখন তিনি মাঝি মাল্লাকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিয়া বিলির অন্বেষণে অন্তঃপুর মধ্যে দেখা দিলেন। অন্তঃপুর-বাসিনী মহিলাগণ সচরাচর রমেশের সাক্ষাৎ পান না। এক্ষণে তিনি অন্দর মধ্যে পূর্ণিমার শশধর রূপে সমুদিত হইয়াছেন দেখিয়া পিপাসী চকোরীর দল মধ্যে মহা হুল-স্থুল পড়িয়া গেল। একে একে সকলে আসিয়া রমেশকে ঘিরিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রমেশ নীরবে তাহা-দের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কোন কমলিনী সত্যযুগে ফুটিয়া ছিলেন; এক্ষণে শীর্ণা, বিবর্ণা। তিনি সম্বন্ধে রমেশের মাসীর দেবরের পিসতুত ভাইয়ের বিধবা শ্যালিকা। তিনি রমেশের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আহা, বাবা, তোমার শরীরে আর কিছু নেই, শুকিয়ে সিকিখানা হয়ে গেছে; কি ব্যায়রামই হয়ে-ছিল। আমি ঠাকুর দেবতার কাছে কত মানত করেছি—কত মাথা খুঁড়েছি। বেঁচে থাক বাবা—আমার চুল যত তোমার তত পেরমাই হো'ক। (বক্ত্রীর মাথায় চুল ছিল

না, সম্প্রতি মুণ্ডন করিয়াছেন) তা'বাবা, তোমার কাছে বল্‌ব নাত কার কাছে বল্‌ব। আমার যায়ের বেটার একটি ছেলে হ'য়েছে। তা'কিছু খরচ করাত আমার উচিত। তুমি না দিলে আমি কোথায় পাব, বাবা!" ইত্যাদি।

আর একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার জামাই-এর ঘর খানি পড়ে গেছে, না ছাইলে বর্ষায় ছানা পানা সব মারা যাবে। তুমি বাবা না দিলে"—ইত্যাদি। এই রূপে রামী, শ্যামী, বামী সকলে আসিয়া রমেশের পীড়ার সময় কে কত ঠাকুরের নিকট মানত করিয়াছিল, তাহা জানাইল এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু যাচিঞা করিল। রমেশ, সকলকে সন্তোষ করিয়া উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। সেখানে বিলির সাক্ষাৎ মিলিল।

এখন সে প্রাবটের কুলপ্লাবিনী পূর্ণযৌবনা ক্ষিপ্তা তটিনী নাই; সে ঝঙ্কার, সে নৃত্য, সে সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। সকলই হিমানী সমাগমে কোথায় লুকাইয়াছে। সঙ্কুচিতা মরমপীড়িতা, দুঃখিনী তটিনীকে দেখিলে কার প্রাণ না কাটিয়া যায়? সে সোহাগভরা, আশাভরা হৃদয়খানি শুকাইয়া চক্ষুর অন্তরালে বালুকামধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সে কলকল নিনাদ, সে প্রেমোচ্ছ্বাস, সে যৌবনগর্ব্ব, কিছুই নাই ; কেবল স্মৃতি টুকু বুকে চাপিয়া, তটিনী আঁখিজলে ধরা সিক্ত করিয়া যাতনানিষ্পেষিত হৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে।

বিলির সব ফুরাইয়াছে ; সে হাসি নাই,সে রূপ নাই। তেজ, গর্ব্ব কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সব গিয়াছে তবু আজও মরিতে পারে নাই ; স্বামীকে না বলিয়া তাহার মরা হয় নাই। স্বামী তাহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়াছেন ; কেমন করিয়া সে নিদারুণ অপবাদ মাথায় করিয়া বিলি মরিবে ?

চম্পকলতিকা বিজলী উদ্যানমধ্যে বেদীর উপর শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছে ; ভাবিতেছে, "যখন ইচ্ছা করিব তখনইত মরিতে পারিব ; তবে এত তাড়াতাড়ি কেন ? তিনি আমার গুরু, প্রভু ; এ দেহ, এ প্রাণ তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এ দেহ-প্রাণ কেমন করিয়া বিসর্জ্জন করিব ? কেমন করিয়া কলঙ্কিনী অপবাদ লইয়া মরিব ? তিনি যে আজীবন আমার নামে ধিক্কার দিবেন, আমায় ঘৃণা করিবেন—সেত আমার প্রাণে সহিবে না। আবার যখন দার পরিগ্রহ করিয়া নবপরিণীতা

ভার্য্যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দিবেন তখন যে, স্বর্গেও আমার নরকবাস হইবে।"

এমন সময় রমেশ আসিয়া ডাকিলেন, "বিজু!"

বিজু উঠিয়া বসিল। তাহার শীর্ণ কাতর মুখ খানি দেখিয়া রমেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বিজুর পাশে আসিয়া বসিলেন; ধীরে ধীরে অলকগুচ্ছ কপোল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বিজু, দিদি আমার, কেন তুমি এত রোগা হইতেছ? ডাক্তার বৈদ্য তোমার রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অথচ তুমি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছ। বিজু, লক্ষ্মী আমার, আমার কাছে কোন কথা লুকাইও না। তুমি বই সংসারে আর যে আমার কেহ নাই।"

বিজু কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার শরীরে কোন অসুখ নাইত দাদা।"

রমেশ মুখ ফিরাইলেন—কিছু বলিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "বিজু, আমি বধূগ্রামে যাইতেছি।"

বিজু চমকাইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাদা?"

রমেশ বলিলেন, "তোমার শ্বাশুড়ী ডাকিয়াছেন।"

বিজু নীরব রহিল। রমেশ বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমার শ্বাশুড়ী আদেশ করিয়াছেন। যাইবে কি ?"

বিজু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ডাকিয়াছেন, দাদা ?"

রমেশ উত্তর করিলেন, "নির্ম্মল বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তাই মা আমায় ডাকিয়াছেন।"

বিজুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আবেগ ভরে বলিল, "দাদা, আমি যাব।"

রমেশ বলিলেন, "চল, দিদি, দুজনেই যাব।"

বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্নী সরিয়া আসিয়া ভাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল; রমেশের মুখপানে চাহিয়া বিলি কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিপদ, দাদা ?"

রমেশ বলিলেন, "সকলে কুশলে আছেন সে চিন্তা নাই। বিপদটা কি জান ? নির্ম্মল একটা মকর্দ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছেন।"

বিজু অমঙ্গল আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "অভিযোগটা কি ?"

রমেশ দুই কথায় সেটা বুঝাইয়া দিলেন। বুঝাইয়া অবশেষে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় সোহাগ এবং নির্ম্মল উভয়ই নিরপরাধী।"

বিজু ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বেদীর উপর বসিল। রমেশ ডাকিলেন, "বিজু, এস।"

বিজু বলিল, "আমি যাব না—তুমি একা যাও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রমেশ বধূগ্রামে আসিয়া আগে অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রমেশকে দেখিয়া অন্নপূর্ণার বল বাড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার বৌমা কই?"

রমেশ একটু গোলে পড়িলেন। সত্য কথা বলিলে বিজুর উপর শ্বাশুড়ী বিরক্ত হইতে পারেন। সুতরাং

তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র কহিলেন, "যদি আদেশ করেন তাহা হইলে এখনি তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, আমার ঘরের লক্ষ্মী আমায় ছাড়িয়া গিয়া অবধি আমার আর সুখ, শান্তি নাই। সে কথা ভাবিয়া এখন আমার কাঁদিবারও অবসর নাই। সকলের আগে আমার বংশের সুনাম, ছেলের মান রক্ষা কর।"

রমেশ। মা, নিশ্চিন্ত থাকুন। মকর্দ্দমা যদি মিথ্যা হয়—

অন্ন। যদি মিথ্যা হয়! তবে তুমি নির্ম্মলকে চেন না। শিশুর মনে পাপ থাকিতে পারে, কিন্তু নির্ম্মলের হৃদয় আজও পাপস্পর্শিত হয় নাই।

রমেশ। তবে ভয় কি মা? যেখানে পাপ নাই সেখানে দুঃখও নাই।

অন্ন। তবে বল দেখি বাবা, কি পাপে আমার সোণার সংসার এমন হ'ল? মহাদেবের মত পুত্র, ভগবতী তুল্য পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিতেছিলাম, কি পাপে, বাবা আমার এমন হ'ল? আমিত ভ্রমেও কখন কাহারও প্রাণে

ব্যথা দিই নাই, জ্ঞানতঃ কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই। তবে একে একে বিষয় সম্পত্তি, বংশের সুনাম, যশঃ, পুত্র, পুত্র-বধূ হারাইতে বসিয়াছি কেন? যে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বসিয়াছে তাহাকে কি স্তোক দিয়া বুঝাইবে, বাবা?

রমেশ সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জ্যোৎস্নার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, নির্ম্মল ও বিজলীর মধ্যে মনের অকৌশল ঘটিয়াছে। তাই নাকি নির্ম্মল কাহাকেও কিছু না বলিয়া মধ্য রাত্রিতে বিশালপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। তা' স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমন ঝগড়া অনেক হইয়া থাকে; সে জন্য এত ভাবনাই বা কেন? আর অন্নপূর্ণারই বা এত আক্ষেপ কেন? তবে কি তলায় আরও কিছু আছে? রমেশ স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া নির্ম্মলের অন্বেষণে চলিলেন।

নির্ম্মল তখন উদ্যান মধ্যে। উদ্যানের এখন আর সে শ্রী নাই,—যেখানে যা' কিছু সুন্দর ছিল, সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। যে বেদীর উপর ফুলরাশির মধ্যে শুইয়া নির্ম্মল ও বিলি কত মধুযামিনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আজ সে বেদী ভগ্ন—আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ। বেদীর সন্নিকটে নির্ম্মল ও বিলি স্বহস্তে যে সকল বসোরা, ব্ল্যাকপ্রিন্স, মন্টিক্রষ্ট,

ওয়াল্টারস্কট, সুইটব্রায়ার, পলনিরোঁ প্রভৃতি সুন্দর গোলাব নিচয় রোপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যত্নাভাবে তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শ্যামলতা, লবঙ্গলতার আর সে শোভা নাই—মালতী, মাধবীর আর সে মাধুর্য্য নাই। নাগ-দোনা, বৌপাগ্‌লা শুকাইয়া গিয়াছে। বেল, যুঁই, রোজিয়া—হিংস্রক সর্পের আশ্রয়-স্থল হইয়াছে। সে কুসুমিত লতিকা, সে কোকিল ঝঙ্কার, সে পত্রে পত্রে চাঁদের খেলা কিছুই এখন নাই। এক জনের অভাবে সকলই গিয়াছে, কেবল স্মৃতিটুকু আছে।

নির্ম্মল, ইদানীং ইচ্ছা পূর্ব্বক উদ্যানে আসিতেন না; অন্যমনস্কভাবে, যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে কখন কখন আসিতেন। বেদীর সন্নিকটস্থ হইলে একে একে সকল কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিত। তখন তিনি দ্রুতপদে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্ম্মল উদ্যান মধ্যে আসিয়াছিলেন। আসিয়া গাছ, পালা, আকাশ, পৃথিবী সকলই দেখিলেন; কিন্তু যাহা খুঁজিতে ছিলেন তাহা কোথাও পাইলেন না। অবশেষে অবসন্ন হৃদয়ে এক চম্পকবৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সুদূর

আকাশপ্রান্তে চাহিয়া রহিলেন। বিকৃতমস্তিষ্ক নির্ম্মল কুমার আকাশপটে দুই খানি চিত্র অঙ্কিত দেখিলেন। এক খানি নানাভরণভূষিতা, ব্রীড়াবনতা, মাধুর্য্যময়ী দেবী মূর্ত্তি; অপর খানি বসনভূষণশূন্যা, লজ্জাহীনা, বিভীষিকাময়ী পিশাচীর মূর্ত্তি। আকাশের যেখানটায় দেবী মূর্ত্তি উজ্জ্বল আলোকে প্রতিভাত ছিল, দেখিতে দেখিতে সেখানটা নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইল; দেবী মূর্ত্তি আঁধারে লুকাইল। তখন সে স্থানে পিশাচী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিলি, বিলি, তুই পিশাচী হ'লি! তুই কেন মরিলি না, আমি কেন মরিলাম না।" দেখিতে দেখিতে কুয়াসা কাটিয়া গেল—দেবী-মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মল আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলি, আমার হৃদয়ের আলো, আমার আনন্দ, আমার উৎসাহ, আমার শক্তি, আমার শান্তি, অত দূরে কেন—আমার হৃদয়ে এস।" অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে, দেবীমূর্ত্তি আকাশের গায় মিলাইয়া গেল;—নির্ম্মল হতাশ হৃদয়ে বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, "নির্ম্মল!" নির্ম্মল নিরুত্তর, তখনও তাঁহার সংজ্ঞা নাই। যে ডাকিয়াছিল,

সে সম্মুখে আসিয়া আবার ডাকিল, "নির্ম্মল!" ধীরে ধীরে নির্ম্মলের সংজ্ঞা আসিল; তিনি ধীরে ধীরে আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রমেশ;—অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি লইয়া, সুখ দুঃখের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া—রমেশ। নির্ম্মল সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মলের ভাব দেখিয়া রমেশ একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি নির্ম্মল, সাপ দেখেছ নাকি?"

নির্ম্মল তথাপি নিরুত্তর। রমেশ আবার বলিলেন, "আমায় চিনিতে পার, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল এবার উত্তর করিলেন, কিন্তু উত্তরটা কিছু কর্কশ। বলিলেন, "তুমি, তুমি এখানে রমেশ বাবু?"

রমেশ বলিলেন, "আসিতে কি নাই? তাড়াইয়া দিতে চাও নাকি?"

নির্ম্মল আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখন এলে? মার সঙ্গে দেখা করেছ?"

র। এসেছি একটু আগে—মার সঙ্গে দেখাও করেছি। কিন্তু তোমার এ ভাব কেন?

নি। কি ভাব দেখিতেছ? আমি রোগা হইয়াছি তাই বলিতেছ? মাও সে কথা বলিয়া থাকেন।

র। নির্ম্মল আমি বালক নই, আমার কাছে চাতুরি কেন?

নি। চাতুরি! চাতুরি কখন করি নাই। যাহা বলিতে ইচ্ছা করি না তাহা জিজ্ঞাসা করিও না।

র। কোন্ কথাটা বলিতে ইচ্ছা কর না তাহাত এ গরীব অবগত নয়। যদি না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকি তা'হলে ক্ষমা করিও। গললগ্ন কৃতবাসে ক্ষমা চাহিতে হইবে কি?

নি। রমেশ বাবু এটা ঠাট্টার কথা নয়। যে ভাবে কথাটা বলিলাম, সেই ভাবেই উহা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

র। দেখিতেছি জমিদারের কাছে আসিয়াছি; হুজুরের হুকুম হয়ত এখন স্বগ্রামে ফিরিয়া যাই।

নি। স্বচ্ছন্দে যাইতে পার—আমি তোমায় ডাকিতে যাই নাই।

র। তুমি ডাকিতে না যাও তোমার মা আমায় ডাকিয়াছেন।

নি। তিনি ভুল করিয়াছেন।

র। তিনি ভুল করুন বা না করুন, আমি এমন বন্য বর্ব্বরের বাড়ীতে আসিয়া ভুল করিয়াছি।

রোষে, ক্ষোভে রমেশ উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার রাগটা পড়িয়া গেল। ভাবিলেন, "আমি এ বিপদের সময় নির্ম্মলকে ত্যাগ করিয়া গেলে কে তাহাকে দেখিবে? আগে তাহাকে বিপন্মুক্ত করি, তারপর,—তারপর আবার কি? সে যে বিজুর স্বামী।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোহাগের বিবাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিল! নির্ম্মলের চেষ্টায় পাত্র অনেক জুটিল; কিন্তু সকল সম্বন্ধ একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামে যে একবার আসে, সে আর দ্বিতীয়বার আসে না। সোহাগের চরিত্র লইয়া গ্রামে ও আদালতে যে ঢাক বাজিয়াছে, তাহা শুনিয়া কে আপন পুত্র বা ভ্রাতার, সোহাগের সহিত বিবাহ দিবে? সুতরাং নির্ম্মল সহস্র চেষ্টাতেও সোহাগের বিবাহ ঘটাইতে পারিলেন না। সোহাগ অবিবাহিতা থাকিল।

শুধু অবিবাহিত থাকিলে তার মায়ের যন্ত্রণা তবু কতকটা সীমাবদ্ধ হইত। সোহাগের চরিত্র লইয়া গ্রামে এত তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল যে, সোহাগের যাতনা কূল ছাপাইয়া উঠিল। যে সকল ভামিনীরা পুষ্করিণী ঘাটে হালদারণীর সঙ্গে সোহাগকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি সংবাদপত্রের পদ গ্রহণ করিলেন। কে করে অন্ধকার নিশীথে সোহাগকে নির্ম্মলের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন—কে কবে ধাত্রীর আশ্রয় লইতে সোহাগকে দেখিয়াছিলেন ; তাহা একে একে জনসমাজে প্রচার করিয়া যশঃ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সময় মন্দ পড়িলে সকলেই চাপিয়া ধরে। যে হালদারণী সকল অনিষ্টের মূল, সে-ই আবার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিবলে, সোহাগ ত দূরের কথা, এমন কি সোহাগের মাতার চরিত্র সম্বন্ধে নানাকথা রাষ্ট্র করিতে লাগিল।

মোটের উপর গ্রামে তিষ্ঠান সোহাগের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। গ্রামের কেহ সোহাগদের বাড়ী মাড়ায় না। অধিকন্তু যদি কেহ পথে ঘাটে সোহাগকে দেখিতে পাইত,তাহা হইলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মর্ম্মঘাতী বাক্য-

বাণে সোহাগকে জর্জ্জরিত করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। ক্রমে ক্রমে সোহাগ. গঙ্গাঘাটে যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। খিড়কিতে একটা এজমালী পুষ্করিণী ছিল তাহাতেই স্নানাদি করিত।

পুষ্করিণীটি অতি ক্ষুদ্র, জলও জঘন্য। বাসন মাজা ভিন্ন অন্য কোন কাজ চলিত না। সোহাগদের খিড়কিদ্বার হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে এই পুষ্করিণী অবস্থিত। চতুর্দ্দিকের পাহাড়, আগাছায় সমাচ্ছাদিত; মাঝে মাঝে দু'চারিটা আম ও কাঁঠাল গাছ। পুকুরের পশ্চিমদিকে দুইটা ঘাট আছে; একটা সোহাগেরা ব্যবহার করিত, অপরটিতে কেদার জেঠার বাড়ীর দাসীরা বাসন মাজিত পুরুষ মানুষ আসা দূরে থাক অপর কোন স্ত্রীলোকও এ পুকুরে আসিত না।

পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ের ধার দিয়া একটা গ্রাম্য রাস্তা উত্তর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এখানে লোক চলাচল বড় একটা নাই। উত্তরে গঙ্গার ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ভিতর রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণী ও রাস্তা লইয়া আমাদের কিছু প্রয়োজন আছে, তাই এতটা বিস্তারিত বিবরণ দিলাম।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার দুই দিবস পরে একদিন অপরাহ্ণে সোহাগ কথিত পুষ্করিণীর ঘাটে গা ধুইতে চলিল। দুই ধারে অনুচ্চ জঙ্গল, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। ঘাট বাধান নয়, মাটী কাটিয়া ধাপ করা হইয়াছে মাত্র। ঘাটে একখানা মোটা কাঠ পড়িয়া আছে; তাহারই উপর বসিয়া সোহাগ কখন কখন বাসন মাজিত। এক্ষণে তাহারই উপর আসিয়া বসিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র নাই। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া সোহাগ আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

অনূঢ়া কন্যারা মাথায় কাপড় দেয় না—সোহাগের মাথায়ও কাপড় ছিল না। সোহাগ আর চুল বাঁধে না,—কখন জড়াইয়া রাখে, কখন বা আলুলায়িত থাকে। এক্ষণে সেই নিবিড় কেশরাশি গণ্ড পৃষ্ঠ সমাচ্ছাদিত করিয়া আলুলায়িত ছিল। অঙ্গের কোন স্থানে অলঙ্কার নাই, কেবল প্রকোষ্ঠে চারিগাছা কাচের চুড়ি। সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে সেই নিরাভরণা স্বভাবসুন্দরী সংসারের নিষ্ঠুর কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছিল। সোহাগ ভাবিতেছিল যে, সংসারে আসিয়া সে কেবল মায়ের যন্ত্রণার কারণ হইল—পিতৃবংশের

মানসম্ভ্রম লোপ করিতে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে সোহা-গের চো'খে জল আসিল। ক্রমে দেহ অবসন্ন হইল. মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল,—অবশেষে সোহাগের দেহ লুটাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন সময় পূর্ব্বদিকস্থ পাড়ের জঙ্গল ভাঙ্গিয়া এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল। যে আসিল, সে রমেশ।

আজ তিন দিন হইল রমেশ বধূগ্রামে আসিয়াছেন। আসিয়া অবধি তিনি নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নায়েবকে লইয়া মকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র দেখা. সাক্ষীর তদ্বির করা. কেদার জেঠা ও অমরীশ বাবুর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটান প্রভৃতি কার্য্যে রমেশ এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই তিন দিনের মধ্যে মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার অবসর ছিল না। হালদারণীকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার উদ্দেশে আজ বৈকালে আনন্দপুরে আসিয়াছেন। ঘাটে নৌকা রাখিয়া পদব্রজে হালদারণীর বাড়ী যাইতে ছিলেন। যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে দেখিলেন, যৌবনোন্মুখী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘাটের উপর বসিয়া রহিয়াছে। রমেশ মুগ্ধ হইলেন;—একটু দাঁড়াইয়া সে অলোকসামান্য রূপ রাশি দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি সবিস্ময়ে

দেখিলেন যে, বালিকা ঝটিকাচ্ছিন্ন পদ্মের ন্যায় মাটীর উপর পড়িয়া গেল। রমেশ বুঝিলেন, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়াছে ; তখন তিনি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিলেন।

চোখে মুখে জল সেচন করিতে করিতে বালিকার চৈতন্যোদয় হইল। নয়নোন্মীলন করিয়া সোহাগ সম্মুখে দেখিল, এক অপরিচিত যুবক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। সোহাগ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, মাথা টলিয়া আবার পড়িয়া গেল।

রমেশ বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না ; আগে সুস্থ হউন— তার পর উঠিবেন।"

সোহাগ লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। রমেশ পুনারায় বলিলেন, "আমার বোধ হয় আপনার মূর্চ্ছা রোগ আছে ; এরূপ অবস্থায় ঘাটে একাকী আসা উচিত হয় নাই।"

উত্তর দেওয়া দূরে থাক্ সোহাগ লজ্জায় আরও জড়সড় হইল। তখন রমেশ উত্তরীয় জলসিক্ত করিয়া সোহাগকে বীজন করিতে লাগিলেন। সোহাগ মরমে মরিয়া গেল।

সোহাগের মনোভাব রমেশ কতকটা উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়া-

ইলেন; এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।
সোহাগ ভাবিল, বুঝিবা সে তাঁহাকে কোন প্রকারে অপমানিত বা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাই তিনি চলিয়া যাইতেছেন। সোহাগ মুহূর্ত্তের জন্য একবার রমেশের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। তাহার সে দৃষ্টিতে কি কমনীয়তা, কি কৃতজ্ঞতা! রমেশ মুগ্ধ হইলেন।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গৃহ সম্ভবতঃ সন্নিকটে, আপনি একা যাইতে পারিবেন কি?"

সোহাগ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল—অতি মৃদুস্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "পারিব।"

রমেশ সেই ছোট "পারিব" কথাটি বুকে ধরিয়া আর সেই চাহনি টুকু নয়নে মাখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সোহাগকে পরিত্যাগ করিয়া রমেশ হালদারণীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে রমেশ কিরূপ অবস্থায় নির্ম্মলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, সে কথা একটু বলি।

উদ্যান মধ্যে রমেশের সহিত কলহ করিয়া নির্ম্মল বাটীর মধ্যে মায়ের কাছে আসিলেন। ডাকিলেন, "মা!"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "কি, বাবা?"

নি। বিশালপুর হইতে কেহ আসিয়াছেন?

অন্ন। রমেশ আসিয়াছেন।

নি। আর কেহ নয়?

অন্ন। বউমার কথা বলিতেছ? রমেশ তাঁহাকে আনেন নাই।

নি। আনেন নাই ভালই করিয়াছেন; রমেশ বাবু না আসিলে আরও সুখী হইতাম।

অন্ন। স্থির হও—অকারণ ঔদ্ধত্য দেখাইও না।

নি। রমেশ বাবু এখানে আসিলেন কেন?

অন্ন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়াছি।

নি। কেন ডাকিয়াছ?

অন্ন। সে কৈফিয়ত তোমায় দিতে প্রস্তুত নই।

নি। মা, আমার অপরাধ লইও না—ক্ষমা কর। আমার মনের ঠিক্‌ নাই, তাই কি বলিতে তোমাকে কি বলিতেছি।

অন্ন। বাবা, মায়ের কাছে পুত্রের আবার অপরাধ কি?

নি। মা, দোষ লইও না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?

অন্ন। স্বচ্ছন্দে কর।

নি। রমেশবাবুর এখানে অবস্থান কি আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা?

অন্ন। কেন নয়?

নি। তিনি বিশ্বাসঘাতিনীর সহোদর ভাই।

অন্ন। চুপ কর;—বউমা আমার গৃহলক্ষ্মী, রমেশ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নির্ম্মল, মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে তা' ভাবিতে পারি না মা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আজও তুমি বালক; তোমার

বুদ্ধি ও চিত্ত, চঞ্চল। যখন আমার বয়স পাইবে তখন আমারই মত সিদ্ধান্ত করিতে শিখিবে। যতদিন না পার, ততদিন মায়ের পরামর্শমত চলাই পুত্রের কর্ত্তব্য।”

নি। আমি ত কখন তোমার অবাধ্য হইনি, মা। অবাধ্য হবার পূর্ব্বে যেন আমার বাক্যরোধ হয়। কিন্তু মা, তুমি যেমন আমায় ভাব্‌তে বলেছ, তেমন যে আমি কোন মতেই ভাব্‌তে পারছি না। আমি যে সে ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি, মা।

অন্ন। বিশালপুরে যাবার আগে যখন তুমি কিছু দেখনি, শুননি তখনও তুমি বউমাকে গ্রহণ করিবে কিনা ইতস্ততঃ করে’ছিলে। কেন করে’ছিলে বলিতে পার কি? যে অভিমানে অন্ধ, তা’র বিবেচনার মূল্য নাই। আমি তোমার মত অন্ধ নই; সুতরাং যা’ অসম্ভব, তা’ বিশ্বাস করিতে পারি না।

নি। আমিও যে মা, তোমার মত ভাবিতে চেষ্টা করি। চিন্তা করিতে করিতে কখন আকাশপটে উজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু তখনই আবার দেবী-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় এবং সেইস্থানে বিকটাকার পিশাচীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

অন্ন। যে নিজে পিশাচ, সে-ই দেবী-মূর্ত্তিতে পিশাচীর কল্পনা করে।

নি। পিশাচ হইতে আর বাকি কি আছে, মা? গৃহে অতিথি আসিলে যখন তাহাকে তাড়াইতে শিখিয়াছি তখনত পিশাচ সেজেছি, মা।

অন্ন। কাহাকে তাড়াইয়াছ, নির্ম্মলকুমার?

নি। রমেশকে।

অন্ন। রমেশকে? তোমার বিপদে সাহায্য করিতে যাকে আমি আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, তা'কে? যার দেব-চরিত্র তোমার অনুকরণীয়, তা'কে তাড়াইয়াছ? নির্ম্মল, আমার প্রাণে ব্যথা দিতে তুমি এত ভালবাস?

নি। মা, ক্ষমা কর; আমি এখনি তাঁকে ডাকিয়া আনিতেছি।

নির্ম্মল, রমেশের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন বটে; কিন্তু বাক্যালাপ করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না। রমেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সুযোগ দিলেন না। তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে রমেশ, আনন্দপুরে যাইবেন বলিয়া নৌকায় উঠিতে ছিলেন, এমন সময় নির্ম্মল আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। একটু নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন,

"রমেশ বাবু, তোমাকে অপমান করায় মা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার উপর রাগ করিও না।"

রমেশ। মাকে বলিও যে, তোমার উপর আমার কোন রাগ নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে তোমার জেলে যাইবার পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিতাম।

নি। রমেশ বাবু, তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।

র। কি, বল।

নি। এ মকর্দ্দমায় তুমি নির্লিপ্ত থাকিবে।

র। কেন বলিতে পার?

নি। তোমার সাহায্যে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা নাই।

র। তোমার উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। যে আমার গৃহ হইতে গভীর রাত্রিতে তস্করের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে—যাহার গৃহে আহূত হইয়া কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছি,—তাহার গৃহে তাহার কাছে ভদ্রতা, বিনয়, সৌজন্য প্রত্যাশা করা বাতুলতা।

নি। প্রত্যাশা করিতে তোমায় অনুরোধ করিতেছি না; তোমার ইচ্ছামত আমার নিন্দা করিতে পার, তাহাতে

আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এটা তুমি স্মরণ রাখিও যে, তোমার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত নয়।

র। যখন উপকার করিয়া তোমার নিকট পুরস্কার যাচিঞা করিতে আসিব তখন তোমার ইচ্ছামত তর্জ্জন গর্জ্জন করিও।

বলিয়া রমেশ নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আনন্দপুরের ঘাট হইতে বরাবর সড়ক গিয়াছে। রমেশ সদর রাস্তা ছাড়িয়া বামের সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেদার জেঠা রমেশকে চিনিত; বোধ হয় রমেশ সেই জন্য জেঠার গৃহসম্মুখস্থ সড়ক না ধরিয়া অন্য পথে গিয়াছিলেন। পথে যাইতে যাইতে রমেশের সহিত সোহাগের কিরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল,

তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আখ্যায়িকার পরিত্যক্ত সূত্র গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি নাই।

সোহাগকে ছাড়িয়া রমেশ ধীরে ধীরে হালদারণীর গৃহাভিমুখে চলিলেন।

আমরা তাহার গৃহ একবার দেখিয়াছি। দ্বিতীয় বার দেখিবার বাসনা না থাকিলেও রমেশের সঙ্গে আমাদের তথায় যাইতে হইবে। হালদারণী, শয়ন কক্ষের ভিত্তি-গাত্রে দুই খানি নূতন পট ঝুলাইতেছিল এক খানি জগন্নাথ দেবের, অপর খানি চতুর্ভুজা কালী মূর্ত্তির। দুই-খানি পট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া হালদারণী পটাঙ্কিত ঠাকুরদের প্রণাম করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সড়ক হইতে রমেশ ডাকিলেন, “এ বাড়ীতে কেহ আছে গা?”

হালদারণীর আর প্রণাম করা হইল না। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একজন অপরিচিত যুবক। হালদারণী জিজ্ঞাসা করিল, “কে, গা?”

রমেশ। হ্যাঁ গা, হালদারণীর বাড়ী কোন্ দিকে আমায় দেখাইয়া দিতে পার?

হাল। এইটিই তা’র বাড়ী; আমারই নাম হালদার ঠাকরুণ।

র। আঃ বাঁচলুম, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়েছি।

হাল। কেন আমাকে খুঁজ্‌ছ, গা?

র। এখানে দাঁড়িয়ে ত কথা হ'তে পারে না?

হাল। তবে আমার ঘরে উঠে এস।

রমেশ গৃহমধ্যে উঠিয়া আসিলেন। চারি দিকে চাহিয়া রমেশ বলিলেন, "তোমার ঘরটি বেশ।"

উত্তর স্বরূপ হালদারণী একটু গরবের হাসি হাসিল। রমেশ বলিলেন, "তোমার নাম অনেক দুর হ'তে শুনেছি। তোমার এই ঘরে কে একটা ছোঁড়া কি একটা কাণ্ড বাধাইয়াছিল না?"

হালদারণী আবার একটু হাসিল, সম্ভবত কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?"

রমেশ বলিলেন, "আমি থাকি কলিকাতায়; এক্ষণে আসিয়াছি রামপুরে।"

হা। রামপুরে কেন আসিয়াছেন?

র। সেখানে আমার কুটুম্ব বাড়ী।

হা। কুটুম কে?

র। তুমি কাহাকে চনিবে?

হা। সেখানে অনেকেই আমার পরিচিত।

র। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ আমার কুটুম্ব।

হা। শুনিয়াছি কার্ত্তিক বাবুর ভগ্নীপতির বাড়ী কলিকাতায়; আপনি কি সেই?

রমেশ একটু হাসিলেন মাত্র। হালদারণী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের মত ব্যক্তির আমার বাটীতে পদার্পণ হইয়াছে কেন?"

র। ফুলের প্রয়োজন হইলে লোকে মালীর আশ্রয় গ্রহণ করে।

হা। সকল মালী দেবসেবার উপযোগী ফুল যোগাইতে পারে না।

র। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি তাহার মত মালী কোথায় পাইব?

হা। আপনার মত বড়লোকের পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে। কি আদেশ আজ্ঞা করুন।

তা'র পর কি কথা হইল গ্রন্থকার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও শুনিতে পাইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কথোপ-কথন চলিল। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া রমেশ পাঁচটি টাকা হালদারণীর হাতে দিলেন। "নেব না, নেব না"

বলিতে বলিতে হালদারণী তাহা কোমরে বাঁধিল। রমেশ উঠিলেন। বিদায় কালে বলিলেন, "তা' হলে কাল্‌ ঠাকুর ঘাটে আসিব?"

হাল। আসিবেন বই কি।

র। রাত্রি দেড় প্রহরের সময়?

হাল। না, আর একটু আগে আসিবেন।

র। কেন?

হাল। আমায় কাটোয়া যাইতে হইবে।

র। কখন যাইবে?

হাল। সম্ভবত রাত দুপুরে নৌকায় উঠ্‌বো।

র। কেন যাইবে?

হাল। মকর্দ্দমা আছে।

র। রাত্রি এক প্রহরের সময় আসিলে তোমার অসুবিধা হইবে না?

হাল। তাই আসিবেন।

র। আসিলে নিরাশ হইতে হইবে না?

উত্তর স্বরূপ হালদারণী একটু হাসিল মাত্র। রমেশ সে হাসির অর্থ বুঝিলেন; বুঝিয়া প্রসন্ন-মনে চলিয়া গেলেন।

পর দিন রমেশ যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ বজরায় আসিয়াছেন। কেন না, আনন্দপুর হইতে বরাবর কাটোয়া যাইতে হইবে। পরদিন নির্ম্মলকুমারের বিচার। বজরা তত দ্রুত চলে না। তাতে আবার রমেশের বজরা খানি খুব বড়। মধ্য রাত্রিতে যাত্রা না করিলে সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে কাটোয়া পৌঁছান সম্ভব নয়।

ঘাটে আসিয়া রমেশকে বড় একটা অপেক্ষা করিতে হইল না। হালদারণী সত্বর আসিয়া দেখা দিল। তবে হালদারণী একা নয়, তার সঙ্গে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী ছিল। রমেশের আদেশে মাঝীরা স্ত্রীলোক দুইটীকে বজরায় উঠাইয়া আনিল। তাহারা সমীপস্থ হইলে, অবগুণ্ঠনবতীকে লক্ষ্য করিয়া রমেশ বলিলেন, "তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা তোমার মত ঘৃণিত জীবন অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা আমার দয়ার পাত্রী। তুমি অনর্থক কষ্ট পাইলে,এই বিবেচনায় তোমাকে কিছু দিতেছি।"

এই বলিয়া রমেশ তাহাকে কয়েকটি টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। সে চলিয়া গেল। হালদারণী বিস্মিত ও ভীত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমিও যাই?"

রমেশ রুদ্রস্বরে বলিলেন, "তুমি যাবে কোথা? তুমি আমার বন্দী।"

হালদারণী স্তম্ভিত হইল। সে এতদিন কত ভদ্র লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এমনটাত কখন ঘটে নাই। সে বিস্মিত নয়নে রমেশের পানে চাহিয়া রহিল। রমেশ বলিলেন, "আমি কে তা' জান? আমি বিশালপুরের রমেশ রায়। তোমার সঙ্গে কিছু বুঝা পড়া আছে; তাই তোমায় এখানে আনিয়াছি।"

হালদারণী এবার বসিয়া পড়িল। রমেশ রায়ের নাম এ অঞ্চলে কে না শুনিয়াছে? সে যে গরীবের মা বাপ—দুষ্টের যম।

হালদারণী সভয়ে দেখিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল। হালদারণী তখন মনে মনে দুর্গা, কালী, রাধাবল্লভকে ডাকিতে লাগিল; চীৎকার করিতে সাহস হইল না; কেন না, পিছনে চারিজন দ্বারবান, সম্মুখে কালান্তক যমসদৃশ রমেশ।

স্ফীত উদরে, হুঙ্কার শব্দে বজরা দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল—স্বামী-বর্জ্জিতা রমণীর ন্যায় দুঃখশ্বাসে ফুলিয়া উঠিয়া, চোখের জল দুইদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে বজরা ছুটিল।

গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিল। আষাঢ় মাস; আকাশে মেঘ, নদীতে তুফান। তবে মেঘ তত গাঢ় নয়, তুফান তত ভয়াবহ নয়। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ ক্রমে আকাশে উঠিল। এখন চাঁদের সে রূপ নাই; অনুতাপক্লিষ্টা বৃদ্ধা কুলটার ন্যায় মনের দুঃখে শুকাইয়া শীর্ণ, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই শীর্ণ মুখে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া চাঁদ, পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিল। পৃথিবীও একটু হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি ম্লান সঙ্কোচ পূর্ণ। পৃথিবীর সে হাসি দেখিয়া চাঁদের প্রাণে ব্যথা লাগিল। অকলঙ্কিত কৌমারে যখন সে পৃথিবী হাসাইত, নাচাইত, তখনকার কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। স্মৃতির জ্বালায় অধীর হইয়া মেঘান্তরালে মুখ লুকাইল; অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ ছাদে বসিয়াছিলেন; বৃষ্টি আসিল দেখিয়া তিনি কামরার ভিতর উঠিয়া গেলেন। সেখানে হালদার-ণীকে ডাকিয়া আনিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "এখন বুঝিতে পারিতেছ, নির্ম্মল বাবু আমার কে? তাঁহাকে তোমাদের জাল হইতে উদ্ধার করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যদি তোমার মত দু'শটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিতে হয় তাহাতেও

আমি পিছাইব না। এখন ঘটনার কথা যথাযথ খুলিয়া বল।"

হালদারণী নিরুত্তর। রমেশ বলিলেন, "অনর্থক কথা ব্যয় করা আমার অভ্যাস নাই। সকল কথা খুলিয়া বলিতে যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে তাহাও বল, দরওয়ান ডাকিয়া তোমাকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করি।"

প্রাণের ভয়ে হালদারণী কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে একে একে আদ্যন্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রমেশ বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "তবে কি নির্ম্মল কুমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, সোহাগ নিষ্কলঙ্কা ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রমেশ বলিলেন, "সত্য বলিতেছ ? কিছু গোপন কর নাই ?"

হাল। মা কালীর দিব্য—আমি মিথ্যা বলি নাই, বা কিছু গোপন করি নাই।

র। নির্ম্মল ও সোহাগের মধ্যে কোন গুপ্ত প্রণয় আছে কি ?

হাল। ভাই বোনের মধ্যে যেমন থাকে তেমনি আছে।

র। আর কিছু নাই ?

হাল। আমি মানুষের চরিত্র কিছু বুঝি; চরিত্র বুঝাই আমাদের পেশা। আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে, সোহাগের মত মেয়ে সংসারে খুব কম আছে।

র। আর নির্ম্মল বাবু?

হাল। তিনি দেবতা।

র। দেবতাকেত জেলে দিবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ।

হাল। সেটা আমার অদৃষ্ট।

র। তুমি নিজে যা' কর্‌ছ, তা'র জন্য অদৃষ্টের দোহাই দিতেছ কেন?

হাল। আমি নিজে কিছু করি নাই? আমাকে লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া অপরে করাইতেছে।

র। কে করাইতেছে?

হাল। কেদারবাবু—আর—আর একজন ভদ্রলোক।

র। সে কে?

হাল। অমরীশ বাবু।

র। কিসের লোভ তোমায় দেখাইয়াছেন?

হাল। একশত টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

র। টাকা দিয়াছেন ?

হাল। পঁচিশ টাকা মাত্র দিয়াছেন। বাকি টাকা পরে দিবেন বলিয়াছেন।

র। ভাল, আমি তোমায় পাঁচশত টাকা দিব। আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুন।

হালদারণীর বুকের ভিতর প্রাণটা যেন লাফাইয়া উঠিল। কোথায় গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন, আর কোথায় পাঁচ-শত টাকা! মনোভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রমেশ তখন হালদারণীকে কতকগুলা উপদেশ দিলেন। উপদেশ মত কার্য্য করিতে হালদারণী সম্মতা হইল। রমেশ বলিলেন, "আমি এখন তোমায় দুইশত টাকা দিতেছি; কার্য্যশেষে বাকি টাকা দিব। কিন্তু সাবধান. আমার সহিত প্রতারণা করিও না,শঠতা করিলে কেহ তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।"

হালদারণী বলিল, "আপনার নাম অনেক দিন হইতে আমার শুনা আছে; আপনার মত লোকের সহিত শঠতা করিবার আমার সাহস নাই, ইচ্ছাও নাই। আপনি বিরূপ হইলে অমরীশ বাবু বা কেদার জেঠা, কাহারও

সাধ্য নাই যে, আমায় রক্ষা করেন। আপনার নিকট অগ্রিম টাকা লইব না,—কার্য্যোদ্ধার হইলে অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গ্রহণ করিব।"

এমন সময় রমেশ কামরার গবাক্ষ হইতে সবিস্ময়ে দেখিলেন, একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বজরা তাঁহার বজরাকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে—আকাশও অনেকটা মেঘমুক্ত। চাঁদের আলো গঙ্গাবক্ষ ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে। তদালোকে বজরা দেখিতে পাইয়া, রমেশ জনৈক দ্বারবানকে আদেশ করিলেন "হাঁক, কার বজরা।"

দ্বারবান হাঁকিল। প্রত্যুত্তরে অগ্রগামী বজরার লোকে জানাইল,—"বধ্‌গ্রামের জমিদার বাবুর বজরা।"

রমেশ মাঝিদের আদেশ করিলেন, "ঐ বজরা ধর।" মাঝিরা একে একে নিঃশব্দে আসিয়া আপন আপন স্থানে বসিল। তাহাদের উত্তেজিত করিবার মানসে রমেশ বাহিরে আসিয়া নিজে হাল ধরিলেন। নৌকা তীরবেগে ছুটিল। অগ্রগামী বজরার নিকটবর্ত্তী হইয়াও রমেশ তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। এইরূপ ক্ষণকাল দৌড়াদৌড়ির পর, রমেশ সহসা একটা শব্দ শুনিতে

পাইলেন। জলের উপর গুরুভার পতন শব্দ বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। রমেশ সতর্ক নয়নে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সহসা একটা ভাসমান পদার্থ তাঁহার চক্ষুঃগোচর হইল। মনুষ্যাবয়ব বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—গঙ্গাবক্ষে লম্ফপ্রদান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমেশ যখন গঙ্গাবক্ষে পড়িলেন, তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। সেই দুই প্রহর রাত্রিকালে বিলি বিশালপুর ভবনে শয্যায় শুইয়া ছটফট্ করিতেছিল।

কক্ষে আর কেহ নাই, বিলি একা। দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। দ্বার বন্ধ, কিন্তু অর্গল-বদ্ধ নয়। রেবতী, বাহির হইতে দ্বার ভেজাইয়া চলিয়া গিয়াছে; বিলি উঠিয়া আর দ্বার অর্গলবদ্ধ করে নাই; সম্ভবত বিস্মৃত

হইয়াছিল, অথবা নিষ্প্রয়োজন বোধে করে নাই। এরূপ প্রায়ই ঘটে, আজও তাহা ঘটিয়াছিল।

একটা কথা বলিয়া রাখি,—হারাণ আবার বিশালপুরে আসিয়াছে—জ্যোৎস্না তাহাকে আনাইয়াছেন। জ্যোৎস্না চান—উইল; হারাণ চায়—বিলি। উভয়ের ভাগ্যে কিছুই মিলিল না। বিলির দর্শনাভিলাষে হারাণ, শিকার-লুব্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু কোথাও বিলির সাক্ষাৎ পাইত না। বিলি আর শয়নকক্ষ ত্যাগ করে না, সুতরাং হারাণ দেখাও পায় না। দেখা না পাইয়া হারাণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রি—সকলেই সুপ্ত; কেবল বিলির নিদ্রা নাই। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসিতেছিল; আবার তখনই তাহা ভয়াবহ স্বপ্নদৃষ্টে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। বিলি একবার স্বপ্নে দেখিল, যেন সে নির্ম্মলের সঙ্গে, পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, আকাশের উপর ফুলহার গলায় পরিয়া ফুলময় আকাশের মধ্যে প্রফুল্ল মনে ভ্রমণ করিতেছিল। এমন সময় নির্ম্মল বলিলেন,"বিলি তোমায় নীচে ফেলিয়া দিই।" বিলি নিম্নে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষেপী সীমাহীন বারিধি। বলিল, "ফেলিয়া দাও ক্ষতি

নাই, কিন্তু তোমার কাছ-ছাড়া আমায় করিও না।”
নির্ম্মল বলিলেন, “এস, তবে দুই জনেই ঝাঁপাইয়া পড়ি।”
দুই জনেই পড়িলেন।

বিলির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, পদতলে কে একজন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিলির ভ্রম হইল,—তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই।

বিলি বলিল, “তুমি কে, তুমি কি আমার স্বামী? কেন এত দূর হইতে পড়িলে? আমার যে অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।”

যে দাঁড়াইয়াছিল, সে হারাণ। হারাণ বলিল, “আমি তোমার স্বামী নই। যে নির্ম্মল তোমার মত রমণীরত্নকে পদতলে দলিত করে—তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীতে আসক্ত হইতে পারে, সে নির্ম্মল হইবার আমার সাধ নাই।”

বিলি পালঙ্কোপরি উঠিয়া বসিল, চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল; কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল, তদালোকে হারাণকে স্পষ্ট চিনিল। চিনিবামাত্র ঘৃণায়, রাগে তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, “তুমি—তুমি এখানে কেন?”

হারাণ বলিল, "দেবী দর্শনে আসিয়াছি।"

বিলি। এখান হইতে দূর হও।

হা। দূর হইতে আসি নাই, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

বিলি। অপমানের ভয় নাই কি?

হা। অপমানের ভয়? কা'কে অপমানের ভয় দেখাইতেছ? যদি মরিতে হয় তবু এস্থান হইতে নড়িব না। তোমাকে একটিবার দেখিবার আশায় এই কয়দিন উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছি; মানাপমান, হিতাহিত জ্ঞান, আমার লোপ পাইয়াছে। তুমি আমায় বৃথা ভয় দেখাইতেছ।

বিলি পালঙ্ক ছাড়িয়া হর্ম্যতলে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গল-বদ্ধ। চীৎকার করিলে সাহায্য পাইবার আশা খুব কম। যদি কোন মতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক স্পর্শিত হইবার পূর্ব্বে নয়। বিলি সরিয়া আলমারির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আলমারিতে গোলাব জল, সোডাওয়াটার প্রভৃতির কয়েকটা বোতল ছিল। তাহারই একটা হাতে লইয়া বলিল, "এক পা অগ্রসর হইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।"

হারাণ বলিল, "পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমি এক্ষণে জ্ঞানহীন উন্মাদ। মৃত্যু ত তুচ্ছ, যদি অনন্তকাল তোমার ঘৃণা সহিয়াও থাকিতে হয়,সেও ভাল—তবু পিছাইব না।"

হারাণ এক পা অগ্রসর হইল। বিলি চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান, আত্মরক্ষার্থে আমি সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত।"

হারাণ বলিল, "মার—না হয় তোমারই হাতে মরিব —কিন্তু পিছাইব না। আজ আমার সাধ মিটাইব।"

হারাণ আবার একটু অগ্রসর হইল। বিলি, বসন একটু সংযত করিয়া পরিয়া বোতলের মুখ দৃঢ়হস্তে ধরিল। বলিল, "আমার উপায়ান্তর নাই; ভগবান, আমায় ক্ষমা কর।"

হারাণ আবার অগ্রসর হইল। যখন অতি সন্নিকটে আসিয়া বিলির হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল, তখন বিলি সেই করধৃত-বোতল সজোরে হারাণের ললাটে মারিল। বোতল চূর্ণ হইয়া গেল,—হারাণ কাঁপিতে কাঁপিতে ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

বিলি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। মাকে উঠাইয়া সকল কথা বলিল। মা ভীত হইয়া দেওয়ানকে ডাকাই-

লেন। দেওয়ান আসিল—জ্যোৎস্না আসিল—রেবতী আসিল—বাড়ীর সকলেই একে একে আসিল।

হারাণ যেখানে পড়িয়াছিল সেই খানেই রহিল; তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল না। দেওয়ানের যত্নে সে সত্বর সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু ললাটের স্থানে স্থানে তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। তাহার সেই রুধিরাপ্লুত দেহ দেখিয়া জ্যোৎস্নার ক্রোধোদয় হইল। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় তার স্বরে বলিলেন, "এমন কলঙ্কিনীও এ বাড়ীতে ঢুকেছিল।"

কথাটা সকলেই শুনিল। কিন্তু বিলি শুনে নাই। সে তখন মায়ের ঘরে বসিয়াছিল। কথাটা সে শুনে নাই বটে, কিন্তু জনৈকা শুভানুধ্যায়িনী দাসী কথাটা তাহাকে শুনাইয়া গেল। জ্যোৎস্নার তীব্রোক্তি বিলির মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ঘৃণায় লজ্জায় অভিভূত হইয়া সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিল; এবং দেওয়ানকে ডাকাইয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল।

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথায় যাবে?"

বিলি। বধূগ্রামে যাব।

দেও। তুমি চলিয়া গেলে মনিবের কাছে কি জবাব দিব?

বিলি। দাদা আসিলে বলিবেন, এত দিনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ; আমি এক্ষণে বধূগ্রামে চলিলাম।

দেও। মা, এ ক্ষেত্রে অপরাধী আমি। আমারই অসাবধানতায় এমনটা হইল। এখানে আসিয়া তোমায় দেখিতে না পাইলে যখন আমার প্রভু, ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবেন, তখন মা, কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইব—কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব ?

বিলি। আমার যাহা বলিবার আছে তাহা মাকে বলিয়া চলিলাম। মা তাঁহাকে বুঝাইবেন।

দেওয়ান অনেক বুঝাইল, কিন্তু বিলি কিছুতেই থাকিতে সম্মতা হইল না। তখন দেওয়ান একখানা পান্‌সি আনিয়া যোগাইল। মাঝি মাল্লা রমেশের বেতন-ভোগী ভৃত্য,—ডাকিবামাত্র তাহারা আসিল। বিলি তখন নৌকায় উঠিল। সঙ্গে রেবতী ও একজন দ্বারবান চলিল। যখন নৌকা ছাড়িল, তখন সূর্য্যোদয়ের বড় বিলম্ব নাই।

আধ ঘণ্টা পরে পানসির অনুসরণ করিয়া একখানি নৌকা বিশালপুর হইতে ছাড়িল। এই নৌকার আরোহী হারাণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

মকর্দ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে নির্ম্মল সম্পূর্ণ উদাসী।

আগামী কল্য কাটোয়াতে তাঁহার বিচার। আজ রাত্রিতে নির্ম্মল সবান্ধব নৌকারোহণে যাত্রা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। চারি পাঁচখানা নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে। নির্ম্মল একখানি ছোট বজরায় সোহাগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। অপর লোকেরা নৌকায় যাইবে। নৌকা প্রস্তুত; আত্মীয় স্বজনেরা গমনোদ্যোগী; কিন্তু কেহই যাইতে পারিতেছেন না; কারণ, নির্ম্মল তখনও বহির্ব্বাটীতে আইসেন নাই।

অবশেষে বিলম্ব দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ নায়েব অন্দরে আসিয়া কারণ অনুসন্ধিৎসু হইল। সে আসিয়া দেখিল, নির্ম্মল মায়ের কক্ষদ্বার সন্নিকটে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। নায়েব বলিল, "আসুন,—রাত্রি অনেক হইল। বাহিরে সকলে অপেক্ষা করিতেছেন।"

নির্ম্মল। তোমরা আগু হও – আমি পিছনে যাইব।

নায়েব। কেন?

নির্ম্মল। মার অনুমতি না লইয়া যাইতে পারিব না।

নায়েব। তিনি কোথায়?

নির্ম্মল। তা'জানি না। আমাকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া কোথায় গিয়াছেন।

নায়েব। আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।

নায়েব চলিয়া গেল। অন্তঃপুরস্থ সকল ঘর, সকল স্থান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল; অবশেষে দেবী-মন্দিরে অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ মিলিল। নায়েব কিছু না বলিয়া সদরে চলিয়া গেল; এবং লোকজন লইয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করিল।

অত্যল্পকাল পরে অন্নপূর্ণা, ভগবতীর অর্ঘ্য লইয়া নির্ম্মলের সমীপস্থ হইলেন। নির্ম্মল অর্ঘ্য গ্রহণ না করিয়া মায়ের চরণ ধূলি মাথায় লইলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, দেবী অনুকূল, তাঁহার প্রসাদী ফুল গ্রহণ কর,—ত্রিভুবন প্রতিকূল হইলেও তোমার ভয় নাই।"

নির্ম্মল ফুল লইলেন বটে, কিন্তু তখনই তাহা মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, আমি হিন্দু হইয়াও

দেবদেবী চিনি না; চিনি কেবল তোমাকে। তুমি আমার ভগবতী; তোমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়াছি, আবার কি চাই, মা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছি, বাবা, অমন কথা বলিতে নাই; আগে দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

নির্ম্মল তখন মাথা পাতিয়া ফুল বিল্বপত্র গ্রহণ করিলেন। সোহাগ অন্য কক্ষে ছিল; সে আসিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সোহাগ, তোমার দাদার সঙ্গে গিয়া বজরায় উঠ।"

সোহাগ বলিল, "কোথায় যেতে হ'বে জেঠাই মা?"

অন্ন। কাটোয়াতে।

সো। সেখানে কি করতে যাব?

অন্ন। তুমি যে সাক্ষী। আর দেরী করিও না—নৌকায় উঠ।

সঙ্গে একজন দাসী চলিল। নির্ম্মল, সোহাগ ও দাসীকে লইয়া বজরায় উঠিলেন।

সোহাগ বজরায় আসিয়া দেখিল, একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বজরাখানি ক্ষুদ্র,—একটি বই তাহাতে শয়নোপযোগী দ্বিতীয় কামরা নাই।

যে বজরায় উঠিয়া নির্ম্মল, বিলির সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেন, সে বজরা খানি অপেক্ষাকৃত বড়; কিন্তু নির্ম্মল এক্ষণে তাহা ব্যবহার করেন না।

মাঝিরা বজরা ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আনন্দপুরের ঘাট ছাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে বজরা ছুটিল।

কামরার ভিতর সোহাগকে রাখিয়া নির্ম্মল ছাদে আসিয়া বসিলেন। তথায় একটা শয্যা ছিল। নির্ম্মল শয্যায় শুইয়া আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটি একটি করিয়া নক্ষত্র, আকাশকন্দরে লুকাইল---বুঝিবা আঁধারে পথ দেখিতে পাইবে না আশঙ্কা করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। নিবিড় হইতে নিবিড়তর মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল—তবু নির্ম্মল উঠিলেন না। ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। নির্ম্মল সেই বৃষ্টির মধ্যে ছাদের উপর একাকী রহিলেন।

সোহাগ তখনও ঘুমায় নাই। দাসীর সহিত তাহার অনেক কথা হইতেছিল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "হ্যাঁগা, দাদা আমায় কেন কাটোয়া নিয়ে যাচ্ছেন?"

দাসী। জান না? তুমি যে সাক্ষী।

সো। আমি কিসের সাক্ষী?

দা। ওমা, আমি কোথায় যাব! সাক্ষী আবার কিসের হয়? তুমি মকরধামার সাক্ষী।

সো। আমাকে কাহারও কাছে যেতে হবে নাকি?

দা। যেতে হবে না? সাহেবের কাছে যেতে হবে। কত হাকিম থাক্‌বে—তাদের কাছে দাঁড়িয়ে তোমায় সব কথা বলতে হ'বে।

সো। কি বলতে হ'বে?

দা। তা'ও আবার ব'লে দিতে হ'বে?

সো। আমি যে কিছু জানি না।

দা। তবে শোন;—কেমন করে তোমায় হালদারণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল—কেমন করে হালদারণী তোমায় বেঁধেছিল—কেমন করে কিঙ্কর হতভাগা তোমায় বেইজ্জত করেছিল—কেমন করে দাদাবাবু গিয়ে তোমায় রক্ষা কর্‌লেন, সব কথা সেখানে গিয়ে খুলে বলতে হ'বে।

সো। আমি যে তা' বলতে পারব না, গা।

দা। না পারলে চলবে না—পেটে আঁকুশি দিয়ে কথা বার ক'রে নেবে। শুধু কি তাই? কিঙ্করের সঙ্গে তোমার আশনাই আছে কি না—দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব আছে কিনা, এই রকম কতকথা তোমায় জিজ্ঞেস কর্‌বে।

সোহাগের মুখ শুকাইয়া গেল। বিচারালয়ে সর্ব্বজন সমক্ষে এমন জঘন্য কথার উত্তর দিতে হইবে শুনিয়া সে মরমে মরিয়া গেল। সে ভাবিয়া স্থির করিল, "আমায় কাটিয়া ফেলিলেও আমি সাক্ষী হইয়া আদালতে দাঁড়াইতে পারিব না।" ক্ষণপরে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি কোন কথার উত্তর না দিই।"

দাসী বলিল, "উত্তর না দিলে আর রক্ষা আছে? তোমায় উলঙ্গ করে জল্লাদে বেত লাগাবে।"

সোহাগ অন্ধকার দেখিল। ভাবিয়া কিছুই কিনারা পাইল না। এমন সময় বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়া বৃষ্টি আসিল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়?"

দাসী বলিল, "তিনি বুঝি ছাদের উপর।"

শুনিবামাত্র সোহাগ ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল; ডাকিল, "দাদা!" প্রভঞ্জন-হুঙ্কারে সে ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক কোথায় ডুবিয়া গেল। বার বার ডাকিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন ছাদে আসিয়া নির্ম্মলকে ডাকিল। নির্ম্মল কামরার ভিতর আসিয়া বলিলেন, "কেন সোহাগ, আমার জন্য খানকা বৃষ্টিতে ভিজিলে?"

সোহাগ বলিল, "খানকা ভিজিলাম! তুমি কি রকম ভিজেছ তা' বুঝি জানিতে পারিতেছ না।"

সোহাগ শুষ্কবস্ত্র দিয়া নির্ম্মলের গা মাথা মুছাইয়া দিল, শুষ্ক বস্ত্র পরিতে দিল। পরে নির্ম্মলকে পালঙ্কের উপর বসাইয়া নিজে কক্ষতলে বসিল—পদ্মদলতুল্য ক্ষুদ্র হস্তমধ্যে নির্ম্মলের পদযুগল লইয়া মর্দ্দনে উত্তাপ সৃষ্টি করিতে লাগিল।

নির্ম্মল বলিলেন, "কেন, সোহাগ, তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করিতেছ? তুমি নিদ্রা যাও—আমি উপরে যাই।"

সো। তোমাকে আর আমি উপরে যাইতে দিব না।

নি। বৃষ্টি থামিয়াছে—ওই দেখ চাঁদ আবার দেখা দিয়াছে, ত্রিপল খাটাইয়া উপরে আমি বেশ থাকিতে পারিব।

সো। যদি কাহাকেও বাহিরে যাইতে হয় তাহ'লে আমি যাব। কেন, দাদা, তুমি আমার জন্য এতটা কষ্ট পাইতেছ?

নি। আমার আবার কষ্ট! সে কথা যাক্। এখন তুমি একটু ঘুমাও, নইলে কাল দাঁড়াতে পারবে না।

সো। হ্যাঁ, দাদা, হাকিমের কাছে দাঁড়িয়ে কাল নাকি আমাকে সাক্ষী দিতে হ'বে?

নি। সাক্ষী দিতেইত কাটোয়া যাওয়া।

সো। সত্য মিথ্যা যা' জিজ্ঞাসা করিবে তারই কি উত্তর দিতে হ'বে?

নি। নিশ্চয়।

সো। যদি না বলি?

নি। তা'হলে জেলে দেবে—জরিমানা করবে—বাড়ী ঘর দ্বার নিলাম করে টাকা আদায় করবে; কি করবে না করবে তা' হাকিমই জানেন।

সো। যদি না যাই?

নি। ধরে নিয়ে যাবে।

সো। যদি মরে যাই?

নি। তবেত সব চুকেই গেল।

সোহাগ চুপ করিল। ভাবিল "জেলে যেতে পারি; কিন্তু পৈত্রিক ভদ্রাসন নীলামে উঠাইতে দিতে পারি না। প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু সে সব নোংরা কথা আদালতে দাঁড়িয়ে বলিতে পারি না। দাদার সাম্‌নে যখন সে সব জঘন্য কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তখন—ছিঃ ছিঃ আমি তা পারব না—কোনমতেই না।"

ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি সেখানে থাক্‌বে?"

নির্ম্মল বলিলেন, "কোথায়? বিচারালয়ে? থাক্‌ব বই কি, আমি যে আসামী।"

এমন সময় দূর হইতে কে হাঁকিল, "কা'র বজরা?"

নির্ম্মলের দ্বারবান উত্তর দিল, "বধূগ্রামের জমিদার বাবুর বজরা।"

নির্ম্মল গবাক্ষপথে জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, এক-খানা বড় বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। রমেশের বজরা বলিয়া নির্ম্মলের একটু সন্দেহ হইল—দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তিনি সে সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। বস্তুতই সেখানা রমেশের বজরা।

রমেশকে আসিতে দেখিয়া নির্ম্মল বড়ই বিরক্ত হইলেন। কাটোয়াতে কি অভিপ্রায়ে রমেশ আসিতেছেন, তাহা নির্ম্মলের জানিতে বাকি নাই। রমেশের নিকট সাহায্য লওয়া নির্ম্মলের অভিপ্রায় নহে; এমন কি তাঁহার সাহায্যে মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা নির্ম্মল জেলে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করেন। নির্ম্মল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, পথে কিম্বা কাটোয়াতে রমেশের সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিবেন না। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নির্ম্মল বাহিরে আসিলেন। একবার চারিদিক দেখিয়া

লইয়া নির্ম্মল মাঝিদের আদেশ করিলেন, "পিছনে একখানা বজরা আমাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি ধরিতে পারে, তোমাদের বরখাস্ত করিব—না পারে, বখ্‌শিষ্‌ দিব।"

মাঝিরা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে কামরার ভিতরে থাকিয়া সোহাগ বুঝিল, বাহিরে কি একটা গোল বাধিয়াছে। কি যে, তাহা সে বুঝিল না। বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে তখন অকুল চিন্তাসাগরে নিমজ্জিতা। সে ভাবিতেছিল, "যদি আদালতে হাজির না হই, তাহ'লে পুলিশে টেনে নিয়ে যাবে। যদি হাজির হ'য়ে কোন কথা না বলি, তা'হ'লে আমায় জেলে দিয়ে ইজ্জত মার্‌বে—পৈত্রিক ভদ্রাসন বেচে জরিমানা আদায় কর্‌বে। আদালতে সকলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সত্য মিথ্যা কতকগুলো কুৎসিৎ কথার উত্তর যদি দিতে পারি তবেই ত আমার নিস্তার; কিন্তু তা'ত আমি পার্‌ব না—জীবন থাকতে নয়। তবে উপায়?"

সোহাগ আবার চিন্তামগ্ন হইল। ক্ষণপরে দৃঢ়সংকল্পে বুক বাঁধিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিল। সেখানে দেখিল, নির্ম্মল

নাই। ফিরিয়া নীচে আসিল। আবার কি ভাবিয়া তখনই উপরে উঠিল। তারপর আকাশের পানে চাহিয়া নীরবে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পতন শব্দে নির্ম্মল চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি পড়িল?" কি পড়িল, তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারিল না। একজন মাঝি বলিল, যেন একটা মানুষ ব'লে ঠাওর হ'ল।" মানুষ কে পড়িল? মাঝি, দ্বারবান গণনা করা হইল—তাহারা কেহ পড়ে নাই। নির্ম্মল কামরার ভিতর ছুটিয়া আসিলেন। তথায় দেখিলেন, দাসী কক্ষ-তলে ঘুমাইতেছে, সোহাগ সেখানে নাই। সোহাগ কোথায় গেল? নির্ম্মল ছুটিয়া আবার উপরে আসিলেন। সেখানেও সোহাগ নাই। পাতি পাতি করিয়া সোহাগের

অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইলেন না। তখন নির্ম্মল বজরা ফিরাইতে আদেশ করিলেন। যখন বজরা ফিরিল, তখন যেখানে সোহাগ পড়িয়াছিল সেখান হইতে বজরা অনেক দূর আসিয়াছে।

স্রোতের প্রতিকূলে উত্তর দিকে বজরা ফিরিল। বাতাসও অনুকূল নয়। সুতরাং বজরা বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিল না। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মল ছোট পান্‌সি খুলিয়া তাহাতে উঠিলেন। উপযুক্ত আলো ও কয়েকজন বলিষ্ঠ মাঝি লইয়া নির্ম্মল পান্‌সি ছাড়িয়া দিলেন। পান্‌সি ছুটিল। আলোর সাহায্যে চারিদিকে অনুসন্ধান চলিল; কিন্তু কোথাও সোহাগের দেহ পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া রাত্রিশেষে নির্ম্মলকুমার বিষণ্ণ মনে কাটোয়া অভিমুখে ফিরিলেন।

নির্ম্মল ফিরিলেন বটে, কিন্তু সোহাগ কোথায় গেল? সোহাগ জলে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। পিছনে রমেশের বজরা আসিতেছিল। স্রোত ও বায়ু খুব প্রবল; বজরা পক্ষিণীর ন্যায় ছুটিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিল। সোহাগের দেহও স্রোত সাহায্যে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। তবে বজরার গতি এত দ্রুত যে, স্রোত-

তাড়িত দেহ সত্বর অতিক্রম করিয়া বজরা চলিয়া গেল। অতিক্রম কালে রমেশ সেই ভাসমান দেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রমেশ হালে ছিলেন এবং সেখান হইতে লাফাইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিলেন। রমেশকে অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে পড়িতে দেখিয়া মাঝিরা পাল নামাইয়া বজরা থামাইল; এবং ক্ষুদ্র পান্‌সিতে উঠিয়া কয়েকজন তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

অনুসন্ধান বড় একটা করিতে হইল না,—সত্বরই রমেশের সাক্ষাৎ মিলিল। রমেশ তখন সোহাগের দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া স্রোত সাহায্যে ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর মাঝিদের সাহায্যে রমেশ, সোহাগকে লইয়া বজরায় উঠিলেন।

সোহাগ চৈতন্যশূন্যা; কিন্তু মৃতা নয়। সে সাঁতার জানিত—ডুবিবার ইচ্ছা করিয়াও সহজে সে ডুবিতে পারে নাই। তবে পেটে অনেকটা জল গিয়াছিল—তদ্ধেতু নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিরূপে এ অবস্থায় উদর হইতে জল বাহির করিতে হয় রমেশ তাহা বেশ জানিতেন। তৎপরে কিরূপে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস সৃষ্টি করিতে হয় তাহাও রমেশ অবগত ছিলেন।

সোহাগের মৃণালতুল্য ভুজবল্লী নিজ হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিতে রমেশ একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না; সেই ভ্রমর-গুঞ্জিত, পদ্মরাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর মধ্যে ফুৎকার দিতে ইন্দ্রিয়জয়ী রমেশ একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শিত—করে কর ধৃত - বক্ষ বক্ষের সন্নিকটস্থ, তবু রমেশের চিত্তবিকার নাই। বিস্রস্তবসনা, পরম লাবণ্যময়ী বালিকা, রমেশের অঙ্কোপরি—তবু রমেশের হৃদয়ে বিকার নাই। যেন একটি পাষাণ-গঠিত মূর্ত্তি কোন প্রাণহীনা পাষাণপ্রতিমার শুশ্রূষা করিতেছে।

অল্প আয়াসে সোহাগের চৈতন্য সঞ্চার হইল,—সোহাগ নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদিকে অপরিচিত পুরুষ। কিন্তু রমেশের পানে নয়ন পড়িবা মাত্র সোহাগ তাঁহাকে চিনিল। তিনি একবার পুষ্করিণীঘাটে সোহাগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সোহাগ ভাবিল, সম্ভবতঃ এবারও তিনি রক্ষা করিয়া থাকিবেন। তা' রক্ষা করিলে কি হইবে? এবার সোহাগ নিশ্চয় মরিবে—কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

রমেশের অনুরোধে সোহাগ বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল—

একটু উষ্ণ দুগ্ধও পান করিল। কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পাইল না। যে আত্মনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার আবার শান্তি ?

হালদারণী, সোহাগকে দেখে নাই। সে নীচের একটা ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে ছিল। বজরাখানি বড়; উপরে বড় বড় দু' তিনটি কামরা। একটি রমেশের শয়ন কক্ষ; দ্বিতীয়টি স্ত্রী, অথবা প্রয়োজন হইলে বন্ধু বান্ধবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। নীচে কয়েকটি ক্ষুদ্র কামরা। কোনটায় রন্ধন হইত, কোনটায় ভাণ্ডার থাকিত, কোনটায় বা আসবাবাদি রক্ষিত হইত।

যে কক্ষটি রমেশের স্ত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই কক্ষ মধ্যেই সোহাগকে রক্ষা করা হইয়াছিল। ঘরের মহামূল্য আসবাব দেখিয়া সোহাগ বিস্মিত হইল। মেহগ্নি কাষ্ঠের মনোহর পালঙ্ক, তাহাতে নেটের মশারি বিলম্বিত। উপরে স্যাটিনের চন্দ্রাতপ, হর্ম্ম্যতলে কার্পেট বিস্তৃত, ভিত্তিগাত্রে নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র, গৃহকোণে পিয়ানো। আলমারীতে চা সেবনোপযোগী রৌপ্যপাত্র, গবাক্ষপার্শ্বে মখমল-মণ্ডিত সোফা। সোহাগ সেই বিলাসময় কক্ষ মধ্যে কুসুমদলবৎ কোমল শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে।

সোহাগকে বস্ত্রাদি দিয়া রমেশ স্থানান্তরে প্রস্থান

করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে কোন ভৃত্য বা মাঝির আসিবার অনুমতি নাই। সুতরাং সোহাগ একা—আপন জ্বালাময়ী চিন্তারাশি লইয়া একা।

রমেশ তখন ছাদের উপর পাদচালনা করিতেছিলেন। বজরা আবার স্রোত সাহায্যে দক্ষিণাভিমুখে ছুটিয়াছে। রমেশ চারিদিকে নয়ন ফিরাইয়া নির্ম্মলের বজরার অনু-সন্ধান করিলেন, কিন্তু সেই অস্পষ্টালোকে দূরের পদার্থ নয়ন গোচর হইল না। দেখিতে দেখিতে বাতাস প্রতি-কূল হইল—বজরা তখন মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রমেশ ছাদে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ বালিকা যে সোহাগ, তাহা দুইটি কারণে রমেশ স্থির করিয়াছেন। প্রথম কারণ, এ বালিকাকে রমেশ আনন্দপুরে দেখিয়াছেন; এবং যেখানে সোহাগের বাড়ী হওয়া উচিত, তাহারই নিকটবর্ত্তী কোন পুষ্করিণীতে তাহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ—বালিকা, নির্ম্মলের নৌকায় ছিল। যদি এ বালিকা সোহাগ না হইবে, তবে নির্ম্মলের সঙ্গে কেন কাটোয়া যাইতেছিল? অতএব এ বালিকা নিঃসন্দেহ সোহাগ।

রমেশ ভাবিতেছিলেন, "স্বীকার করিলাম এ বালিকা সোহাগ। কিন্তু গঙ্গাজলে পড়িল কেন? কেহ কি ফেলিয়া দিয়াছে? না. আত্মহত্যা-প্রয়াস? অথবা দৈব দুর্ঘটনা? কেহ যে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহা সম্ভব নয়। নিরপরাধী দরিদ্র কন্যাকে হত্যা করিয়া কাহার লাভ? বিশেষতঃ, যে তাহাকে ভগিনী তুল্য স্নেহ করে, সে-ই তাহার রক্ষক স্বরূপ তখন বজরায় ছিল। দৈব দুর্ঘটনাও সম্ভব নয়—কেন না, বালিকা শান্ত, ধীর। গভীর নিশীথে কেনই বা সে কক্ষ ছাড়িয়া বাহিরে আসিবে? তবে কি আত্মহত্যা? আত্মনাশের প্রয়াস কেন?"

রমেশ আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। যে রমেশের চিন্তার কেন্দ্রস্থল, সে ক্ষণপরে ঘর ছাড়িয়া ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য—আত্মনাশ। ডেকের উপর মাঝিরা কেহ কেহ বসিয়াছিল; তাহাদের দেখিয়া সোহাগ সেখানে আর দাঁড়াইল না;—ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিল।

ছাদে আসিয়া দেখিল, তথায় রমেশ। তখন সোহাগ অপ্রতিভ হইয়া পলাইবার উপক্রম করিল।

রমেশ বলিলেন, "ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? আমি না হয় নীচে যাইতেছি।"

সোহাগ নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া রমেশ বলিলেন, "কিন্তু আপনাকে আমি চক্ষুরন্তরাল করিতে পারিব না।"

সোহাগ একবার রমেশের মুখ পানে নয়ন তুলিয়া চাহিল। পর মুহূর্ত্তেই চক্ষু নামাইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

র। যে আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প, তাহাকে নয়নান্তরাল করিতে পারি না।

সোহাগ উত্তর করিতে পারিল না। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব নয়। অতএব নিরুত্তর রহিল।

রমেশ। আত্ম নাশের চেষ্টা কেন?

উত্তর দিতে সোহাগের বাধ বাধ ঠেকিল। নির্লজ্জ হইয়া অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কহা সোহাগের অভ্যাস নাই; সুতরাং লজ্জা আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবিল, "যে সহস্র লোকের সাম্নে দাঁড়াইয়া কুৎসিৎ প্রশ্নের উত্তর দিতে চলিয়াছে, তা'র আবার লজ্জা? বিশেষতঃ যিনি দেব-ভাবাপন্ন, আমার জীবনদাতা, তাঁর সাম্নে লজ্জা আস্লিলেও আসিতে দিব না।"

এইরূপ মনের উপর জোর করিয়া সোহাগ বলিল, "আমি যে আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প তাহা আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

র। ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি।

সো। আপনি আমার জীবনদাতা—আপনার নিকট আমার আর লজ্জা নাই। আর যে মরিতে বসিয়াছে, তার আবার লজ্জা কি? আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, আমাকে আপনি বাঁচাইলেন কেন?

র। যে কারণে আপনি আত্মনাশে উদ্যত, সে কারণ তিরোহিত হইলে এ অনুযোগ থাকিবে কি?

সো। সে কারণ দূর করা মানুষের সাধ্য নয়।

র। যদি আমি পারি?

সো। তবে আপনি দেবতা।

র। আমি দেবতা হ'তে চাই না।

সো। তবে?

র। আপনি সুখী হউন ইহাই আমার কামনা।

সোহাগ নিরুত্তর রহিল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে স্থির?"

সো। কি স্থির?

র। আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ করা স্থির?

সো। আপনি জানেন কি, কেন আমি আত্মহত্যা প্রয়াসী? কারণ অবগত না থাকিলে আপনি কিরূপে তাহা দূর করিবেন?

র। আদালতে দাঁড়াইয়া কুৎসিৎ অভিযোগে সাক্ষ্য দিতে আপনার অনিচ্ছা। মুক্তির উপায় নাই দেখিয়া জীবন বিসর্জ্জনের প্রয়াস। কেমন নয় কি?

সো। আপনি কি দেবতা?

রমেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ মাত্র।"

সো। যে কথা আমি ছাড়া জগতের কেহ জানে না তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

র। ঘটনার অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছি। তা'ছাড়া, আপনার মুখ দেখিলেই সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সোহাগের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে দাদার কাছে পৌঁছাইয়া দিন।"

র। আপনার দাদা কে তাহাত আমি জানি না।

সো। বধুগ্রামের জমিদার—নির্ম্মলকুমার।

র। ওঃ! তিনি!

সো। তাঁকে চিনেন না?

র। অতবড় জমীদারকে আবার চিনি না!

সো। তবে তাঁর কাছে আমায় রেখে আসুন।

র। তা' পারিব না।

সো। কেন?

র। তিনি কোথায় তা' আমি জানি না।

সো। তবে আমার গতি কি হইবে?

র। আপনি এ বজরায় থাকিবেন—জনপ্রাণী আপনার কক্ষে প্রবেশ করিবে না।

সো। তার পর?

র। ফিরিয়া যাইবার সময় আপনাকে আনন্দপুরে রাখিয়া যাইব।

সো। আপনি এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন?

র। কাটোয়া।

সো। কেন?

র। পরে জানিবেন।

সো। আমায় সাক্ষ্য দিতে হইবে না?

র। না।

সো। বজরা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইবে না?

র। না।

সো। উত্তম—আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

কাটোয়ার ঘাটে পৌঁছিতে রমেশের রাত্রি প্রভাত হইল। পৌঁছিয়া, তাঁহার পরিচিত জনৈক উকীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উকীলের নাম শরচ্চন্দ্র। তিনি আসিলে রমেশ তাঁহাকে সবিশেষ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। তারপর যখন আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন হালদারণীকে শিবিকারোহণে বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে একজন বিশ্বাসী দ্বারবান চলিল। রমেশ নিজে বজরা ত্যাগ করিলেন না।

অনেকেই অবগত আছেন যে, গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গম স্থলে কাটোয়া অবস্থিত। কাটোয়ার উত্তরে অজয়, পূর্ব্বে গঙ্গা। আদালত গৃহ হইতে অজয় সন্নিকট—গঙ্গা একটু দূরে। নির্ম্মল প্রভৃতি সকলের বজরা অজয় মধ্যে নীত

হইল; কিন্তু রমেশের বজরা গঙ্গার উপর রহিল। নির্ম্মল চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া রমেশের বজরা অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

বেলা এগারটা বাজিল। উকীল মোক্তার, পুলীশ আসিয়া আদালত গুলজার করিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সেই জনতার মধ্যে কেদার জেঠা, হরি কিঙ্কর প্রভৃতি অনেকানেক সাক্ষী ছিল। আসামীও হাজির। কিন্তু বাদিনীকে কেহ দেখিতে পাইল না। জেঠা তজ্জন্য সবিশেষ চিন্তিত। কিঙ্কর পিতাকে বুঝাইয়া বলিতেছিল, "সে জন্য ভাবনা কি, বাবা! আজ হাজির না হ'লেও আর একদিন তা'কে হাজির হ'তে হবে। ইংরাজের মুলুকে সে পালাবে কোথায়?"

কেদার জেঠা বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, সকল কথা ঠিক বুঝিতেছ না। আজ যদি সে হাজির না হয় তাহ'লে মকর্দ্দমা খারিজ হ'য়ে যাবে।"

কিঙ্কর। আচ্ছা, সে কোথায় গেল বাবা?

জেঠা। আমার ভয় হচ্ছে নির্ম্মল তা'কে সরিয়েছে।

কি। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিল এর মধ্যে তা'কে কখন সরালে?

জে। বুঝ্‌তে হবে সন্ধ্যার পর সরিয়েছে।

কি। মরে যায়নি ত?

জে। মরবে কেন! মরবার আর সময় পেলে না, মকর্দ্দমার ঠিক আগের দিন মরে গেল?

কি। তা' বই কি! যদি মরতেই হয়, না হয় এজাহার দিয়েই মরুক।

এমন সময় হাকিম আসিয়া বিচারালয়ে উপবেশন করিলেন। সকলে সেই দিকে ছুটিল।

হাকিম একজন প্রবীণ বাঙ্গালী। সুবিচার করিতে তিনি কাহারও খাতির করিতেন না, বা ডরাইতেন না। সকল সময়ে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া তিনি মোড়লী ধরণে বিচার করিতেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না; তবু পুলিশ তাঁহাকে ভয় করিত, কর্ত্তৃপক্ষ একটু খাতির করিত। সে প্রকার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ স্বাধীনচেতা বিচারক ক্রমেই এদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। এখন উপরিওয়ালার মন না যোগাইলে চাকুরী থাকে না।

যাহা হউক, হাকিম আসিয়া বসিলে প্রথমেই নির্ম্মলের মকর্দ্দমার ডাক হইল। আসামী আসিয়া দাঁড়াইল।

কাটোয়াতে যে কয়েকজন খ্যাতনামা উকীল ও মোক্তার ছিলেন সকলেই নির্ম্মলের পক্ষে নিয়োজিত হইয়াছেন। একজন নব্য উকীল ও একজন পাতি মোক্তার বাদিনীর মকর্দ্দমা চালাইতেছিলেন। কেদার জেঠা পয়সা খরচ করিতে বড় কাতর। নির্ম্মলের খুড়া অর্থ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জেঠা একা কত করিবে? মকর্দ্দমা উঠিতে না উঠিতেই জেঠার দুইশত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। জেঠা ভাল উকীল দিয়া উঠিতে পারে নাই; দিবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু দর কষিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলের নায়েব, টাকা দিয়া ওকালতনামায় দস্তখত করাইয়া লইয়া গেল।

কাটোয়াতে শরৎ বাবুর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা খুব। তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মলের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশের উপদেশ পাইয়া তিনি বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় আদালতে আসিয়া বসিলেন। নির্ম্মলের মকর্দ্দমা উঠিলে তিনি নির্ম্মলের জন্য একখানি বসিবার আসন হাকিমের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আসন মিলিল; কিন্তু নির্ম্মল তাহা গ্রহণ করিলেন না,—সগর্ব্বে কাষ্ঠ বেড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন কেদার জেঠার নিয়োজিত বাদিনীর উকীল রতন বাবু মকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন। সে সব অলীক কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

আরম্ভের ভনিতা দেখিয়া শরত বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একটু হাসিয়া বলিলেন, "জানি না সুবিজ্ঞ উকীল মহাশয়ের কল্পনা স্রোত কোথায় গিয়া থামিবে। আদালতের সময় অনর্থক নষ্ট না করিয়া কাজের কথা তুলিলে ভাল হয় না?"

রতন বাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "শরত বাবুর মক্কেলের ক্ষতিজনক কার্য্য হইলে শরত বাবুর রাগ হইতে পারে বটে—কিন্তু আমি নাচার। আসামী অপরাধ স্বীকারকরিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।"

শরৎ। সে যুক্তি পরে আপনার নিকট লওয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি বাদিনী ও সাক্ষীদের এজাহার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

রতন। বাদিনী কই? তা'কে ডাকুন। আমি জেরা করিব।

শরৎ। একথা বড় মন্দ নয়। আপনি যে বাদিনীর উকিল, তা' কি ভুলে গেছেন?

তখন রতন বাবুর চমক ভাঙ্গিল। বাদিনীর ডাক পড়িল। ক্ষণপরে হালদার ঠাকুরাণী অবগুণ্ঠনে মুখাচ্ছাদিত করিয়া হাকিমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেদার জেঠা তাহাকে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। চুপি চুপি পুত্রকে বলিলেন, "কিঙ্কর, আর রক্ষা নাই—হালদারণীকে নির্ম্মল ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।"

কিঙ্কর। কিসে তা' বুঝিলেন? সে আসে নাই ব'লে যে কিছু পূর্ব্বে কত ভাবিতেছিলেন।

কেদার। আমি বেশ বুঝিতেছি, হালদারণীকে কে লুকাইয়া আনিয়াছে—আমাদের চো'খে ধূলা দিয়ে এতক্ষণ কে তা'কে এখানে লুকাইয়া রেখেছিল। যদি তাহা না হইত তা'হ'লে হালদারণীকে আমরা দেখিতে পাইতাম—সেও আমাদের দেখা দিতে চেষ্টা করিত।

শুনিয়া কিঙ্কর বড়ই চিন্তিত হইল,—হালদারণীকে দুটা কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু শরত বাবুর সাবধানতায় কিঙ্কর, হালদারণীর কাছে যাইতে পারিল না।

হাকিম, হালদারণীর এজাহার লিখিয়া লইতে লাগিলেন। হালদারণী প্রকৃত ঘটনা একে একে বলিতে

লাগিল। শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। আবার যখন শরত বাবু উঠিয়া ওজস্বিনী ভাষায় সোহাগের সম্পত্তির উপর কেদার জেঠার লোভ—সোহাগের সম্বন্ধে কিঙ্করের কুৎসিৎ অভিসন্ধি—হালদারণী ও কিঙ্করের ষড়যন্ত্র বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সকলের বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। নির্ম্মলের সুবিমল চরিত্র—স্বগ্রামে খ্যাতি—সোহাগের সহিত নির্ম্মলের পবিত্র সম্বন্ধ, তাহাও একে একে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে শরত বাবু বিরত হইলেন না।

শুনিয়া সেই জনতা বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিঙ্কর নিজে পাপ করিয়া পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য কিরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল শুনিয়া চারিদিকে লোকে ধিক্কার দিতে লাগিল। দেখিয়া, শুনিয়া পিতা-পুত্র সরিয়া পড়িলেন।

নির্ম্মল দোষ-স্খালিত হইলেন। মুক্ত হইবার জন্য উকীলের কূট তর্কের কোনই প্রয়োজন হইল না—সাক্ষ্য প্রমাণাদি কিছুই আবশ্যক হইল না। কিন্তু কেমন করিয়া এমনটা হইল? নির্ম্মল ভাবিলেন, যে কথা তিনি ও সোহাগ ভিন্ন অপর কেহ জানিত না, সে কথা কিরূপে

প্রকাশ পাইল? সোহাগ মরিয়া গিয়াছে, সে কিছু বলে নাই; হালদারণীও সকল কথা জানে না। তবে কোন্ অসাধারণ শক্তি বলে সকল গুপ্ত কথা একত্র গ্রন্থিত হইয়া সাধারণে প্রকাশ পাইল? নির্ম্মল ভাবিলেন, "তবে কি এর ভিতর রমেশ আছেন?"

নির্ম্মল কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া অন্যমনে আদালত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শরত বাবু হালদারণীকে লইয়া নিজের বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি যখন একপ্রহর তখন রমেশ, সোহাগকে লইয়া আনন্দপুরের ঘাটে পৌঁছিলেন।

রমেশ ডাকিলেন, "সোহাগ!"

সোহাগ উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ। এইবার আমাদের নামিতে হইবে।

সোহাগ। আপনি কোথায় যাইবেন?

রমেশ। তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিব।

সোহাগ বজরা হইতে রমেশের সঙ্গে নামিল। আগু আগু দুই জন দ্বারবান আলো দেখাইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে রমেশ বলিলেন, "সোহাগ, আজ তোমাকে আমার পরিচয় দিব।"

সোহাগ। আমি আপনার পরিচয় জানি।

রমেশ। জান? আমি কে বল দেখি।

সোহাগ। আপনি দেবতা; অন্য পরিচয় জানিবার প্রয়োজন নাই।

রমেশ। না, সোহাগ, আমি দেবতা নই— আমি—

উভয়ে গৃহদ্বারে পৌঁছিলেন। দ্বারবানেরা সরিয়া দাঁড়াইল। রমেশ ডাকিলেন, "সোহাগ!"

সোহাগ, রমেশের পানে শুধু একবার চাহিয়া দেখিল।

রমেশ। সোহাগ, চলিলাম—জানি না আবার কখন সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না। কিন্তু—কিন্তু —

বালিকা নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রমেশ বলিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি চিরসুখী হও ইহাই আমার প্রার্থনা"

তিনি সেখানে আর দাঁড়াইলেন না—ক্ষিপ্র চরণে

প্রস্থান করিলেন। বালিকা অশ্রুকণা নয়নে ধরিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

বধূগ্রামে আসিতে রমেশের দেড় প্রহর রাত্রি হইল। অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রমেশ সেই রাত্রিতেই বিদায় চাহিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না, বাবা, আর দু'দিন থাক।"

রমেশ। অনেক দিন আসিয়াছি, কাজ কর্ম্ম না দেখিলে ক্ষতি হইবে যে, মা।

অন্ন। তুমি আমার নির্ম্মলকে বাঁচাইলে, তোমার ধার কখন শোধ দিতে পারিব না, বাবা।

র। আমি কি করেছি, মা? আমি বজরা ছাড়িয়া ডাঙ্গাতেও উঠি নাই।

ক্ষণপরে অন্নপূর্ণা সজল নয়নে বলিলেন, "রমেশ, তুমি আমার বড় ছেলে,—নির্ম্মলের অপরাধ লইও না, বাবা।"

রমেশ বলিলেন, "নির্ম্মলের আবার আপরাধ কি মা? তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কেন, এমনটা হইল?"

অন্ন। কেন হইল তা কতকটা জানি; কিন্তু প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

র। কথাটা কি শুনিতে পাই না, মা? যদি আমার দ্বারা কিছু হয়।

অন্ন। তুমি বউমাকে সত্বর পাঠাইয়া দিতে পার?

র। কবে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি।

অন্ন। তুমি চিরজীবি হও, বাবা। বিশালপুরে পৌছিবামাত্র বউমাকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিও।

র। প্রতিশ্রুত হইতেছি, মা।

অন্ন। কি প্রতিশ্রুত হইতেছ?

র। চারি দিনের মধ্যে বিজু বধূগ্রামে আসিবে।

অন্ন। যদি বউমা আসিতে অনিচ্ছুক হ'ন?

র। স্বামীর কাছে আসিতে স্ত্রী অনিচ্ছুক হইবে?

অন্ন। যদি তাই হয়?

র। তাহা হইলেও তাকে পাঠাইব।

অন্ন। বাবা, তুমি রাজরাজেশ্বর হও। তোমার কল্যাণে ছেলেকে আবার ফিরে পাই।

র। কেন, মা, কি হয়েছে?

অন্ন। সে কথা আজ বলিব না। ভগবান যদি কখন দিন দেন্, তবে তখন সকল কথা বলিব।

রমেশ বিদায় হইলেন। তার কিছুকাল পরে নির্ম্মলের

বজরা ঘাটে আসিয়া লাগিল। তাঁহার ফিরিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। নির্ম্মল কাটোয়ার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে সোহাগের শব অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জীবিত বা মৃতদেহ কিছুই মিলিল না। তখন তিনি হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

ফিরিয়া আগে মাকে প্রণাম করিলেন। মা বলিলেন, "দেখিলে বাবা, ভগবান আছেন কি না। শত্রুর মুখে কালি দিয়া কলঙ্কধৌত স্বর্ণের ন্যায় তুমি আবার গৃহে ফিরিয়াছ।"

নির্ম্মল। ভগবান আমার কি করিয়াছেন, মা?

অন্ন। কেন, তোমায় কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন

নি। ভগবান কিছু করেন নাই।

অন্ন। তবে কে করিল?

নি। রমেশ।

অন্ন। কেমন করিয়া জানিলে?

নি। শরতবাবু উকীলের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি।

অন্ন। রমেশ সে সকল কথা কিছুই বলিলেন না; যাহা হউক, তবুত তুমি রমেশকে চিনিলে না।

নি। আমি রমেশকে বেশ চিনি। চিনিয়াও বলি-

তেছি যে, রমেশের দ্বারা উপকৃত না হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আমি অধিকতর গৌরব মনে করিতাম।

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঘাটে আসিয়া পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন এবং আনন্দপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কি বলিয়া সোহাগের মাকে প্রবোধ দিবেন ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মল কালী খুড়ার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি অনেক, কিন্তু সকলেই জাগ্রত। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নির্ম্মল সর্ব্বাগ্রে সোহাগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, নিষ্কম্প, নির্ব্বাক পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোহাগ একটু হাসিয়া বলিল, "কি দাদা, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

নির্ম্মল দেখিলেন, এ ভূত নয়—ভ্রম নয়—এ সত্যই সোহাগ। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "তুমি সোহাগ? তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সো। নৌকায় আসিয়াছি।

নি। তুমি ত ডুবিয়াছিলে!

সো। ডুবিয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই।

নি। কেমন করিয়া রক্ষা পাইলে ?

সো। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন।

সোহাগ একে একে সকল কথা বলিল। শ্রবণান্তে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, কেন ?"

সো। সাক্ষ্য দিতে হ'বে বলিয়া।

নি। আমায় বলিলে না কেন ?

সো। বলিলে উপায় করিতে পারিতে ?

নি। চেষ্টা দেখিতাম।

সো। তুমিই ত ব'লেছিলে, মরে না গেলে আমার নিষ্কৃতি নাই।

নির্ম্মল সে কথার কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দেবতা কোথায় গেলেন ?"

সো। তা' জানি না।

নি। যে বজরায় তোমায় উঠাইয়াছিলেন, সে বজরা দেখিতে কেমন ?

সো। তোমার বজরার চেয়ে অনেক বড় ; তা'তে ঘরও যথেষ্ট—সাজানও ভাল।

নি। তাঁহার নাম জান ?

সো। নাম? নাম জানি না।

নি। বয়স কত?

সো। তোমার চেয়ে কিছু বড়।

নির্ম্মল স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি রমেশ।

সোহাগের মা আসিয়া কত কথা নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নির্ম্মল তাহার একটারও উত্তর দিলেন না। সোহাগ দেখিল, নির্ম্মলের বদন চিন্তা-সমাকুল। চিন্তার সঙ্গে একটু ক্রোধও ছিল। সত্বরই নির্ম্মলকুমার আত্ম-সংযম করিয়া বলিলেন, "কিছুদিনের জন্য তোমাদের স্থানান্তরে যাওয়া কর্ত্তব্য। চারিদিকে শত্রু—কখন কি বিপদ ঘটে বলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, এক্ষণে আমার গৃহে চল—পরে যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। তোমাদের অভিপ্রায় কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের আবার মতামত কি? তুমি যেমন ব্যবস্থা করিবে তেমনই হইবে।"

নির্ম্মল। উত্তম। কাল্ সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের লইতে আসিব—প্রস্তুত থাকিবে।

নির্ম্মলকুমার বিদায় হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—o—

কিঙ্করের মনে শান্তি নাই। বেত্রাহত ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে কিঙ্কর গৃহে ফিরিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "সোহাগকে নষ্ট করিব—নির্ম্মলের বুকে আগুন জ্বালাইব, তবে ছাড়িব। দেখিব, কে সোহাগকে রক্ষা করে!"

কিন্তু সে রাত্রিতে কিঙ্কর কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কাটোয়া হইতে ফিরিতে অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। মনের আগুন মনের ভিতর চাপিয়া অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিঙ্কর, কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় নীহার শয্যা হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?"

কিঙ্কর। ও-পাড়ায় যাচ্ছি—একটু কাজ আছে।

নীহার। আজ আর কোথাও যেও না।

কি। কেন?

নী। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

কি। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছ ব'লে কাজে যাব না?

নী। তোমায় ত অন্য দিন বারণ করি না।

কি। স্বপ্ন দেখা খেয়ালটা যদি আজই চাগিয়া উঠে থাকে।

নী। তামাসা রাখ, স্বপ্নটা বড় গুরুতর।

কি। তোমার পেট গরম হয়েছে—সরবত খাওগে।

নী। তবু ঠাট্টা! আমি কিছুতেই যেতে দিব না।

কি। দেখ, নীহার, কাজের সময় বাধা দিও না। স্ত্রীলোকের আঁচল ধরিয়া থাকিলে. বিষয় সম্পত্তি রক্ষা হয় না। নির্ব্বোধের মত কেন বার বার বিরক্ত কর?

বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থানোদ্যত হইল। নীহার শয্যা ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কিঙ্করকে ধরিবার চেষ্টা করিল। আসিতে আসিতে আঁচল পায়ে লাগিয়া হত-ভাগিনী ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। কিঙ্কর হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখিলে, ভগবান কার পক্ষে!" মাটিতে শুইয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে নীহার বলিল, "ওগো, এ ভগবান নয়, এ নিয়তি। এখনও ফিরিয়া এস।"

কিঙ্কর শুনিল না—চলিয়া গেল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন ডোম বাস করিত; কিঙ্কর তাহার কুটীর দ্বারে আসিয়া দেখা দিল। ডোমের নাম রামু। একটা উপপত্নী ছাড়া তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। রামুর মদের খরচটা কিছু বেশী—কোন মতে কুলাইয়া উঠিতে পারে না। ঝুড়ি বুনিয়া কয়টা পয়সাই বা হয়। কাজেই রামু জাত ব্যবসা ছাড়িয়া পয়সার চেষ্টায় বড়লোকদের বাড়ীর ভিতর উঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের গৃহিণী ঝুড়ি বুনা ছাড়িল না। কেন না, পুলিশের লোকে পেশা তদন্ত লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই জ্বালাতন করিত।

রামু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় কিঙ্কর আসিয়া দেখা দিল। কিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে রামু, এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল নাকি?"

রামু উত্তর করিল, "আজ্ঞে মদটা কিছু বেশী খেয়েছিনু, তাই উঠ্‌তে একটু দেরী হয়ে গেছে।"

কিঙ্কর বলিল, "তুই আমার সঙ্গে আয়—আমাদের জানালার দুইটা জাফ্‌রি তৈয়ার করিতে হইবে—মাপ লইবি আয়।"

রামু গামছা কাঁধে ফেলিয়া কিঙ্করের পাছু পাছু চলিল।

কিঙ্কর বাড়ী গেল না—গঙ্গাতীরে একটা ছোট জঙ্গল ছিল, —সেইখানে রামুকে লইয়া গেল। লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়া কিঙ্কর চুপি চুপি অনেক কথা রামুকে বলিল। কথা-বার্ত্তা শেষ হইলে কিঙ্কর তাহাকে দুইটা টাকা দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাদের খিড়কীর বাগানে——"

রামু বলিল, "একটা কথা দু'বার বল্‌তে হ'বে না, কর্ত্তা।"

গৃহে ফিরিয়াও কিঙ্করের শান্তি নাই। বুকের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছিল; নীহারের সহিত দেখা করিল না, —সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল। যখন সূর্য্যদেব গাছের পাশে হেলিয়া পড়িল তখন কিঙ্কর খিড়কির উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। এ উদ্যানের কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।

উদ্যানে ফুলগাছ নাই; থাকিবার মধ্যে শুধু আগাছা জঙ্গল। মাঝখানে যে পুকুর আছে, তাহা একটা ডোবা বিশেষ। এই ডোবার দু'টা ঘাট ছিল। একটা ঘাটে সোহাগ দুই বেলা গা ধুইত। ডোবার পশ্চিমদিকে সোহাগের বাড়ী; পূর্ব্ব পাড়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথ।

ডোবার ধারে একটা ঝোপের ভিতর কিঙ্কর লুকাইয়া রহিল। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। কিঙ্কর জানিত, সন্ধ্যার সময় সোহাগ প্রত্যহ গা ধুইতে ঘাটে আসে। আজও আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

স্বল্পক্ষণ ঝোপের ভিতর লুকাইয়া থাকিবার পর কিঙ্করের মনে একটা ভয় জন্মিল। স্থানটা বড় নির্জ্জন— লোক সমাগমের চিহ্ন মাত্র নাই। সন্ধ্যার সময় নিস্তব্ধতা আরও যেন বাড়িয়া উঠে। কিঙ্কর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না,—সে উঠিয়া যেখানে রামু লুকাইয়া ছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দক্ষিণ পাড়ে, রামু একটা কাঁটাল গাছে উঠিয়া পক্ক কাঁটাল ভক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিল। কিঙ্করকে আসিতে দেখিয়া বলিল, "কর্ত্তা, দেখ্‌ছি তুমি গোল বাধালে ; এখন কি এ-জায়গা, ও-জায়গা ক'রে বেড়ায় ? কে কোথা হ'তে দেখে ফেল্‌বে—শীকার পলাবে, আমিও মারা যাব।"

কিঙ্কর আবার পশ্চিম পাড়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। যখন সে ফিরিয়া আসে তখন একজন তাহাকে দেখিতে পাইল। যে দেখিল, সে যমুনা। যমুনা বিস্মিত নয়নে দেখিল, কিঙ্কর একটা ঝোপের আশ্রয়ে লুকাইল। কৌতূ-

হলী হইয়া যমুনাও একটু গা ঢাকা দিল; এবং কিঙ্করের ভাব-ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যমুনার পরিধানে একখানা ছোট কাপড়, গায়ে একখানা গামছা। সে এমন সময় এই বেশে এখানে কেন আসিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

অনতিবিলম্বে সোহাগ আসিয়া এই জঙ্গলাবৃত স্থানে দেখা দিল। যে ঝোপটার ভিতর কিঙ্কর লুক্কায়িত ছিল, সেই দিকেই সোহাগকে অগ্রসর হইতে যমুনা দেখিল। দেখিয়া সে স্থির করিল—কিঙ্কর,সোহাগের অপেক্ষায় লুকাইয়া আছে। হিংসায় যমুনা ফুলিয়া উঠিল। ভাবিল,"লোকে আমায় কেন চায় না—সোহাগীকে কেন সকলেই চায়?"

নীহারকে সকল কথা জানাইয়া এই দম্পতীর প্রেমাভিনয়ে বাধা দিবার অভিলাষ যমুনার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। সে তখনই সেই বেশে ছুটিল। যেখানে ঘরের মেজেতে ধূলার উপর শুইয়া নীহার স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিল, সেইখানে যমুনা ঝড়বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং প্রফুল্ল মুখে হর্ষভরে বলিল, "তোমার স্বামীর কীর্ত্তি একবার দেখিবে এস।"

নীহার ঝটিতি উঠিয়া বসিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হ'য়েছে?"

হাত মুখ নাড়িয়া যমুনা উত্তর করিল, "কি হ'য়েছে নিজের চো'খে দেখ্‌বে এস; সে নোংরা কথা আমি মুখে আনিতে পারি না।"

নীহার উঠিয়া যমুনার অনুবর্ত্তিনী হইল। যমুনা দ্রুত-পাদবিক্ষেপে বাগানে প্রবেশ করিল। যে ঝোপের মধ্যে কিঙ্করকে ক্ষণপূর্ব্বে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, সেই ঝোপের নিকট চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চারি দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল। দক্ষিণপাড়ে অস্পষ্ট মনুষ্যাবয়ব বৃক্ষপত্র মধ্যে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্ট হইল। কাল বিলম্ব না করিয়া যমুনা সেই দিকে ধাবিত হইল। পিছু পিছু নীহারও চলিল। নিকটবর্ত্তিনী হইয়া নীহার দেখিল, কে যেন ছুটিয়া পলাই-তেছে। যে পলাইতেছিল, সে রামু ডোম। যমুনা তাহাকে চিনিল। উভয়ে আরও একটু অগ্রসর হইল। তখন এক কদর্য্য দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়ে দেখিল, কিঙ্কর ভূপৃষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছে; এবং তাহার অঙ্কোপরি সোহাগ শয়ান রহিয়াছে। সোহাগের মুখে

কাপড় বাঁধা,—কিঙ্কর তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া কোলের উপর বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিয়াছে। দেখিবামাত্র নীহার জ্ঞান হারাইল; এবং উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সোহাগের কুসুম-কোমল অঙ্গে পদাঘাত করিল। সে আঘাতে সোহাগের দেহ কাঁপিয়া উঠিল;—তাহার অঙ্ক হইতে একখানা ছোরা ও কতকগুলা লতাপাতা পড়িয়া গেল। ছোরাখানা রামুর,—পলায়ন কালে তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া গিয়াছিল।—লতাগুল্মাদি সোহাগের হস্ত পদ বন্ধনের জন্য আনীত হইয়াছিল। কিন্তু বাঁধিবার সময় হয় নাই—তৎপূর্ব্বেই নীহার আসিয়া পড়িয়াছিল।

নীহারকে দেখিয়া কিঙ্কর বুদ্ধি হারাইল,—কি করিবে, কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; উদাস নয়নে নীহারের পানে চাহিয়া রহিল। নীহার একবার বিদ্যুৎ-তুল্য দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল, একবার অঙ্ক-শায়িনী রমণী পানে কটাক্ষপাত করিল। নীহারের সেই জ্বালাময়ী, বিদ্যুন্নিক্ষেপী দৃষ্টি সন্দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কিঙ্কর, বুদ্ধি হারাইয়া সোহাগকে কোলের ভিতর আরও জোরে চাপিয়া ধরিল; এবং জালনিবদ্ধা হরিণী যেমন কালস্বরূপ ব্যাধকে সমাগত দেখিয়া আপন শাবককে দেহ-

আবরণের মধ্যে লুকাইয়া রাখে ও সন্দিগ্ধ নয়নে ব্যাধের পানে চাহিয়া থাকে, কিঙ্করও তেমনই নিজ দেহ হেলাইয়া অঙ্কশায়িতা সোহাগকে বুকের ভিতর আরও চাপিয়া ধরিল এবং সন্দিগ্ধ নয়নে নীহারের পানে চাহিয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে নীহার আরও জ্বলিয়া উঠিল; এবং কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ভূপৃষ্ঠ হইতে ছোরা উঠাইয়া লইয়া, ভৈরবী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। তাহার বসন বিস্রস্ত—কবরী-মুক্ত বেণীনিচয় পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান—চক্ষে বাড়বাগ্নি —হস্তে ভীষণ দর্শন ছোরা। সেই অস্তপ্রায় ভানুর কনক-রাগ-রঞ্জিত নৈশ গগনতলে দাঁড়াইয়া, প্রেমময়ী কোমল-প্রাণা বঙ্গকুলবধূ, প্রেমপ্রতিদ্বন্দ্বী সোহাগকে মারিতে দৃঢ়-হস্তে ছুরিকা উঠাইল। তদ্দৃষ্টে কিঙ্কর, সোহাগকে রক্ষা করিবার মানসে, তাহাকে বুকের মধ্যে আরও চাপিয়া ধরিল। তাহাতে ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল; পতনোন্মুখ ছোরা সোহাগের বক্ষে না পড়িয়া কিঙ্করের পৃষ্ঠে পড়িল। ছোরা আমূল প্রবিষ্ট হইয়া পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিল;—কিঙ্কর হতচেতন হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

নীহার স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর প্রাণশূন্য দেহপানে চাহিয়া রহিল। চক্ষে পলক

নাই, দেহে স্পন্দন নাই—স্থির দৃষ্টিতে, নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে তাহার দেহ একটু কাঁপিয়া উঠিল ;—নীহার শূন্যনয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর হতভাগিনী অট্ট অট্ট হাসে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া হাসিয়া উঠিল ; এবং হাস্য-প্রতিধ্বনি সুদূর আকাশপ্রান্তে মিলাইতে না মিলাইতে, জ্ঞানহীনা রমণী, মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কেমন ভালবেসেছি গো, কেমন বেসেছি।" ক্রমে সে চীৎকারের প্রতিধ্বনিও ডুবিয়া গেল। তখন উন্মাদিনী সেই ছুরিকা স্বামীর পৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজ বক্ষ মধ্যে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিল—তাহার প্রাণহীন দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এত বড় কাণ্ডটা হইয়া গেল। যমুনা, কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে—নীহারের কার্য্যে বাধা দিবার উপযুক্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পূর্ব্বে এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। যখন সব শেষ হইল তখন যমুনার চমক ভাঙ্গিল ; সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়া পলাইল।

সোহাগ এতক্ষণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন যমুনাকে পলাইতে দেখিল তখন সেও পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পলাইতে পারিল না,—বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

বঙ্গসংসার।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o*o—

হারাণ ও জ্যোৎস্নার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে বিশালপুর পরিত্যাগ করিয়া বধূগ্রামে চলিল। শ্বশুরালয়ে থাকিবার উদ্দেশ্যে নয়, নির্ম্মলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার অভিপ্রায়ে নয়;—স্বামীর নিকট নিজের নিরপরাধের কথা জানাইয়া চিরবিদায় লইবার জন্য বিলি আবার বধূগ্রামে চলিল। বিলির জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে—এই কোমল বয়সে তাহার সকল আশা ফুরাইয়া গিয়াছে—সকল সাধ, সকল বাসনা নিবিয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রণাময় জীবন বহিয়া ফল কি? তাই বিলি স্বামীর নিকটে চিরবিদায় লইতে চলিল।

যাইতে অনেকটা সময় লাগিল। প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া সেদিন বধূগ্রামে পৌঁছিতে পারিল না।—পরদিন অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তে নৌকা ধীরে ধীরে আসিয়া পৌঁছিল। যেন বিলির যাতনা বুঝিয়া, বিলির যাতনাভারে নিষ্পীড়িত হইয়া পানসী ধীরে ধীরে চলিল। অদূরে নির্ম্মলের অট্টালিকা-

চূড়া বিলির নয়নগোচর হইল। ক্রমে পানসী আরও নিকটবর্ত্তী হইল। যে ছাদের উপর বসিয়া বিলি স্বামীর নিকট চারিমাস পূর্ব্বে বিদায় লইয়াছিল, সে ছাদ বিলির নয়নে পড়িল। আলিসার নীচে অসংখ্য পারাবতের বাসা ছিল। বিলি সেই কপোত কপোতীদের অসংখ্য নামে অভিহিত করিয়া কত আদর করিত। তাহাদের কত খাওয়াইত, তাহাদের সঙ্গে কত গল্প করিত, তাহারা নির্ভয়ে বিলির কাঁধে, মাথায় কত বসিত, নাচিত। তাহারা এক্ষণে আলিসার উপর, ছাদের উপর কত ঘুরিতেছিল, উড়িতেছিল—বিলি তাহা দেখিল। শয়নকক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল; মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া বিলি শয্যা পালঙ্ক দেখিতে পাইল। দেয়ালের গায়ে একখানা মোটা ফ্রেমে আঁটা নলদময়ন্তীর বড় ছবি ছিল, তাহার কতকাংশ বিলির নয়নগোচর হইল। ছবির ফ্রেমের উপর বধূগ্রাম ত্যাগ করিবার দিন প্রাতঃকালে বিলি একছড়া গোলাপের মালা দোলাইয়াছিল; সে মালা ছড়া আজও সেখানে তেমনই দুলিতেছিল। তবে শুকাইয়া সুখ-স্বপ্নের বিকৃত কঙ্কাল স্বরূপ ছবিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিলি ছবি দেখিল, শুষ্ক মালা দেখিল—যেদিন তাহা পরাইয়া দিয়াছিল তাহাও

বিলির মনে পড়িল। মালা পরাইবার সময় বিলি, নির্ম্মলকে বলিয়াছিল যে, মালা শুকাইবার পূর্ব্বে সে আবার বধূগ্রামে ফিরিয়া আসিবে। মালা শুকাইয়া গিয়াছে —বিলি আসে নাই; কই, তবুত মালা কেহ ফেলিয়া দেয় নাই। বিলির চক্ষু, জলে ভাসিয়া গেল।

ধীরে ধীরে পানসি আসিয়া খিড়কির ঘাটে লাগিল। কিন্তু বিলি উঠিল না। অনেকক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া থাকিয়া বিলি, রেবতীকে বলিল "তুমি তীরে উঠিয়া বাড়ীতে যাও। অন্দরে যেও না—সদরে যাও। মার সঙ্গে দেখা করো না, আমি এসেছি শুনিলে মা এখনি ছুটিয়া আসিবেন। তিনি ডাকিলে আমিত থাকিতে পারিব না।"

আর কথা সরিল না—গণ্ড, বক্ষ বহিয়া আবার অশ্রুধারা ছুটিল। কি বলিতে যাইতেছিল তাহাও ভুলিয়া গেল। চো'খে কাপড় দিয়া অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা করিল—ক্ষিপ্রা নদীর সম্মুখে বালির বাঁধ ভাসিয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অত কাঁদছ কেন, বউদিদি? এতদিন পরে ঘরে ফিরে এলে, এখন কি কাঁদতে আছে? তুমি আমায় কি বলছিলে

আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। অন্দরে যাব না—মার সঙ্গে দেখা করব না—তবে আমি করব কি?”

প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষণপরে বিলি বলিল, “তুমি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করে গোপনে বলগে যে—যে আমি এসেছি। একবার তাঁহাকে যেমন করে পার ডেকে নিয়ে এস। যদি তিনি না আসিতে চান তা’হলে তাঁহাকে বলিও- বলিও যে, এ জীবনে আর—আর সাক্ষাৎ হ’বে না। আরও বলিও যে, আমি তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিব না—একবার দু’টা কথা ব’লে জন্মের মত চলে যাব।”

রেবতী বলিল, “ষাট, ষাট, অমন কথা বল্‌তে আছে! বালাই, জন্মের মত যাবে কেন! তোমার ঘর, দোর—তুমি চিরকাল আলো করে থাক।”

বিলি বলিল, “রেবতি, তোমাকে যাহা বলিতে বলিলাম তাহা বলিয়া এস।”

রেবতী আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল; এবং অল্পকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিল। বিলি দেখিল, রেবতী একা। হতাশ হৃদয়ে বিলি বসিয়া পড়িল।

রেবতী নিকটে আসিয়া বলিল, “বাবু বাড়ী নেই।”

তবু রক্ষা! বিলি ভাবিয়াছিল, বুঝিবা তিনি ঘৃণাভরে আইসেন নাই।

বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

রেবতী বলিল, "আনন্দপুরে।"

বিলি নীরব। হৃদয় মধ্যে সহস্রশীর্ষ জ্বালাময়ী হিংসা আবার জ্বলিয়া উঠিল। বিলি আদেশ করিল, "নৌকা ছাড়।"

মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব?" বিলি ভাবিল, "সত্যইত কোথায় যাব? এ পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায়? মরিয়া গেলেও পিত্রালয়ে আর যাব না--স্বামীর গৃহেও নয়। তবে হতভাগিনীর স্থান কোথায়? যেখানে অবিচার নাই, অধর্ম্ম নাই—অত্যাচার নাই, কুৎসা নাই, সেইখানে গিয়া এইবার জ্বালা জুড়াইব। কিন্তু—কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া—আমি যে নিরপরাধ তাহা তাঁহাকে না জানাইয়া কেমন করিয়া মরিব?"

বিলি ভাবিয়া চিন্তিয়া রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু আজ বাড়ী ফিরিবেন কি? না আনন্দপুরেই থাকিবেন?"

রেবতী বলিল, "সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।"

বিলি। তবে ক্ষণকাল ও-পারে নৌকা লাগাইয়া রাখ; তিনি ফিরিলে আবার আসিব।

রেবতী। চলো না, আমরাও আনন্দপুরে যাই?

বি। সেখানে গিয়া কি হ'বে?

রে। বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হ'তে পারে।

বি। বাবু কি নৌকায় গিয়াছেন?

রে। তা' ঠিক জানি না।

বিলি চুপ করিয়া রহিল। রেবতী আনন্দপুরে নৌকা লইয়া যাইতে মাঝিদের আদেশ করিল।

যখন অস্তগত রবির ছটা পৃথিবী ছাড়িয়া মেঘের গায় লাগিল, তখন বিলির নৌকা আনন্দপুরে পৌঁছিল। মাঝিরা লগি পুঁতিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিল। কিন্তু আরোহীরা কেহই নৌকা ত্যাগ করিল না। ঘাটে অন্য কোন নৌকা নাই, লোক নাই,—চারিদিক নীরব।

ক্ষণপরে রেবতী বলিল, "চলো না কেন, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি?"

বি। কোথায় আর বেড়াতে যা'ব?

রে। এখানে চুপ করে বসে থেকেই বা কি হবে?

বি। তুমিইত এখানে আনিলে।

রে। তাই বলছি যদি এখানে আসাই হ'ল, তবে চলো একটু ঘুরে আসি—বাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।

বি। তাঁর নৌকাত এখানে দেখ্ছি না।

রে। তিনি ঘোড়ায় এসে থাক্‌বেন।

বিলি আর কিছু বলিল না; কিন্তু নড়িলও না। রেবতী আবার বলিল, "শুনেছি সোহাগের বাড়ী ঘাটের নিকটে—বাবুও সেখানে এসে থাক্‌বেন।"

রেবতীর পানে বিলি তীব্র কটাক্ষপাত করিল; বলিল, "তুমি কি জন্য আমাকে এখানে আনিয়াছ?"

রেবতী দুইটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "যদি বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়, এই আশায় এপথে এসেছি।"

বিলি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু রেবতী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নয়। সে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মকর্দ্দমার কি হ'য়েছে, বউ দিদি?"

বিলি। কিসের মকর্দ্দমা?

রে। সেই যে দাদাবাবু ও সোহাগ নিয়ে কি একটা মকর্দ্দমা বেধেছিল।

বিলি কোন উত্তর করিল না; মকর্দ্দমার কোন

সংবাদও বিলি রাখিত না। কিন্তু রেবতী অনেক সংবাদ রাখিত। হারাণ ও জ্যোৎস্নার নিকট সে অনেক সংবাদ পাইত। যাহা জানান তাহাদের প্রয়োজন তাহাই তাহারা রেবতীকে জানাইত। তা'ছাড়া রেবতী আর কিছু জানিতে পারিত না। রেবতী বড় নির্ব্বোধ ছিল। নির্ব্বোধ না হইলে যৌবনের স্মৃতি মাত্র লইয়া যুবতী সাজিতে প্রয়াস পায়?

নির্ব্বোধই হউক, অথবা বুদ্ধিমতীই হউক, রেবতী মনে মনে একটা মতলব ঠিক করিয়াছিল। হারাণের মত বাবুর সঙ্গে বিলাসে মাতিয়া অরসিকা বিজলীর কার্য্যে তাহার আর মন ছিল না। বিলির বিষাদ মাখা, কান্নাভরা মুখখানা দেখিতে দেখিতে রেবতীর হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। সোহাগ, সুন্দরী, রসিকা—দাদাবাবু নাকি-তাহাকে লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। সোহাগের না জানি কত ধন দৌলত হ'বে—কত সুখ হ'বে। এমন মেয়ের কাছে চাকুরি করিতে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। রেবতী স্থির করিয়াছিল যে, যেমন করিয়া হউক সোহাগের নিকট চাকুরি করিতেই হইবে।

হারাণ যদি আশ্রয় দিত, তাহা হইলে রেবতীর

কোথাও চাকুরি করিবার প্রয়োজন হইত না। হারাণের গৃহ শূন্য—সুবিধাও বেশ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হারাণ তেমন নয়—সে ধরা দিয়াও ধরা দিল না। পরশু রাত্রিতে হারাণ বিলির ঘরে যে কাণ্ডটা করিল, তাহাতে রেবতী হারাণকে বেশ চিনিয়াছে। এতকাল হারাণ যখন আশা দিয়া অবশেষে নিরাশ করিল তখন তাহাকে চাকুরি করিতেই হইবে। তবে বিলির কাছে নয়—সোহাগের কাছে।

কিন্তু সোহাগের ভাব গতিক না বুঝিয়া রেবতী হাতের চাকুরি ছাড়িতে পারে না। তাই একবার সোহাগকে দেখিয়া, গোপনে দুইটা কথা কহিয়া, চাকুরি ঠিক করিবার জন্য রেবতী ব্যাকুল। বিলি যখন উঠিয়া একটু বেড়াইতে কিছুতেই স্বীকার পাইল না, তখন রেবতী বলিল, "তবে আমায় একটু ছাড়িয়া দাও—আমি একবার ঘুরিয়া আসি।"

বিলি তাহাতেও স্বীকৃতা হইল না; কেন না, বিলিকে এখনই আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া বধূগ্রামে যাইতে হইবে। রেবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "বউ দিদি, তুমিত আমার মনের কথা বুঝ না—

অনর্থক রাগ কর। আমি শুনেছি, এ গাঁয়ে সকলেই বাবুর শত্রু; তাঁহাকে মারবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে একা এ'সে বাবু ভাল করেননি—সন্ধ্যার পর থাকাও ভাল নয়। তাই একটু আগু হ'য়ে আমি দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম। তা'তুমিত যেতে দেবে না।"

রেবতীর কথাটা কি তোমার প্রাণে বিঁধিল, বিলি? স্বামীর বিপদ আশঙ্কায় প্রাণ কি একটু চঞ্চল হইল? হায়, বিলি, স্বামীর অমঙ্গলে আজও তোমার প্রাণ কাতর হয়? যাঁহার নিষ্করুণ ব্যবহারে তোমার সকলই ঘুচিয়াছে, তাঁহার ইষ্টচিন্তা আজও তোমার মনোমধ্যে স্থান পায়?

ক্ষণকাল বিলি নীরবে চিন্তা করিল। তারপর মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিল, "চল, গঙ্গার ধারে একটু বেড়াই।"

উভয়ে তীরে উঠিল। গঙ্গার ধারে কোন পথ নাই। একটিমাত্র পথ গ্রামের দিকে গিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া উভয়ে চলিল। এবং স্বল্পদূর গিয়া দেখিল, পথটা তত নির্জ্জন নয়। বিলি ঘাটের পথ ছাড়িয়া বামের সরু রাস্তা ধরিল। তিন চারি দিন পূর্ব্বে এই রাস্তায় রমেশ একবার আসিয়াছিলেন। রাস্তাটি নির্জ্জন—ঘন বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে অবস্থিত।

একটু অগ্রসর হইয়া উভয়ে দেখিল, পথের দুইধারে জঙ্গল; অন্ধকারটাও অপেক্ষাকৃত বেশী। উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সহসা দক্ষিণে দেখিল ;—একি? পুকুরের পাড়ের উপর মুক্ত স্থানে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? এ নির্ম্মল, না? নির্ম্মলের পাশে এ কার মূর্ত্তি? এই সে সোহাগ বুঝি! পাপিষ্ঠা পথ, ঘাট মানে না প্রকাশ্য স্থানে নির্ম্মলের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, নির্ম্মলের বাহুমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বিলি চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া আবার দেখিল।

বিলি মিথ্যা দেখে নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সোহাগ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যমুনা পলাইল—সোহাগ পলাইতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এই সন্ধ্যার সময়ই নির্ম্মল, সোহাগকে বধূগ্রামে লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিলেন। তদ্‌অভিপ্রায়ে নির্ম্মল, সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আনন্দপুরে আসিয়াছিলেন। গৃহে সোহাগের সাক্ষাৎ পাইলেন না। খিড়কীতে তাহার অন্বেষণে আসিয়া দেখিলেন, কনকলতিকা সোহাগ ধূলার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। তখন নির্ম্মল সযতনে সোহাগের চৈতন্য বিধান করিয়া তাহাকে বাহুপাশে ধরিয়া

লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। যখন যাইতেছিলেন তখন বিলি তাঁহাদের দেখিল।

দেখিয়া বিলির মাথা ঘুরিয়া গেল। সন্নিকটস্থ বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করিয়া বিলি একটু হেলিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই কদর্য্য দৃশ্য নয়নান্তরাল করিবার চেষ্টা করিল। বৃথা প্রয়াস! দুঃখের কথা, ভয়াবহ দৃশ্য অনপনেয় রেখায় হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত হয়; দেহের উপর অস্ত্রলেখার মত সহজে মিলায় না। বিলি চক্ষু মুছিল। মুছিয়া, গাছ, পালা, আকাশ-পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু যাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছে তাহা হৃদয় হইতে কিছু-তেই মিলাইল না। বিলি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া বসিয়া পড়িল।

রেবতী বলিল, "বউদিদি, দাদাবাবুকে দেখেছ? ঐ যে সোহাগকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। সোহাগের বেশ ছিরি হ'য়েছে। তা' হবে না কেন! ওত আমার মত গরীব দুঃখী নয়। ভাল খেতে পর্‌তে পেলেই লোকের ছিরি হয়। তুমি এখানে একটু বসো, বউ দিদি; আমি দাদা বাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রেবতী চলিয়া গেল।

বিলি সেখানে আর বসিল না। উদাস নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া বিলি বলিল, "আর কেন? এইবার তাঁহাকে না বলিয়াও মরিতে পারি।"

বিলি ফিরিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল। রেবতীর কথা বিলি এককালে বিস্মৃত হইয়াছিল। মাঝিরা ক্ষণকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিল; কিন্তু যখন সে আসিল না তখন তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বিলি কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারা অগত্যা বধূগ্রাম অভিমুখে নৌকা বাহিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বধুগ্রাম হইতে বিশালপুরে আসিতে রমেশকে উজান বহিয়া আসিতে হইল। বর্ষাকালে একটানা গাঙ্গে উজান বহা বড় সহজ কথা নয়। তবে বাতাস অনুকূল হওয়ায় রমেশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। রাত্রি দেড় প্রহ-

রের সময় বধূগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া রমেশ তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বিশালপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সদরঘাটে বজরা লাগিল। বাবু ফিরিয়াছেন, সত্বর এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দ্বারবানেরা আসিয়া বজরার সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে নিজ মহাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমেশ যেন একটু চিন্তাকুল, একটু গম্ভীর; কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটু আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

রমেশ স্নানান্তে জলযোগ করিয়া স্বীয় পাঠাগারে মখমলমণ্ডিত কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিলেন। ভৃত্য বড় কলিকায় গয়ার তামাকু সাজিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সোণার মুখনলে তামাকু টানিতে টানিতে রমেশ, স্তূপীকৃত ডাকের চিঠি একে একে খুলিতে লাগিলেন। কোনটা বা পড়িতে লাগিলেন, কোনটা বা না পড়িয়া ফেলিয়া রাখিলেন। একখানা পত্র তাঁহার মনোযোগ সবিশেষ আকর্ষণ করিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিলেন। পাঠান্তে মুখ গম্ভীর হইল। একবার দুইবার, তিনবার, বারবার সেই পত্রখানা পড়িতে লাগি-

লেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ক্রোধে, ক্ষোভে, আরক্তিম হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গুড়গুড়ির নল হাত হইতে পড়িয়া গেল।

পত্রখানার পরিচয় একটু প্রয়োজন। রমেশের পীড়িতাবস্থায় একটা শিশির ঔষধ বিকৃত বলিয়া গোল উঠিয়াছিল; রমেশ সেই শিশিটা ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। পরে আরোগ্য লাভ করিয়া সেই ঔষধের শিশি, জনৈক বন্ধুর নিকট রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাঁসপাতালের রাসায়নিক পরীক্ষকের দ্বারা ঔষধ পরীক্ষা করাইয়া বন্ধুপ্রবর পত্রোত্তর দিয়াছেন। পত্রখানি অদ্য রমেশের হস্তগত হইয়াছে। পত্রে লেখা ছিল :—

"ভাই রমেশ, দুইমাস পূর্ব্বে তোমার প্রেরিত শিশি ও পত্র পাইয়াছি। স্থানান্তরে গিয়াছিলাম বলিয়া পত্রোত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই।

* * * * *

পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষক মহাশয় স্বতন্ত্র কাগজে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম।

'এণ্টিপাইরিণ' নামক কোন তীব্র ঔষধি এই শিশির মধ্যে ছিল। প্রবল জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা উপকারী হইতে পারে; কিন্তু বিকারগ্রস্ত জীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা বিষ তুল্য। সবিশেষ পরীক্ষকের পত্রে জানিবে।

পত্র লেখা তোমার বা আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু পত্রোত্তরে একটা কথা জানাইবে কি?—এই ঔষধি পরীক্ষার কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল? ইতি"

রমেশ, বন্ধুর পত্র রাখিয়া একবার পরীক্ষকের মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর "এণ্টি পাইরিণের" গুণাগুণ তাহাতে বর্ণিত ছিল। গুণাগুণ রমেশ পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন—পড়িবার প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, পাঠ সমাপন করিয়া রমেশ নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে বিলির কথা সহসা মনে পড়িল,—তাহার শ্বাশুড়ীর নিকট কোন্ কার্য্যের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন তাহাও মনে পড়িল। তখন তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে 'দিদি বাবুকে' ডাকিয়া আনিতে রমেশ আদেশ করিলেন। দাস দাসীরা বিজলীকে 'দিদিবাবু' বলিয়া ডাকিত। দিদি বাবু বাড়ী নাই। সুতরাং কাহাকে

সে ডাকিয়া আনিবে? ভৃত্য মনে মনে প্রমাদ গণিল। সে কিছু না বলিয়া, ছুটিয়া দেওয়ানকে সম্বাদ দিল। দেওয়ান দুর্গানাম জপ করিতে করিতে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমেশ বলিলেন, "বিজুকে এখনি বধুগ্রামে পাঠাইতে হইবে—নূতন মাঝির দল প্রস্তুত হইতে বল।"

দেওয়ান কিছু বলিল না, নড়িলও না। রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলিবার আছে কি?"

নিম্ন তুণ্ডে দেওয়ান ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, বিজলী মা এখানে নাই।"

র। এখানে নাই! কোথায় তবে?

দে। তিনি বধূগ্রামে গিয়াছেন।

র। অসম্ভব। আমি সেখান হইতে এখনি আসিতেছি।

দে। তিনি গত পরশ্ব প্রত্যূষে এখান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। গত কল্য সন্ধ্যাকালে বধূগ্রামে পৌঁছিয়া থাকিবেন।

র। কিছুদিন পূর্ব্বে বধূগ্রামে যাইতে বিজলী অসম্মতা

ছিলেন; তারপর হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? অবশ্য ভিতরে কিছু আছে।

দেওয়ান কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিল। রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে? কোন কথা গোপন করিতেছ নাকি?"

দে। আপনি মনিব—আপনার নিকট কথা লুকাইতে আজও শিখি নাই।

র। তবে সব কথা খুলিয়া বল।

দে। মার উপর অত্যাচার হইয়াছিল; তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

র। বিজুর উপর অত্যাচার! কে করেছে?

দে। হারাণ বাবু।

ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া রমেশ বলিলেন, "হারাণ বাবু! হারাণ বাবু অত্যাচার করেছে!"

দেওয়ান নিরুত্তর রহিল। রুদ্রস্বরে রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি করেছে?"

দে। গভীর নিশীথে বিজু মার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

অকস্মাৎ সর্পে দংশন করিলে লোকে যেমন চমকিয়া

দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, রমেশ তেমনই চমকিত হইয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—ক্রোধে, ঘৃণায় মুখ আরক্তিম হইল—সমস্ত দেহ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। দম্ভোলি-নিক্ষেপোদ্যত ঘনীভূত জলদজাল দৃষ্টে দেওয়ান কাঁপিতে লাগিল; দুর্গানামও তাহার আর মনে পড়িল না।

ক্ষণপরে বজ্রনির্ঘোষতুল্য হুঙ্কার রবে রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারাণ এখনও জীবিত আছে?"

দে। আজ্ঞে হাঁ।

র। তোমরা তবে কি জন্য নিমক্ খাইতেছ?

দে। বিজু মা নিজেই তা'কে শাস্তি দিয়াছেন।

অতঃপর দেওয়ান সকল কথা বলিল। শুনিয়া রমেশ বলিলেন, "বিজু আত্মরক্ষা করিয়াছে মাত্র—শাস্তি দেয় নাই। শাস্তি দিবার ভার আমার উপর;—হারাণকে ধরিয়া আন।"

দে। তিনি ত এখানে নাই—কোথায় তা'ও জানি না।

র। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ অবসর গ্রহণ কর।

দে। প্রভু, দাসের অপরাধ কি?

র। তোমার অসাবধানতায় আমার বংশকে আজ এই অপমান সহিতে হইল। এক্ষণে অপরাধীকে ধরিয়া আনিবারও তোমার সামর্থ্য নাই।

দে। হুজুর, প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

র। চেষ্টায় কি না হয়? সে যখন মরে নাই, তখন তাহাকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতেও ধরিয়া আনা সহজ কাজ।

এমন সময় তথায় গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী বলিলেন, "বাবা রমেশ, তুমি আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিলাম। আমি বৃন্দাবনে চলিলাম—আর এখানে থাকিব না।"

র। তুমিও যাবে, মা? বিজু রাগ করে আমায় ছেড়ে চলে গেছে—তুমিও যাবে, মা?

গিন্নি। কি করব বাবা! যে কালনাগিনী বউ ঘরে এনেছি, কে তোমার সংসারে থাকবে, বাবা? আজ বিজুকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে তাড়ালে, কাল আমাকে হয়ত ডাইনী ব'লে তাড়াবে। মানে মানে সরে যাওয়াই ভাল।

র। কলঙ্কিনী! বিজু কলঙ্কিনী!! কে আমার বিজুকে কলঙ্কিনী বলে?

পাশের ঘর হইতে একজন উত্তর করিল, "আমি বলি।"

সকলে ফিরিয়া দেখিল,—উভয় কক্ষের মধ্যে দ্বারের উপর জ্যোৎস্না। তদ্দৃষ্টে গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। দেওয়ানও তাঁহার অনুসরণ করিল। রমেশ মুহূর্তের জন্য আত্মহারা হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে জ্যোৎস্নার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্যোৎস্না কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার বিজুকে কলঙ্কিনী বলি—একবার কেন, সহস্রবার বলি। যে কুলটা, তাহাকে কলঙ্কিনী বলিতে ডরাইব কেন? তোমার ভয়ে নয়—তোমার বিজুর ভয়েও নয়।"

রমেশ অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তোমার রসনা পাপ-কলুষিত। কিন্তু এত বড় অসত্য তুমিও জীবনে কখন বল নাই—বলিতে পারিবে তাহাও মনে স্থান দিই নাই।"

জ্যো। কেমন করিয়া জানিলে কথাটা অসত্য?

র। পৃথিবীর সকলে কলঙ্কিনী হতে পারে—আকাশের দেবদেবীরাও কলঙ্কিনী হতে পারে, কিন্তু আমার বিজু কখন কলঙ্কিনী হ'তে পারে না।

জ্যো। কবিত্ব ছাড়িয়া একটা কথার উত্তর দেও দেখি।

র। যাহা বলিবার আছে শীঘ্র বল।

জ্যো। নির্ম্মল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রিতে হঠাৎ চলিয়া গেল কেন বলিতে পার?

র। সম্ভবত তোমারই অত্যাচারে বা কৌশলে।

জ্যো। আমার অত্যাচারে! সে কি রকম?

র। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইও না—কি বলিতে চাও, শীঘ্র বল।

জ্যো। যাহা দেখিয়া নির্ম্মল তোমার পাপ-গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন——

র। যে গৃহে তুমি অধিষ্ঠাত্রী, সে গৃহ নিঃসন্দেহ পাপ-গৃহ।

জ্যো। নির্ম্মল কুমার স্বচক্ষে তোমার আদরের বিজুকে পাপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এ পাপগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন।

র। যদি তিনি তাহা দেখিয়া থাকেন তবে তিনি তোমারই ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হইয়াছেন।

জ্যো। ভাল, স্বীকার করিলাম, আমি ষড়যন্ত্র করিয়া নির্ম্মলকে প্রতারিত করিয়াছি। কিন্তু নির্ম্মল যখন বিজুকে পাপকার্য্যে নিরত দেখিয়া ধিক্কার দিলেন তখন বিজু নীরব রহিল কেন?—আত্মদোষ স্খালনের জন্য তখন বা পরে স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা জগতে প্রচার করিল না কেন?

র। কুলটারাই স্বামীনিন্দা করে।

জ্যো। কাহার উদ্দেশে এ কথা বলিতেছ?

র। তোমার উদ্দেশে।

জ্যো। কুলটা কে?

র। তুমি।

জ্যো। আমি কুলটা?

র। শুধু কুলটা কেন—তুমি পতিঘাতিনী।

বাণাহতা হরিণীর ন্যায় জ্যোৎস্না, অকস্মাৎ আঘাতে চমকিত হইয়া একটু সঙ্কুচিত হইল, একটু পিছাইয়া গেল। কোন উত্তর করিল না। রমেশ, মধ্যাহ্ন ভাস্কর-তুল্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নাকে দগ্ধ করিতে করিতে তীব্র

মর্ম্মভেদী ভাষায় ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "অপ-রাধ গোপন করিতে আর চেষ্টা করিও না, জ্যোৎস্নাবতী—আমি সকলই জানিয়াছি। আমার প্রতি তুমি সহস্র অত্যাচার করিয়াছ—তোমার সহস্র অপরাধ আমি ক্ষমা করিয়াছি। এবারও তোমাকে ক্ষমা করিতাম; কিন্তু—যে আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া ঘৃণিত বিষবিক্রেতার সাহায্যে স্বামীকে হনন করিতে প্রয়াস পায়—নারীর মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া নারীর ধর্ম্মসংহার করিতে সহায়তা করে,—বংশমর্য্যাদা পদদলিত করিয়া স্বামীর ভগ্নিকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, সে ক্ষমার অযোগ্য—দয়ার অতীত। আর নয়, জ্যোৎস্নাবতী, আর তোমার ক্ষমা নাই। কি বলিব, তুমি আমার পিতৃবংশের কুলবধূ, নতুবা——"

জ্যো। নতুবা কি করিতে ?

র। নতুবা তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম যাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখন দেখে নাই, কল্পনা করে নাই।

জ্যোৎস্নার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইল—ভয়ে নয়, লজ্জায় নয়, অনুতাপে নয়,—নিরাশায়। জ্যোৎস্নার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল—সকল আশা চূর্ণ হইল। জ্যোৎস্না

ভাবিয়া দেখিল, দোষ স্খালনের আর কোন উপায় নাই। তবু ছাড়িল না;—একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে ম্লান অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা বিকসিত করিয়া বলিল, "দেখিতেছি, এখনও তুমি রোগমুক্ত হও নাই—তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত, বিকারগ্রস্ত।"

সে কথার উত্তর না দিয়া রমেশ বলিলেন, "বৎসরেক পূর্ব্বে তোমায় ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার বাসনা কখন মনে জাগে নাই—সম্প্রতি সেটা জাগিয়াছে। বিবাহ করিলেও তোমায় আশ্রয়চ্যুত করিতাম না। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, তাহা হিন্দুমহিলাতে দেখিব বলিয়া জ্ঞান ছিল না। যে পতিদ্বেষী, বংশমানাপহারী তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আজ হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল—তুমি এখনি এ গৃহ ত্যাগ কর।"

বলিয়া রমেশ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
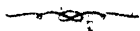
যখন আনন্দপুর ছাড়িয়া বধূগ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল তখন বিলির চমক ভাঙ্গিল। সম্মুখে, ধূসর বরণ আকাশের গায় সমুন্নত প্রাসাদচূড়া দেখিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায় এসেছি?"

দ্বারবান বলিল "বধূগ্রামে।"

"এখানে কেন আবার?—নৌকা ফিরাও।"

মাঝিরা এ কথায় বিশালপুরে ফিরিয়া যাইবার আদেশ বুঝিল। ভাল মন্দ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা উত্তরাভিমুখে চলিল।

তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। আঁধার রাশি গঙ্গার গর্ভ হইতে চুপি চুপি উঠিয়া জাহ্নবীর উপকূল ছাইয়া ফেলিয়াছে—যেন দিক্ দিগন্তকে চাপিয়া ধরিয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিতেছে। সব অন্ধকার। ক্রমে জাহ্নবী নিজেও অন্ধকার মধ্যে লুকাইল।

বিলির নৌকায় দীপ জ্বলিতেছিল। আকাশ স্থানে

স্থানে মেঘাচ্ছন্ন—পৃথিবী নিষ্প্রভ। ক্রমে রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল মেঘও তত ঘনীভূত হইতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে বাতাসও উঠিল। মাঝিরা দুইখানা ক্ষুদ্র পাল তুলিয়া একটু সাবধানতার সহিত চলিল। নৌকা জল কাটিয়া—শূন্য-মস্তিষ্ক অহঙ্কৃত ধনীর ন্যায়—বাতাস মাথায় বাঁধিয়া গর্ব্বচাঞ্চল্যে তীরবেগে ছুটিল।

বিনি ঘুমায় নাই; ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে শুইয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। মনে মনে স্থির করিল, "এবার নিশ্চয় মরিব। কিন্তু কেমন করিয়া মরিব? যদি জলে ডুবিয়া মরি, জীবনান্তে লোকে আমার দেহ দেখিবে, —শব সনাক্ত করিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক আসিয়া আমার বিকৃত দেহ নাড়িবে চাড়িবে। যদি বিষ খাইয়া বা গলায় দড়ি দিয়া মরি, তা'তেও নিস্তার নাই;—দেহ লইয়া পুলিসে টানাটানি, ডাক্তারে কাটা-কাটি করিবে। তা', মনে হ'লে লজ্জায় প্রাণ এখনি কাঁপিয়া উঠে। তবে কি করিয়া মরিব? যদি আগুনে পুড়িয়া মরি? পুড়িয়া মরিলে দেহের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না—সব ছাই হইয়া যাইবে। সেই ভাল; পোড়াইয়া এই দেহ ছাই করিব। কিন্তু—কিন্তু আত্মহত্যায় ন

অধর্ম্ম নাই? পাপ নাই? আমি কি করিতেছি তা'ত বুঝিতে পারিতেছি না। ভগবান, আমি জ্ঞানহীনা, অন্ধ, প্রাণের যাতনায় অধীর হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি ভুলিয়াছি, প্রভু! আমায় পথ দেখাইয়া দেও, দয়াময়!

গলদশ্রুলোচনে বিলি ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। ডাকিতে ডাকিতে মন কতকটা শান্ত হইল। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নৌকা সমানই চলিতেছে। তবে মেঘ ও অন্ধকার যেন আরও একটু গাঢ়—বাতাস যেন আরও একটু প্রবল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মাঝিরাও অদৃশ্য হইল।

এমন সময় মাঝিরা পিছনে একটা শব্দ শুনিতে পাইল। একটু উদ্বিগ্ন চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। শব্দ যখন নিকটতর হইল তখন মাঝিরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, এক খানা অপেক্ষাকৃত বড় নৌকা বড় পাল তুলিয়া সোঁ সোঁ শব্দে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি হালে ছিল সে, দীপ তুলিয়া ধরিতে দাঁড়ীকে আদেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পিছনের শব্দ আরও নিকট-বর্ত্তী হইল। তখন মাঝিরা চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার থামিতে না থামিতে পিছনের নৌকা প্রবলবেগে

তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কোলাহল, একটা সঙ্ঘর্ষণ শব্দ।—তার পর সব স্থির,—উভয় নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ডুবিয়া গেল।

পিছনের নৌকার আরোহী হারাণ।

হারাণ বিশালপুর হইতে বরাবর বিলির অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। সে যখন দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যা-কালে বধূগ্রামের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বিলি চলিয়া গিয়াছে—তা'র কিছু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। ঘাটে আসিয়া হারাণ বিলির নৌকা খুঁজিল, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। তখন সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তীরে উঠিল।

তীরে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। জমিদার বাবুর অট্টালিকা পানে লক্ষ্য রাখিয়া হারাণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু জনপ্রাণী কোথাও দৃষ্ট হইল না। ঘাটে নৌকা নাই, তীরে মানুষ নাই। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া হারাণ নৌকায় আসিয়া বসিল।

ক্ষণপরে দেখিল, কে যেন ঘাটে নামিয়া নৌকার দিকে আসিতেছে। যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন হারাণ তাহাকে চিনিল। চিনিবামাত্র, নৌকা হইতে নামিল।

আগন্তুক রেবতী। আনন্দপুরে সে বিলির সঙ্গ ছাড়িয়াছে। রেবতী সোহাগদের বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে যেমনটা দেখিবে মনে করিয়াছিল, তেমনটা দেখিতে পায় নাই। সুতরাং হাতের চাকুরির মায়া কাটাইতে না পারিয়া বিলির নৌকার পাছু পাছু ডাঙ্গা পথে ছুটিয়া আসিতেছিল।

হারাণের নৌকাখানা বিলির পান্‌সি বলিয়া রেবতীর ভ্রম হইল। কিন্তু সত্বরই সে ভ্রম ভাঙ্গিল। নিকটে আসিয়া দেখিল,—সম্মুখে হারাণ।

হারাণকে দেখিয়া রেবতী বলিল, "তুমি এখানে কেন, হারাণ বাবু?"

হারাণ। তুমিই বা এখানে কেন, রেবতী বাবু?

রে। আমি বউদিদির খোঁজে এসেছি।

হা। তবে তিনি বাড়ীতে আসেন নাই?

রে। না।

হা। আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম।

রে। কি ভেবেছিলে?

হা। তিনি এ বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবেন না।

রে। কেন?

হা। সে অনেক কথা। এখন বল দেখি তোমার বউ দিদি কোথায় ?

রে। তুমি কি তাঁর খোঁজে এখানে এসেছ ?

হা। তা' নইলে কি তোমার খোঁজে এ'সেছি ?

রে। তবে আমি কোন কথা বলব না।

হা। না বল, গঙ্গায় ডুবায়ে মারব।

রে। আমি চীৎকার করে লোক ডাকব।

হা। লোক আসিবার পূর্ব্বে তোমায় ডুবাইয়া অন্ধকার মধ্যে লুকাইতে পারিব।

রেবতী ভাবিয়া দেখিল, সেটা ঠিক কথা। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; সাহায্য করিতে পারে এমন মানুষ" কোথাও নাই। তখন সে ভীত হইয়া যাহা জানিত, তাহা বলিল। হারাণ স্থির করিল, বিজলী বিশালপুরের দিকে গিয়াছে। তখন সে কাল বিলম্ব না করিয়া লম্ফত্যাগে নৌকায় উঠিল। যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন রেবতী বলিল, "আমি এখনি বাবুকে সকল কথা ব'লে দেব—তোমাকে পয়জার পেটা করিয়ে ছাড়্‌ব।"

হারাণ উত্তর করিল, "তুমি আমাকে অপমানের ভয়

দেখাইতেছ? লোকনিন্দা, সমাজ-শাসন, মৃত্যুভয় সকলি এখন ভুলিয়াছি। আমায় ভয় দেখান মিছা।"

অন্ধকার ভেদ করিয়া হারাণ উত্তরাভিমুখে নৌকা ছুটাইল। মাঝিকে সরাইয়া নিজে হালে বসিল। নৌকা চালনায়, সন্তরণে হারাণ সবিশেষ দক্ষ। এমন দক্ষতা গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী অধিবাসীদের অনেকেরই ছিল। হারাণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে—মেঘ, অন্ধকার, বিপদসম্ভাবনা গ্রাহ্য না করিয়া নক্ষত্রগতিতে ছুটিল। কিন্তু উত্তর-মুখী পান্‌সি কোথাও দৃষ্ট হইল না। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারমধ্যে দেখাই বা কেমন করিয়া মিলিবে? কেমন করিয়া মিলিবে হারাণ তাহা জানিত।

হারাণ জানিত যে, উজান বহিয়া যাইতে হইলে কিনারা ধরিয়া যাইতে হয়। কিনারায় স্রোত তত প্রবল নয়। বধূগ্রাম গঙ্গার পশ্চিমকূলে; তথা হইতে উত্তরাভি-মুখে যাইতে হইলে পশ্চিম কূল ধরিয়াই সচরাচর লোকে গিয়া থাকে। হারাণ তাই পশ্চিম দিকের কিনারা ধরিয়া চলিতেছিল।

হারাণ জানিত, প্রত্যেক গমনশীল নৌকাতে আলো থাকে। হারাণের নৌকাতে একটা আলো ছিল। বিলির

পান্‌সিতেও থাকিবার সম্ভাবনা। এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হারাণ সম্মুখে আলো খুঁজিতে খুঁজিতে কিনারা ধরিয়া চলিল।

মাঝিরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু হারাণের নিদ্রা নাই, আলস্য নাই;—হাল ধরিয়া সে সমান চলিয়াছে। রাত্রি যখন তিন প্রহর, তখন হারাণ সম্মুখে একটা আলো দেখিতে পাইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, একটা নৌকার উপর আলো জ্বলিতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হারাণ দুইখানা পাল তুলিয়া দৃঢ় হস্তে হাল ধরিল। নৌকা আরও ছুটিল; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্রগামী নৌকাকে অতিক্রম করিয়া দূরে দাঁড়াইল। অতিক্রমকালে হারাণ কি দেখিল জানি না, কিন্তু সে দূরে দাঁড়াইয়া নিজের নৌকার আলো নিবাইয়া দিল। পরে পাল গুটাইয়া নৌকা দক্ষিণমুখে ফিরাইল। ফিরিয়া আবার পান্‌সির পিছনে আসিল। একবার একটু গুছাইয়া কাপড় পরিল—মোটা দড়ি দিয়া হাল কষিয়া বাঁধিল; তার পর চারিখানা পাল তুলিয়া হারাণ ঝড়বেগে সম্মুখের নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সজ্ঘর্ষণের ফলাফল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন শব্দ

থামিয়া গেল—কোলাহল ডুবিয়া গেল, তখন সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে বিভীষিকাময় নীরবতা মন্থন করিয়া কে চীৎকার করিয়া বলিল, "বিজলি, আমার সর্ব্বস্ব, কোথায় তুমি ?"

উত্তর হইল, "আবার এ'সেছ ? সুনাম, শান্তি ঘুচাইয়াও তৃপ্ত হও নাই ? আর কি চাও, পিশাচ ?"

"তোমায় চাই।"

"জন্ম জন্মান্তরেও পাবে না।"

"এখনি তা' দেখা যাবে।"

"তবে ডুবিলাম।"

বিলি একখানা ভাঙ্গা কাঠ ধরিয়া ভাসিতেছিল, সেটা ছাড়িয়া দিয়া ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে হারাণও ডুবিল। ক্ষণ-পরে হারাণ উঠিল। কিন্তু বিলি কোথায় ? চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া হারাণ, বিলিকে খুঁজিল, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। বিলি মনে করিয়া ভ্রম বশতঃ কখন একখানা ভাঙ্গা কাঠ ধরিল—কখন বা স্রোততাড়িত মাঝির দেহ জড়াইয়া ধরিল। নিরাশ হইয়া হারাণ, ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিজলি, বিজলি !" কেহ সাড়া দিল না। হারাণ আবার ডুবিল,—গঙ্গার

তলদেশ পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। এবার অনেকক্ষণ ডুবিয়া রহিল। যখন উঠিল, তখন তাহার বাহুমধ্যে বিজলি। বিজলি জ্ঞানশূন্যা। হারাণ তাহার অচৈতন্য দেহ টানিয়া আনিয়া তীরে উঠাইল।

যখন হারাণ তীরে উঠিল তখন পূর্ব্বাকাশ পরিস্কার হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভগ্ন নৌকার চিহ্নমাত্র নাই; মাঝিরাও নয়নগোচর হইল না। পিছনে ফিরিয়া দেখিল; দেখিল, উচ্চ পাহাড়। বিলির দেহ কাঁধের উপর লইয়া, হারাণ ঘুরিয়া পাহাড়ের উপর উঠিল।

বিলির চৈতন্যোৎপাদনের কোন চেষ্টা হারাণকে করিতে হইল না; আপন হইতেই তাহার সংজ্ঞা হইল।

জ্ঞান সঞ্চার হইলে বিলি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সম্মুখে হারাণ। তখন সকল কথা তাহার মনে পড়িল—সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। হারাণ বলিল, "এখানে বোতল নাই, দাদা নাই, কে তোমায় রক্ষা করিবে, বিজলি?"

বি। ধর্ম্ম।

হা। ধর্ম্মকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার।

বি। তুমি কি মনে কর যে, ধর্ম্ম তোমার মত পশুর ক্রীড়া-সামগ্রী?

হা। ক্রীড়া-সামগ্রী কি না, তার পরিচয় এখনি পাবে!

বি। যে ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করে—ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা তোমার মত পশুর সাধ্য নয়।

হা। প্রাণটা কি সহজে কেহ দিতে পারে? তোমার জন্য প্রাণ দিতে আমি শতবার পারি; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য পারি না।

বি। যে পশু, সে পারিবে কেন?

হারাণের সহিত তর্ক করিয়া কিছু সময় লওয়া বিলির উদ্দেশ্য। হারাণ যখন উত্তর প্রত্যুত্তরে ব্যস্ত তখন বিলি ধীরে ধীরে পিছাইয়া পাড়ের ধারে আসিতে লাগিল।

হারাণ বলিল, "ধর্ম্মটা কিছুই নয়—একটা অলীক কল্পনা মাত্র।"

বি। কল্পনাই হউক, সত্যই হউক, ধর্ম্মবল তুল্য সংসারে কিছুই শক্তিশালী নাই।

বিলি আবার একটু পিছাইল।

হা। ধর্ম্ম যদি এ যাত্রা আমার হাত হ'তে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে তা' হ'লে বুঝিব, ধর্ম্ম আছে – ধর্ম্মের শক্তি আছে।

বি। তোমার জন্মিবার বহুপূর্ব্বে অনেকেই ধর্ম্মের বল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বলিতে বলিতে বিলি আর একটু পিছাইল; এবার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল —আর একপদ পিছাইলেই নীচে গঙ্গা।

বিলির দিকে অগ্রসর হইয়া হারাণ বলিল, "ধর্ম্ম আজ তোমায় রক্ষা করিতে পারে?"

বি। সহস্র উপায়ে পারে।

হা। একটা উপায়ই আগে দেখা যাক্।

বি। তবে দেখ।

কথা শেষ হইতে না হইতে বিলি গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারাণ ছুটিয়া পাড়ের ধারে আসিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল বিলি যেখানটায় পড়িয়াছিল সেইখানটার জল চক্রে চক্রে ঘুরিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতেছিল। হারাণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিল; কিন্তু কোথাও বিলিকে দেখিতে পাইল না। ক্ষণকাল স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে লম্ফত্যাগে গঙ্গাবক্ষে পড়িবার উদ্যোগ করিল। এমন সময় পিছন হইতে কে এক জন ছুটিয়া আসিয়া হারাণের গলায় গামছা বাঁধিয়া আঁটিয়া ধরিল। হারাণ চমকিত হইয়া—জানি না কোন আশায় প্রলুব্ধ হইয়া—বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বিজলি নয়—নৌকার জনৈক মাঝি। হতাশ হইয়া হারাণ আবার গঙ্গাপানে চাহিল।

মাঝির বাড়ী বিশালপুরে; রমেশের প্রজা। বাবুর সম্বন্ধীর আদেশে নৌকা লইয়া আসিয়াছিল। সেই নৌকার এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই। তাহার বিশ্বাস, হারাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক নৌকা ডুবাইয়াছিল। কেন ডুবাইয়াছিল, তাহাও কতকটা এক্ষণে বুঝিল। মাঝি বলিল, "লা ডুবিয়েও ক্ষান্ত নস্, পাজি! আবার বাবুর বুনের উপর অত্যাচার! আজ তোর নিস্তার নেই; সকলে মিলে লাথিয়ে তোর মুখ ছিঁড়্‌ব—তার পর জমীদারকে ব'লে তোকে ফাটক দেব।"

দুই নৌকার মাঝিরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া জমীদার-ভগ্নীর অনুসন্ধান করিতেছিল। হারাণের আক্রমণকারী চীৎকার করিয়া

তাহাদের ডাকিল। ডাক শুনিয়া অনেকে আসিল। তখন সকলে মিলিয়া হারাণকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল। কিন্তু হারাণ নড়িল না,কথা কহিল না;—কেহ প্রহার করিতেছে তাহাও অনুভব করিল না; কেবল গঙ্গাপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জাহ্নবীবক্ষ স্থির—বীচিমালা অরুণকিরণ-প্রতিভাত। অনেক দূরে দুই এক খানা নৌকা দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভাসমান মনুষ্যদেহ কোথাও দৃষ্ট হইতেছে না। হারাণ উন্মত্ত দৃষ্টিতে গঙ্গাপানে চাহিতে চাহিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় একবার ছাড়িয়া দাও—গঙ্গার ভিতর একবার খুঁজিয়া আসি।"

মাঝিরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না,—হারাণকে বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার সকলে মিলিয়া বিজলীকে খুঁজিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাঝিরা সেদিন বিশালপুরে পৌঁছিতে পারিল না—পরদিন প্রাতে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া জমীদারের সম্মুখে হারাণকে হাজির করিল। রমেশ তখন কাছারী গৃহে জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অনেক দিন তিনি কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন নাই—কতকটা বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি এক্ষণে অবিরাম পরিশ্রম করিতেছেন ; অথবা চিন্তারাশি ডুবাইবার অভিপ্রায়ে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

হারাণকে দেখিবামাত্র রমেশের ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে তোমরা কোথায় পাইলে?"

মাঝিরা তাহাকে যেখানে যেরূপ অবস্থায় পাইয়াছিল তাহা বলিল। সকল কথা বলিয়া অবশেষে বিজলির আত্ম-হত্যার কথাও বলিল।

রমেশের মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিজু নাই!

বিশ্বাস করিতে রমেশের প্রবৃত্তি হইল না। সে কোমল-প্রাণা, পাপশূন্যা বালিকা মরিতে পারে, রমেশ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সকল কথা শুনিয়াও আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজু, বধুগ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে?"

মাঝিরা বলিল, "আজ্ঞে, না—"

রমেশ নীরব, স্তম্ভিত। হায়! তবে কি সত্যই বিজু নাই? এক গভীর শ্বাসে রমেশের সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মনকে বুঝাইতে না পারিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার - আমার বিজু—আমার ভগ্নী কই? সে আসিল না?"

একজন মাঝি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আজ্ঞে, তানাকে কুনু ঠাঁই খুঁজে পেলুমনি।"

ভূকম্পনে যেমন বসুধা কাঁপিয়া উঠে—রমেশের সমস্ত দেহ একবার তেমনই কাঁপিয়া উঠিল। অন্তর্বিপ্লবে নদী-বক্ষ যেমন স্ফীত হইয়া উঠে রমেশের হৃদয় তেমনই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রমেশ শোকে অভিভূত হইলেন। মস্তক বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল; যেন বৃক্ষচূড়া বাত্যাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কক্ষে দেওয়ান, কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকেই ছিল।

প্রভুর নীরব যাতনা দেখিয়া একে একে সকলেই নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। কেবল দেওয়ান নড়িল না—হারাণও সরিল না! দেওয়ানের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিতেছিল হারাণের শুষ্ক চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। কিন্তু উভয়েই নীরব; বিভিন্ন ভাব হৃদয়ে লইয়া উভয়ে নীরব।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। অনেকক্ষণের পর রমেশ ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—হারাণ। রমেশের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল - পাঁজর, বুক একবার ফুলিয়া উঠিল; তারপর সব স্থির। রমেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "হারাণ, সাত আট বৎসর তোমাদের সহিত কুটুম্বিতা হইয়াছে। এই সাত আট বৎসরের মধ্যে কখন তোমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিয়াছি?"

হা। স্মরণ হয় না।

র। কখন আমার নিকটে কোন উপকার পাইয়াছ?

হা। শতবার পাইয়াছি।

র। তবে হারাণ, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে কেন?

হা। সর্ব্বনাশ করিয়াছি! কিসে করিলাম?

র। কিসে করিলে তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সংসারে যেটুকু আমার সুখ ছিল, যেটুকু আমার আনন্দ ছিল, যেটুকু আমার স্নেহের বন্ধন ছিল, তাহা তুমি নষ্ট করিয়াছ; আমার হৃদয়ের উৎসাহ, আশা নিবাইয়া দিয়াছ; আমার তেজ, গর্ব্ব, বংশাভিমান ঘুচাইয়াছ; আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি আমার কি করিলে?

হা। রমেশ বাবু, এইটুকু অপরাধের জন্য এতটা অনুযোগ! তবে তুমি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ তাহা আমি কি বলিয়া বুঝাইব?

র। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি?

হা। হাঁ, তুমি রমেশ বাবু, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।

র। আমি কবে তোমার কি করিয়াছি?

হ। কবে কি করিয়াছ শুনিতে চাও? যখন আমি পাপ কাহাকে বলে, ভালবাসা কাহাকে বলে জানিতাম না—যখন সৌন্দর্য্যের মাদকতা, পাপের কল্পনা, আমার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তখন একদিন সহসা তোমার শয্যাপার্শ্বে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্যরাশি একত্রিত দেখিলাম। দেখিয়া, মজিলাম—ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বিবেচনা শূন্য হইলাম—সেই সৌন্দর্য্যরাশি হৃদয়ে ধরিবার আশায় উন্মত্ত

হইলাম। তুমি আমার প্রবৃত্তির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলে। বাধা পাইয়া প্রবৃত্তি শতগুণ তেজে ফুলিয়া উঠিয়াছিল;—ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের ন্যায় তোমাকে সরাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

হারাণ একটু থামিল; একবার একটু বিশ্রাম লইয়া আবার বলিতে লাগিল, "তোমার চেয়ে নির্ম্মল আমার পক্ষে তীক্ষ্ণতর কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মলের প্রতি বিজলির গাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি, সীমাহীন বারিধি মধ্যে প্রভাত নক্ষত্রের ন্যায় বিজলিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে অনুরাগ, সে ভক্তি নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। জালচিঠি লিখিয়া, মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মলের প্রতি বিজলীর অনুরাগ ধ্বংস করিলাম। কিন্তু ভক্তি অধ্বংসনীয় দেখিয়া বিজলীকে ছাড়িয়া নির্ম্মলের দিকে ফিরিলাম; অতুলনীয়া বিজলীর চরিত্র কলঙ্কমণ্ডিত করিয়া নির্ম্মলের সম্মুখে ধরিলাম। নির্ব্বোধ নির্ম্মল, ভ্রাতা ভগ্নীর কৌশলে ভুলিয়া, দেবীলাঞ্ছিতা লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীকে কুলটা ভাবিয়া ভারগ্রস্ত হৃদয় লইয়া পলাইল।"

হারাণ আবার থামিল; অতীতের একটা দৃশ্য তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সেই ঝড় বৃষ্টিময়ী কৃষ্ণবসনা

নিশিতে, তাড়িতকিরণোদ্ভাসিত উদ্যান মধ্যে, বারিসিক্ত দামিনীলতা তুল্য অচৈতন্য বিজলীর রূপরাশি, স্মৃতি বক্ষে ভাসিয়া উঠিল। হারাণ মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া অতীতের সেই স্মৃতিটুকু বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই সহস্র বৃশ্চিকদংশন তুল্য যাতনায় জ্বলিয়া উঠিয়া আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় অনলরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে বলিল, "কা'র দোষে আমার প্রবৃত্তি দিন দিন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তা' জান, রমেশ বাবু? তোমার দোষে। তুমি আমার পায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া মহা প্রলোভন আমার সম্মুখে ধরিয়াছিলে কেন? তুমি আমার মনের অবস্থা জানিয়াও আমাকে গৃহবহিস্কৃত করিয়া দেও নাই কেন? বিজলিকে আমার সান্নিধ্য হইতে অপসৃত কর নাই কেন? এ মহা প্রলোভনের সম্মুখে আমি স্থির থাকিতে পারি নাই বলিয়া কি আমার অপরাধ? যদি তাই হয় তবে যিনি প্রলোভন সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অবিবেচক; আর যে আমার সম্মুখে প্রলোভন ধরিয়াছিল, সেও মূর্খ ও অপরিণামদর্শী। তোমার এই অপরিণামদর্শিতার ফলে আমার কি হই-য়াছে জান? আমার সকল সুখের আধার স্মৃতিটুকুও

বিষময় হইয়াছে। যখনি আমি তাহাকে ভাবি, তখনই আপনা হ'তে মনে পড়ে যে, আমিই তাহাকে মারিয়াছি—আমার বজ্রস্পর্শে সে অপাপবিদ্ধা কুসুমলতিকা শুকাইয়া গিয়াছে। সে আত্মগ্লানির সঙ্গে আমার কি যাতনা হয় তা'—যে জগতে কাহাকেও ভালবাসে নাই, জ্ঞানতঃ কাহারও সর্ব্বনাশ করে নাই—সে কি বুঝিবে? সে তুলনায় তোমার যাতনা অতি সামান্য! তুমি তাহাকে ভাবিতে পার—আমি তা' পারি না; তুমি তার জন্য কাঁদিতে পার—আমি কাঁদিতেও পারি না। তুমি তাহার এক একটি স্মৃতি লইয়া আদর করিতে পার—আমি তা' পারি না। তাহাকে ভাবিতে গেলে অব্যক্তব্য যন্ত্রণায় হৃদয় ফাটিয়া যায়; কিন্তু না ভাবিয়াও থাকিতে পারি না। তোমারই কার্য্যফলে আমার জীবন, যেরূপ নরক যন্ত্রণা তুল্য জ্বালাময় হইয়াছে—সেরূপ শাস্তি বুঝি মানুষের কল্পনায়, ভগবানের কল্পনায় কখন আসে নাই। তবু আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রমেশ বলিলেন, "তুমি মহাপাপিষ্ঠ—তোমার মুখ দর্শনেও পাপ; তুমি দূর হও—এদেশে আর আসিও না।"

হারাণ বলিল, "সে কি, রমেশ বাবু? তুমি আমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিবে? তোমার না লেঠেল আছে?—গুপ্ত জেলখানা আছে? তুমি না সেখানে বদ্‌মায়েস প্রজাদের ঠেঙ্গাইয়া মার? তবে আমায় ছাড়িয়া দিতেছ কেন? তোমার লেঠেল ডাক—আমায় খোঁচাইয়া মার।"

রমেশ বিস্মিত হইয়া হারাণের মুখপানে চাহিলেন; পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চাহি না—ভগবান তোমাকে শাস্তি দিবেন।"

হা। ভগবানের সাধ্য কি? সে ত ক্ষমতাহীন জড়-পিণ্ড মাত্র। যদি তার সামর্থ্য থাকিত, তা'হলে যে ত্রিভুবনে সকলের চেয়ে পবিত্র, সকলের চেয়ে সুন্দর, তা'কে আজ সে জলে ডুবাইয়া মারিত না—আমার মত পাপিষ্ঠের নির্য্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিত।

র। এখন বুঝিয়াছ তুমি পাপিষ্ঠ? তবে আর আমায় বিরক্ত করিও না—এখান হইতে দূর হও।

হা। তবু আমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিতেছ? এ বিশ্ব সংসারে যে তোমার একমাত্র স্নেহবন্ধন ছিল, পবিত্রতায় যে তোমার বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিল, আমি

তাহাকে মারিয়াছি—তাহার চরিত্র কলঙ্কিত করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি।—তোমার সংসারে থাকিয়া বিশ্বাসঘাতকতায় তোমার উপকারের প্রতিদান দিয়াছি—নিরপরাধ নির্ম্মলের জীবন বিষময় করিয়াছি। তবু তুমি আমাকে শাস্তি দিবে না? তুমি কি মানুষ নও? তোমার কি তেজ নাই? শোকে অভিভূত হইয়া কি মনুষ্যত্ব ভুলিয়াছ? যদি তুমি পশু না হ'য়ে মানুষ হও—তোমার স্বর্গগত ভগ্নীর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার লেঠেল ডাক—আমায় মার—আমার হৃদয়টা টানিয়া, ছিঁড়িয়া পদতলে মথিত কর। ঐ দেখ—ঐ শুন, আকাশ থেকে তোমার ভগ্নী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "হারাণকে মার—মহাপাপিষ্ঠ হারাণকে পুড়াইয়া মার;—যে আমার মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছে, জাল চিঠি লিখিয়া আমার প্রতি স্বামীর অনুরাগ নষ্ট করিয়াছে, প্রতারণা করিয়া স্বামীর চক্ষে আমাকে কলঙ্কিনী সাজাইয়াছে, ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছে, অবশেষে আমায় জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে, সেই হারাণকে মারিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লও; আমাকে যেমন জ্বালাইয়াছে, তেমনি তাহাকে

জ্বালাইয়া, পুড়াইয়া মার।” ভগ্নীর সকাতর চীৎকারেও কি তোমার তেজ জাগিয়া উঠে না? নির্জ্জীব, নিস্তেজ হৃদয়েও কি প্রাণের সঞ্চার হয় না? চো'খে জলধারা! এখন কি কাঁদিবার সময়? আগে শত্রু মার, অপমানের প্রতিশোধ লও—তা'র পরে সমুদ্রের জল চো'খে নিয়ে চিরকাল ধরে কাঁদ।

রমেশ উত্তর করিলেন না। দেওয়ান, হারাণকে ধরিয়া কক্ষ বাহিরে লইয়া আসিল; এবং দ্বারবান সঙ্গে দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্নে নির্ম্মল কুমার ব্যাকুলান্তঃকরণে বিশালপুরে ছুটিয়া আসিলেন। রমেশ তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। অনেক কথা হইল; কিন্তু বিজলীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল না। রমেশ জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তুমি এত কথা কেমন করিয়া জানিলে, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল। দুই দিন আগে রেবতীর কাছে শুনিয়াছি।

রমেশ। রেবতী সকল কথা জানে না। যদিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—পত্র ডাকে না দিয়া হারাণকে দিয়া আসিত, তথাপি সে সকল কথা অবগত ছিল না।

নির্ম্মল। রেবতা যাহা অবগত আছে তাহাই যথেষ্ট। তাহার নিকট দু' চারিটী কথা শুনিয়াই আমার সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তুমি যে কথা বলিতেছ—

রমেশ। আমি কোন্ কথা বলিতেছি?

নির্ম্মল। পত্রগুলা জাল—

রমেশ। হাঁ—বলিয়া যাও।

নির্ম্মল। যদি সত্যই জাল হয়—

রমেশ। এখনও সন্দেহ? তবে পরীক্ষা করিবে এস।

উভয়ে উঠিলেন। যে কক্ষে বিলি শুইত, উভয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বার তালাবদ্ধ ছিল;

চাবি বাহির করিয়া রমেশ ধীরে ধীরে চুপি চুপি কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। যেন ঘরের ভিতর কে নিদ্রিত আছে—শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে, রমেশ তাই চুপি চুপি দ্বার খুলিলেন। খুলিয়া, পীঠ স্থানে দেবীমন্দিরে লোকে যেরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করে, রমেশ সেইরূপ রুদ্ধ শ্বাসে ধীরে ধীরে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কক্ষের যে জিনিসটী বিলি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল সে জিনিসটি সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দেওয়ানের হুকুমে কেহ কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করে নাই। মেজের উপর বোতল চূর্ণও তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানটায় কাচ-চূর্ণ পড়িয়াছিল, সেখানটায় রক্তের দাগও অল্পাধিক পরিমাণে আজও লাগিয়া রহিয়াছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন। নির্ম্মল এই কক্ষে পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণের ভিতর যেমন আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল তেমনটা পূর্ব্বে আর কখন করে নাই। নির্ম্মলের বোধ হইল যেন কক্ষমধ্যে বিজলির নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শ্রুত

হইতেছে—যেন বিজলির সৌগন্ধময় নিশ্বাসে কক্ষ তখনও আমোদিত। শয্যার অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলের মনে হইল, যেন এই মাত্র বিলি শয্যা ত্যাগ করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া একটা অপ্রাপ্য সুখের আশায় নির্ম্মলের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল।

রমেশ, বাম হস্তে নির্ম্মলের কর স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে বোতল চূর্ণ দেখাইয়া বলিলেন, "এই কাচ-চূর্ণ এখানে কেন, জান? ক্ষণপূর্ব্বে তুমি আমায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলে,এই কাচ-চূর্ণ তাহার উত্তর প্রদান করিতেছে। যাহার পবিত্রতায় তুমি সন্দিহান হইয়া তোমার ও তাহার জীবনের সুখ নষ্ট করিয়াছ, তাহারই তেজ, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মবলের সাক্ষ্য স্বরূপ এই চূর্ণ রাশি এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।"

নির্ম্মলও এইরূপ কিছু কিছু রৈবতীর নিকট শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশ যখন ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন তখন নির্ম্মলের মনে আনন্দ ও গর্ব্বের সঞ্চার হইল। রমেশ বলিলেন, "এস, যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম তাহা দেখিবে এস।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া রমেশ পাশের ঘরে প্রবেশ

করিলেন। সেটা বিলির বসিবার ঘর। বিলি সেখানে দিবসে বসিত, শুইত; পত্রাদি লিখিত পড়িত। এ ঘরে বিলির একটা ছোট বাক্স ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রমেশ সেই বাক্সটি নির্ম্মলের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই আধার মধ্যে কতকগুলি পত্র ও তোমার একখানি ছবি আছে। পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, সকল গুলি তোমার লিখিত কি না।"

সুদীর্ঘকাল পরীক্ষার পর নির্ম্মল বার তের খানা পত্র কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বলিলেন, "এরূপ পত্র আমার দ্বারা লিখিত হওয়া কোন প্রকারে সম্ভব নয়।"

রমেশ। যে সকল পত্র পাইয়া তুমি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলে, সে সকল পত্র বিজলির দ্বারা লিখিত হওয়া সম্ভব কি না একবার ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

নির্ম্মল। প্রথমে তাহা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এমনি ধাপে ধাপে পরদায় পরদায় পত্রের সুর চড়িয়াছিল যে, চিঠির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার হেতু বা অবসর পাই নাই।

রমেশ। যে কৌশলে তুমি ভুলিয়াছ, সে কৌশলে একটি বালিকা ভুলিবে তাহা আর বিচিত্র কি? সে কথা

যাক্। পত্রগুলা কৃত্রিম কিনা তাহার আরও প্রমাণ দেখিতে চাও? ভাল, এদিকে এস!

সে মহল ত্যাগ করিয়া হারাণ যে ঘরে থাকিত, উভয়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কক্ষও তালা বন্ধ ছিল; চাবি খুলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটা আলমারি হইতে এক তাড়া পত্র লইয়া রমেশ নির্ম্মলের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "পত্রগুলি পড়িয়া দেখ—তোমার ও বিজুর অপহৃত পত্রনিচয় দেখিতে পাইবে।"

বিজলির লিখিত পত্রগুলি নির্ম্মল একে একে পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে নির্ম্মলের চক্ষু ফাটিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল। একখানা পত্রে লেখা ছিল,—"আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না—আর কিছু জানিতে শিখি নাই। তোমার আদর আমার জীবন—অনাদর আমার মৃত্যু। তোমার পায়ে পড়ি এমন কঠিন পত্র লিখিয়া আমায় মারিও না। যে তোমার আশ্রিতা, সেবকানুসেবিকা তাহাকে বজ্রাঘাতে মার কেন?——"

নির্ম্মল আর পড়িতে পারিলেন না—পত্র ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষোভে, ধিক্কারে, অনুতাপে হৃদয়

জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "আর কিছু দেখিতে চাই না, রমেশ বাবু; আমি চলিলাম।"

র। কোথায় যাইতেছ?

নি। বিজলীর কাছে।

র। দাঁড়াও—একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয় নাই।

নি। কি কথা?

র। তোমাকে মিথ্যা বলা হইয়াছে,—বিজলী মামার বাড়ী যায় নাই।

নি। তবে কোথায় গিয়াছে?

র। বিজলী এ সংসারে আর নাই—স্বর্গের ফুল স্বর্গে গিয়াছে।

নির্ম্মল কথাটা ঠিক, বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র শেষ কথার প্রতিধ্বনি তুলিলেন, "স্বর্গে গিয়াছে!"

র। হাঁ, স্বর্গে গিয়াছে; ধর্ম্মরক্ষার্থে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

নি। ডুবিয়া মরিয়াছে! মিথ্যা কথা। সে আমায় না বলিয়া, আমায় না জানাইয়া মরিতে পারে না।

র। জানাইবার সময় পাইল কই?

নি। তুমি স্থির জানিবে, রমেশ বাবু, বিজলি মরে নাই। সে মরিতে পারে না—মরা অসম্ভব। স্বর্গের পারিজাত কোন্ অপরাধে ফুটিবার পূর্ব্বে শুকাইয়া যাইবে? অপরাধী আমি, তবে সে মরিবে কেন?

র। অপরাধ তোমার—সহস্রবার তোমার; তোমারই নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ বিজলিকে হারাইলাম।

নি। ক্ষমা কর, রমেশ বাবু, আগে বিজলিকে খুঁজিয়া আনি—তারপর তোমার কথা শুনিব।

এমন সময়ে দেওয়ান ব্যস্তভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং ব্যাকুলতার সহিত বলিল, "বাবু, এইমাত্র একটা বড় সুসম্বাদ পাইলাম।"

রমেশ বলিলেন, "আর কি সুসম্বাদ থাকিতে পারে, দেওয়ান? সুখের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে।"

দেওয়ান বলিল, "বিজলি মার দেহ অন্বেষণার্থে গঙ্গার দুই কূল ধরিয়া লোক ছুটাইয়াছিলাম। কতক লোক নৌকাপথে গিয়াছিল। যাহারা ডাঙ্গাপথে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়া এইমাত্র আমাকে একটা সম্বাদ দিল—"

রমেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি—কি সম্বাদ দিল ?"

দেওয়ান বলিল, "যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার মনে আশা জন্মিয়াছে যে, বিজলি-মা জীবিত আছেন। তবে তিনি কোথায় কোন্ দেশে ও কিরূপ অবস্থায় আছেন তাহা জানিতে পারি নাই।"

নির্ম্মল বলিয়া উঠিলেন, "শুনিলে, রমেশ বাবু ?— বিজলি বাঁচিয়া আছে। আমি চলিলাম ;—এ বিশ্ব সংসার মধ্যে যেখানেই সে লুকাইয়া থাকুক আমি তাহাকে খুঁজিয়া আনিব। যদি না পাই, তাহ'লে - তাহ'লে রমেশ বাবু, তুমি আমার অনাথা মাকে দেখিও।"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে নির্ম্মল অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণপরে রমেশও বিজুলির অন্বেষণে অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——০•০——

পাড়ের উপর হইতে যেখানটায় বিলি লাফাইয়া পড়িল সেখানটায় জল কিছু বেশী। সচরাচর উচ্চ পাড়ের নীচে জল কিছু গভীর হয়। এখানটাতেও তাই। উচ্চ হইতে সবেগে গভীর জলে পড়িয়া বিলি মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। তলস্পর্শ করিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বে স্রোত সাহায্যে বিলির দেহ একটু দূরে নীত হইল। যখন বিলি মাটীতে দাঁড়াইয়া মাথা তুলিল তখন মাথায় একটা আঘাত লাগিল। একটু সরিয়া আবার মাথা তুলিল; এবার কোন বাধা পাইল না।

বিলি ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, মাথার উপর উচ্চ পাহাড় স্তম্ভহীন বারাণ্ডার মত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাড়ের তলদেশে, অবিরাম স্রোত তাড়নে মৃত্তিকারাশি ক্ষয় হইয়া একটা গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গহ্বরের ভিতর বিলি আকণ্ঠ নিমজ্জন করিয়া বসিল। উপর হইতে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না।

এই অবস্থায় বিলি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ক্রমে ক্লান্তি ও শৈত্যে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তখন বিলি ভাবিল, "আর পারি না—এইবার মরি।" আবার ভাবিল, "না, আত্মহত্যা করিব না—আত্মনাশে মহাপাপ। পাপের কথা আগে ভাবি নাই, বুঝি নাই—এখন শিখিয়াছি। যখন জীবমাত্র নাশেই পাপ, তখন আত্মনাশে পাপ হ'বে না কেন?"

আত্মহত্যা যে মহাপাপ, সেটা বিলি স্থির করিল। অতঃপর ভাবিল, "তবে এখন আমি করি কি? কোথায় যাই? কোথায়—আশ্রয় পাই? দাদার কাছে যাইতে পারি; কিন্তু কি উপায়ে সেখানে যাব? হারাণ কি এখনও উপরে আছে? নিশ্চয় আছে,—সে জল স্থল পাতি পাতি করিয়া আমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কপাল দোষে শত্রুও কি এমন প্রবল জুটিয়াছিল? হা ভগবান্, শেষে কি আত্মহত্যা না করাইয়া ছাড়িবে না?"

বিলি কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িল বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া বিলি ডাকিল, "ভগবান, সব হারাইয়া তোমার দ্বারে আজ দাঁড়াইয়াছি। এতদিন

তোমায় ডাকি নাই—ডাকিবার অবসরও পাই নাই। যে বিশ্বাস নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি, দেখিও প্রভু, যেন সে বিশ্বাস, সে ভক্তি বিনষ্ট না হয়।"

গণ্ড বহিয়া ঈশ্বর-উদ্দেশে আঁখিধারা ছুটিল। নয়নের ক্ষুদ্র স্রোত, জাহ্নবীর অনন্ত স্রোতে মিশিয়া অনন্ত দেবের চরণোদ্দেশে ছুটিল। চক্ষুর জল না মুছিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে, আকাশপানে চাহিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ অপরাধে, কোন্ পাপে এই বালিকা বয়সে এত যাতনা পাইতেছি, দয়াময়?"

মাথার উপর গর্জ্জনশীল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নিম্নে কলনাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গা, মধ্যে অদৃশ্য অথচ হুঙ্কারনাদী বায়ু। এই শব্দতরঙ্গ উচ্ছ্বাসিত করিয়া বিলি কাতর কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে ডাকিল, "অনাথের নাথ, দীনবন্ধু, কোন্ অপরাধে এই বালিকা বয়সে এত যাতনা পাইতেছি, প্রভু?" পঞ্চভূতে সেই ক্ষীণ কণ্ঠ মিলাইয়া গিয়া আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি উঠিল। বিলি শুনিল, জলস্থল ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভৈরব নিনাদে কে যেন উত্তর করিল, "তুমি পাপিষ্ঠা,—তুমি স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছ—বিশ্বাস হারাইয়া স্বামী ছাড়িয়া আসিয়াছ।"

বিলি শিহরিয়া উঠিল। এ কথাত বিলির মনে আগে জাগে নাই। বিলি করযোড়ে আকাশপানে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষুধায়, শীতে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে—আর বেশীক্ষণ আমি বাঁচিব না; এ সময় একটা কথার উত্তর দেও, প্রভু—একটা কথা আমায় বুঝাইয়া দেও, দয়াময়। বল, নারায়ণ, যে বিশ্বাসহন্তা, তাকেও কি বিশ্বাস করিতে হইবে?"

পঞ্চভূত বিদীর্ণ করিয়া আবার স্পষ্ট ভাষায় উত্তর আসিল,—"বিশ্বাসহন্তার বিচারক ভগবান, তুমি নও তুমি তোমার কর্ত্তব্য পথে, ধর্ম্ম পথে স্খলিতপদ হও কেন?"

উত্তর শুনিয়া বিলির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তখন তাহার বসিবার বা দাঁড়াইবার শক্তি নাই—মাথা টলিতেছে—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বুঝিয়াছি, আমি মহাপাপিষ্ঠা; এ পাপ হ'তে মুক্ত হবার উপায় নাই কি, নারায়ণ!"

"আছে।"

"কি উপায়?"

"প্রায়শ্চিত্ত।"

"প্রায়শ্চিত্ত কি? মৃত্যু?"

"না।"

"তবে কি?"

"অনুতাপ।"

বিলি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি তাঁকে পাব, দয়াময়?"

এবার বিলি কোন উত্তর পাইল না। ক্ষীণতর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামীকে আর কি কখন দেখিতে পাইব, প্রভু?"

সে ক্ষীণকণ্ঠ বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। এবার প্রতিধ্বনি উঠিল না—কোন উত্তরও আসিল না। উত্তর অপেক্ষায় বিলি সকাতরে আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে শৈত্য ও দুর্ব্বলতায়, শ্রান্তি ও প্রাণের রুদ্ধ যাতনায় অবসন্ন হইয়া বিলির হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িল;—তাহার অচৈতন্য দেহ স্রোততাড়নে ভাসিয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্রোততাড়নে ভাসিয়া গেল বটে, কিন্তু বিলি মারল না। তাহার ভাসমান দেহ জনৈক বৃদ্ধ ধীবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীবর সন্নিকটে ডিঙ্গি লইয়া মাছ ধরিতে-ছিল। সে ঐ ভাসমান দেহ দেখিতে পাইবামাত্র জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিলিকে ডিঙ্গিতে উঠাইল। বৃষ্টিস্নাত পদ্মফুলের ন্যায় বিলির মুখখানি দেখিয়া ধীবর ভক্তি-গদগদ হইল। ভাবিল, বুঝি বা গঙ্গাদেবী হইবেন। জাল ছাড়িয়া বুড়া সযত্নে বিলিকে গৃহে আনিল। আগুনের তাপে, দুগ্ধ পানে ক্রমে বিলির চৈতন্য সঞ্চার হইল।

দশ পনর দিন বিলি শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। ধীবরের জীর্ণ পর্ণ কুটীরে জীর্ণ ও মলিন শয্যায় শুইয়া বিলি দিন কাটাইতে লাগিল।

ধীবর ও তাহার পত্নী প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া বিজলীকে প্রণাম করিত। বিজলী একদিন ধীবর-পত্নীকে জিজ্ঞাসা

করিল, "আমাকে প্রণাম কর কেন?—আমিত ব্রাহ্মণ-কন্যা নই।"

ধীবর-পত্নী উত্তর করিল, "দেবতা হ'লেই তানাকে পেন্নাম কর্‌ব।"

বিজলী বুঝিল, এ প্রণাম তাহাকে নহে—তাহার রূপকে। সংসারে যাহার রূপ আছে সেই দেবতা—যাহার ধন আছে সেই সমাজনেতা। রূপ, মুখোস পরিয়া জগতের পূজা লুঠিয়া বেড়ায়—ধন, দরিদ্র দলন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই মুখোসের দিনে গুণ, বংশ-মর্য্যাদা ভাসিয়া গিয়াছে।

বিলি যখন উঠিতে পারিল তখন ধীবরের গৃহ ত্যাগ করিতে বাসনা করিল। কিন্তু ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে বিলি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছে।

বিলি দুর্ব্বল—পথ হাঁটিবার শক্তি নাই; তবু বিলি পথ হাঁটিয়া বধূগ্রাম অভিমুখে চলিল। বধুগ্রাম এক্ষণে তাহার তীর্থক্ষেত্র। সেই পুণ্যময় ধামে পাপ প্রক্ষালন করিতে বিলি পথ হাঁটিয়া চলিল। যে কুসুমদল-বিনিন্দিত কোমল চরণযুগল অলক্তকে রঞ্জিত হইয়া মর্ম্মর প্রস্তর

রিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলের শোভা বর্দ্ধন করিত, আজ সেই চরণ যুগল তৃণ-কঙ্কর-কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। পদ্মনিহিত মধুভ্রমে যে ঘর্ম্মবিন্দু মুখ-পঙ্কজ হইতে আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বসন্তানিল ছুটাছুটি করিত, আজ সে ঘর্ম্মবিন্দু ভানুতাপে শুখাইয়া যাইতে লাগিল। যে কমলদললাঞ্ছিত অঙ্গে পুষ্পালঙ্কারও ম্লান হইত, আজ সে অঙ্গ মলিন, বিশুষ্ক, ধূলিধূসরিত। বিলি কখন পথ হাঁটে নাই - পথের কষ্ট কখন অনুভব করে নাই; একটু হাঁটিয়াই বিলি অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

যে পথ লোকে এক বেলায় অতিক্রম করে সেই পথ বিলি পাঁচ দিনে গেল। যে পথে ভূতের ভয়ে লোকে দিবসে একাকী চলে না, সেই পথে বিলি একাকিনী অন্ধকার নিশীথে চলিতে লাগিল। যে জঙ্গলে লোকে দস্যুভয়ে দিবসে প্রবেশ করে না, সেই জঙ্গলে বিলি ভয়-শূন্য হৃদয়ে রাত্রি অতিবাহিত করিল। যে আলোটুকু বিলি দেখিয়াছে সেই আলোটুকু বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে এক্ষণে ভয়-ভাবনা শূন্য হইয়াছে।

দিবসে পথ হাঁটা বড় জঞ্জাল। যে দেখে সেই দু'কথা বলে। প্রাচীনারা পরিচয়প্রার্থী হইয়া উত্তর না পাইলে, গলায় কলসী বাঁধিয়া মরিতে অযাচিত উপদেশ দেয়—প্রৌঢ়ারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—যুবতীরা হাসে—যুবকেরা পাছু লয়। দেখিয়া শুনিয়া বিলি দিবসে পথ-হাঁটা ছাড়িয়াছে। কোন দেবমন্দিরে অথবা কোন গৃহস্থের গৃহে বিলি দিবসে আশ্রয় গ্রহণ করিত ও পথ জানিয়া লইত; সন্ধ্যা সমাগমে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিত। তা' যত অন্ধকার, যত ঝড়বৃষ্টি হউক না কেন, বিলি গ্রাহ্য করিত না।

বিলি নৌকারোহণে গেল না কেন? কঙ্কণ বেচিয়া মাঝিকে ভাড়া দিতে পারিত। কিন্তু বিলি তাহা করিল না, পদব্রজেই চলিল বুঝিবা তীর্থদর্শনাভিলাষীর পদব্রজে যাওয়াই অধিকতর গৌরবাত্মক। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে। বিলির মনের চাঞ্চল্য এত বাড়িয়াছে যে, সে কোথাও মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তার বুকের ভিতর যেন কি একটা অনল জ্বলিতেছে; সেই দাহে, সেই জ্বালায় অস্থির হইয়া বিলি দুর্ব্বল ও অবসন্ন দেহকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত। পথ হাঁটিলে জ্বালা একটু কমে, স্থির হইয়া বসিলে দাহ বাড়ে।

গোপালপুর নামক কোন গ্রামে আসিয়া বিলি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভাবিল, সেইখানে দুই দিন থাকিবে। কিন্তু যেমন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বিলি আর স্থির থাকিতে পারিল না,—উন্মত্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "না, না, কোথাও দাঁড়াব না ; সেইখানে গিয়া সেই চরণে এই বোঝা নামাইয়া তবে দাঁড়াইব। দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলেই কি আমি দাড়াইতে পারি? আমার সাধ্য কি! কে যেন আমার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

বোঝা নামাইতে বিলি ছুটিল। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বিলি বধূগ্রামের নিকটবর্ত্তিনী হইল। একদা সন্ধ্যার পর নদীর পাড়ের উপর দিয়া পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে। লজ্জা-ভয়-বিবর্জ্জিত, চিন্তাশূন্য হৃদয় লইয়া, সম্মুখে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া বিলি নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিলি ক্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল,—পথ আর হাঁটিতে পারে না ; ধূলিকর্দ্দমময় পথের উপরই বিলি শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া বিলি করযোড়ে ডাকিল, "কোথায় আছ প্রভু, একবার দেখা দেও। তোমায় দেখিবার

আশায়—তোমাকে প্রাণের কথা বলিবার আশায় ছুটিয়া আসিয়াছি; কিন্তু—কিন্তু দেখা বুঝি আর হ'ল না—আশা বুঝি আর মিটিল না। এইখানে—আমার তীর্থযাত্রার পথমধ্যে বুঝি জীবনের অবসান হ'ল।" বিলির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল—আঁখি বহিয়া অবিশ্রান্ত জল গড়াইতে লাগিল।

এমন সময় সহসা মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বিলি বিদ্যুৎ-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহে যেন নবশক্তি সঞ্চারিত হইল। সে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল। তখন পূর্ব্বশ্রুত কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট শুনা গেল। কণ্ঠ বিলির পরিচিত, মুহূর্ত্তে বিলি তাহা চিনিল। চিনিতে পারিবামাত্র বিলির সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—বিলি বসিয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল গঙ্গার ধার ধরিয়া অশান্ত প্রাণে পদব্রজে ছুটিয়াছেন। সঙ্গে অনুচর নাই, ভৃত্য নাই—অর্থ নাই, আহার্য্য নাই। নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অনাহারক্লিষ্ট,

রোরুদ্যমান নির্ম্মলকুমার বিলির অন্বেষণে শ্রাবণের বারি-ধারা মাথায় ধরিয়া—কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল মথিত করিয়া আকুল হৃদয়ে ছুটিয়াছেন।

দু'দিন, দশ দিন, কত দিন পথে পথে কাটিয়া গেল নির্ম্মল তাহা অবগত নহেন। কোন দিন আহার জুটিল, কোন দিন জুটিল না। কোন রাত্রি লোকালয়ে আশ্রয় জুটিল, কোন রাত্রিতে তরুতলই আশ্রয়স্থল হইল। প্রাতে উঠিয়া নির্ম্মল গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন; ক্লান্ত হইলে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন। কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি দয়া করিয়া তাঁহাকে আহার্য্য দিলে তবে তাঁহার আহার হইত। কেহ যাচিয়া আশ্রয় দিলে, তবে তাঁহার আশ্রয় মিলিত; নতুবা অনাহারে বারিসিক্ত তরুতলে শ্রাবণের ধারা মাথায় ধরিয়া রাত্রি কাটাইতেন।

নির্ম্মলের পায়ে পাদুকা নাই,—কোথায় কবে ছিন্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছে, নির্ম্মলের তাহা স্মরণ নাই। গায়ে উত্তরীয়, পিরাণ কিছুই নাই,—কণ্টকাঘাতে ছিন্ন হইয়া একটু একটু করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে। পরিধানে একখানি বস্ত্র, তাহাও ছিন্নভিন্ন, মলিন, কর্দ্দমাক্ত। চরণতল ক্ষত বিক্ষত, রুধিরাক্ত; অঙ্গ মলিন, ধুলিধুসরিত;

কেশ রুক্ষ, কৰ্দ্দমলিপ্ত। অনাহারে, অনিদ্রায়, পূর্ণ আশা হৃদয়ে ধরিয়া নির্ম্মল বিলির অন্বেষণে অবিরাম ছুটিয়াছেন।

গভীর জঙ্গল দেখিয়া নির্ম্মল তন্মধ্যে ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিতেন। ভাবিতেন, বুঝিবা বিলি জঙ্গল মধ্যে লুকাইয়াছে। তন্ন তন্ন করিয়া জঙ্গল খুঁজিতেন। খুঁজিতে খুঁজিতে হয়ত একদিন কাটিয়া যাইত। অকৃতকার্য্য হইলেও নির্ম্মল হতাশ হইতেন না। পাপিয়ার আর্ত্তনাদ, দোয়েলের গান, কোকিলের স্মৃতিজাগান ধিক্কার শুনিয়া বিলির কণ্ঠধ্বনি বলিয়া নির্ম্মলের কখন কখন ভ্রম হইত; জঙ্গলমধ্যে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শুনিয়া বিলির পদশব্দ বলিয়া কখন কখন মনে হইত; বৃক্ষপত্রোন্মুক্ত শুভ্র চন্দ্র-কর-স্পৃষ্ট বৃক্ষকাণ্ড দেখিয়া কখন কখন বিলির চন্দ্রবিভা-সমোজ্জল দেহ বলিয়া ভ্রম হইত। কল্লোলিনীর কুলু কুলু ধ্বনি শুনিয়া নির্ম্মল কখন কখন বিলির হাস্যরব মনে করিয়া সেই দিকে ছুটিতেন। বৃষ্টি অবসানে, বৃক্ষপত্র হইতে পত্রান্তরে জল পড়িলে বিলি কাঁদিতেছে-বলিয়া কখন কখন নির্ম্মলের ভ্রম হইত।

সময়ের হিসাব নাই—সুপথ কুপথ জ্ঞান নাই—আহার নিদ্রার প্রতি দৃষ্টি নাই, নির্ম্মল একটীমাত্র লক্ষ্য লইয়া

অবিরাম ছুটিয়াছেন। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁ গা, এপথে কাহাকেও যেতে দেখেছ গা?" উত্তরে কেহ বলে, "একটা জেলেকে যেতে দেখেছি।" কেহ বলে, "এইত বাপু তোমায় দেখ্‌ছি।" গ্রামের ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এ গ্রামে কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখেছ?" উত্তরে কেহ তামাসা করে—কেহ গালি দেয়। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল।

একদিন মধ্যাহ্নে নির্ম্মল কুমার গঙ্গার ধার দিয়া পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় একজন পথিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসাবাদে নির্ম্মল জানিলেন যে, একটি অপরিচিতা বালিকা কোথা হইতে আসিয়া গোপালপুর গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপালপুর কোথায়?"

পথিক বলিল, "ও পারে।"

মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া নির্ম্মল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বিস্মিত পথিক মুখব্যাদন ও চক্ষু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এবং সে এতক্ষণ যাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, সে ব্যক্তি পাগল কিনা সে বিষয়ে তাহার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। সন্দেহটা মীমাং-

সিত হইবার পূর্ব্বেই সে দেখিল, নির্ম্মল সন্তরণে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া অপর পারে উঠিলেন।

তীরে উঠিয়া নির্ম্মল গোপালপুর গ্রামের অনুসন্ধান করিলেন। সহজেই সন্ধান মিলিল। নির্ম্মল তথায় বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। উত্তরে বুঝিলেন যে, বিলি তথায় একদিন ছিল, কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কোন্ দিকে গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না।

নির্ম্মল নবোৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও দুই চারিদিন কাটিয়া গেল। এই কয় দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পরও যখন বিলির সন্ধান কোথাও মিলিল না, তখন নির্ম্মলের উৎসাহ নিবিয়া আসিল, দেহও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। চলিবার সামর্থ্য হারাইয়া নির্ম্মল সন্নিকটস্থ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রামখানি নদীর পাড়ের উপর। নির্ম্মল, গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেন না; পদদ্বয় শিথিল ও অবশ হইয়া আসিল,—নির্ম্মল তখন গঙ্গাতীর-স্থিত এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মলের দুইদিন আহার হয় নাই—দুই রাত্রি নিদ্রা হয় নাই।

পাগলকে ডাকিয়া কে আহার দিবে? কে যাচিয়া আশ্রয় দিবে? নির্ম্মলের পদতল কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত—গাত্র মলিন, কর্দ্দমাক্ত—ধূলিধূসরিত কেশগুচ্ছ ললাট আচ্ছাদন করিয়া মুখের উপর পড়িয়াছে। গায়ে বস্ত্র নাই—কোমরে কেবল একটুখানি নেকড়া মাত্র আছে। মাথায় আচ্ছাদন নাই—পায়ে পাদুকা নাই। ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের ন্যায় মুখকান্তি আতপ তাপে শুখাইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। এ বেশে কে নির্ম্মলকে চিনিতে পারে? কে তাঁহাকে পাগল না বলিয়া থাকিতে পারে?

নির্ম্মল যখন কথিত তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিশি অন্ধকারময়ী। গগন মেঘাচ্ছন্ন—পৃথিবী তমসাবৃত। আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও আলো পরিদৃষ্ট হইতেছে না। গাছ পালা, নদী সৈকত, আকাশ পৃথিবী সকলই অন্ধকারে লুকাইয়াছে। পৃথিবী স্থির, স্তব্ধ; কিন্তু নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ নয়। তরঙ্গ গর্জ্জনে, ঝিল্লীরবে, শব্দায়মান বায়ুস্তরের আলোড়নে, পৃথিবী কথা কহিতেছে; বৃক্ষপত্রের আন্দোলনে—মেঘের অধীরতায়—নদীর চাঞ্চল্যে, ধরিত্রী নিশ্বাস ফেলিতেছে। সেই স্তব্ধ প্রকৃতির কোলে শুইয়া, বৃক্ষকাণ্ডের উপর মাথা

রাখিয়া,আকাশ পানে চাহিয়া নির্ম্মল জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে. ছিলেন।

নির্ম্মল কখন অস্ফুট স্বরে বিলিকে ডাকিতেছিলেন, কখন বা সোহাগ ভরে তাহাকে আদর করিতেছিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে তিনি সহসা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কই, আমার সর্ব্বস্বধন, কোথায় তুমি— এই যে তুমি আমার সাম্‌নে ছিলে! মুহূর্ত্ত কালের জন্য দেখা দিয়া কোথায় লুকাইলে? অনেক দিনের পর—যুগ যুগান্তরের পর তোমায় একবার চকিতের মত দেখিতে পাইয়াছি। তোমায় ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে তোমায় বুঝিবার পূর্ব্বে বিদ্যুতের মত মেঘের আড়ালে কেন সহসা লুকাইলে? আকাশের কোলে—অন্ধকারের অন্তরালে কোথায় লুকাইয়াছ, আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। যেখানে থাক নামিয়া এস—আমার কাছে এস। আমি তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি—প্রাণ ভরিয়া স্পর্শ করি—আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তোমায় নিয়ে খেলা করি। একবার এস—আরও নামিয়া এস—আরও কাছে এস, আমার হৃদয়ে এস, আমাতে মিশাইয়া যাও। মরি মরি! তুমি কি সুন্দর! তোমার এত রূপ, বিলি? একি,

সহসা কেন তুমি সহস্র, কোটি, অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হ'য়ে আকাশ, পৃথিবী ছাইয়া ফেলিলে? যে দিকে তাকাই সেই দিকেই যে তুমি! আকাশে তুমি, মেঘে তুমি— গাছে তুমি, জলে তুমি। সকলি যে তোমাতে লুকাইয়াছে—সকলি যে তোমাতে মিশাইয়া গিয়াছে; পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, সৌরমণ্ডল সকলি যে তোমাতে লুকাইয়াছে। আমি যে তোমায় ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমার অন্তরে, তুমি আমার বাহিরে। একি, আমিও যে তোমাতে মিশাইয়া গিয়াছি! আমি স্ত্রী, না পুরুষ? আমি বিলি না নির্ম্মল? আমি কে?"

উন্মত্তবৎ নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আঁধার আকাশ, আঁধার পৃথিবী—আঁধার নদী, আঁধার গাছ সকলই অদৃশ্য হইল—অন্ধকার তিরোহিত হইল। ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ,' সহস্র সূর্য্যকিরণসদৃশ আলোক ছটায় সহসা যেন উদ্ভাসিত হইল। সেই অনন্ত আকাশ জুড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিজলির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মলের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিলি, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, এতদিন পরে তোমায় পাইলাম। মান অভিমান, ভোগবিলাস, লজ্জা সরম

সব ছাড়িয়া তোমায় পাইলাম। জীবনে মরণে, আর কখন তোমায় ছাড়িব না—জীবনে মরণে আর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে না। এবার তোমায় হৃদয় মধ্যে পূরিয়াছি, এবার তোমাতে আমি মিশাইয়া গিয়াছি।" বলিতে বলিতে নির্ম্মল চৈতন্যশূন্য হইয়া পাহাড় হইতে নদীসৈকতে পড়িয়া গেলেন।

নির্ম্মলের চৈতন্য এককালে বিলুপ্ত হয় নাই ; সুষুপ্তি জাগরণের মাঝামাঝি নিদ্রা-সহচরী মোহ কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া নির্ম্মল বালুকার উপর পড়িয়া রহিলেন। তদ্রূপ অবস্থায় নির্ম্মল এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, যেন অনন্ত আকাশপটে চিত্রিত বিলির উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল—যেন নামিয়া আসিয়া নির্ম্মলের পদপ্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মল ঘুমঘোরে আধ ফুটন্ত সোহাগমাখা স্বরে বলিলেন, "বিলি, এসেছ? এতদিনে দয়া হ'ল ?"

নির্ম্মল তখনও মোহাচ্ছন্ন—যেন ঘুমঘোরে মুদিতনয়নে সকল দেখিতেছিলেন। ক্রমে মোহ ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, নিদ্রা, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল;—তিনি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে স্থাবর জঙ্গম, আকাশ পৃথিবী,

কলনাদিনী ভাগীরথী, একে একে ধীরে ধীরে নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। দূরের জিনিষ দেখিয়া অবশেষে কোলের পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পদপ্রান্তে সত্যই বিজলি। তখন নির্ম্মলকুলার নদীসৈকত প্লাবিত করিয়া, প্রেমময়ী জাহ্নবীর জল উচ্ছ্বসিত করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বিলি, হৃদয়েশ্বরি, হৃদয়ের ধন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, এসেছ?"

একটী রমণীমূর্ত্তি নির্ম্মলের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। অশ্রুজলে চরণদ্বয় সিক্ত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু, স্বামিন্, দেবতা!" আর কথা সরিল না। নির্ম্মল আবেগভরে তাহাকে হৃদয়ে উঠাইয়া লইলেন। তখন বায়ুহিল্লোলে পতাকার ন্যায় তাঁহার দেহ কাঁপিতেছিল; বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। ওষ্ঠ কাঁপিয়া কেবল মাত্র ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইল, "বিলি, বিলি আমার!"

নবম পরিচ্ছেদ।

—০—

নির্ম্মল অনেক দিনের পর বাটী ফিরিলেন। অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিয়া অন্নপূর্ণা আনন্দে অধীর হইলেন; কত আদর করিলেন, কত অশ্রুজল মোচন করিলেন, কত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক কথার পর নির্ম্মল একটু অবসর পাইয়া বলিলেন, "মা!"

অন্ন। কি বাবা?

নি। এনেছি।

অন্ন। কি এনেছ, বাবা?

নি। কি পেলে সুখী হও, মা?

অন্ন। আমার বউমাকে।

নি। তেমন সুখী কি আর কাউকে পেলে হও না?

অন্ন। না, বাবা। তেমন সুখী আর কিছুতেই হই না।

নি। তবে তাঁকেই এনেছি।

অন্ন। কাকে? বউমাকে?

নি। হাঁ, মা।

অন্ন। কই—কোথায় আমার বউমা?

নি। ঘাটে—নৌকায়।

উন্মাদিনীর মত অন্নপূর্ণা ছুটিলেন। খিড়কি ঘাটে নৌকা ছিল। বিলি নৌকায় বসিয়া তাহার বহুকাল পরিত্যক্ত গৃহপানে চাহিয়াছিল। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া গিয়া বিলিকে বুকে টানিয়া লইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া যখন প্রাণ একটু শান্ত হইল, তখন অন্নপূর্ণা বিলিকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "মা আমার, ঘরের লক্ষ্মী আমার, তোমার অভাবে যে আমার ঘর নিবে আছে, মা। এস মা, আমার আঁধার ঘর আলো করিবে এস।"

শাশুড়ী হাত ধরিয়া বধূকে গৃহে আনিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামে প্রচার হইল যে, বিজলি পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিবামাত্র পাড়ার মেয়েরা ছুটিয়া দেখিতে আসিল। বিলি সকলকে দেখিল, কেবল সোহাগের সাক্ষাৎ পাইল না। সে আনন্দপুরে ছিল; এক্ষণে সেইখানেই থাকে। কেদার জেঠা উপযাচক হইয়া তাহাকে পৈতৃকভিটায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার পিতার

যাহা কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা দানপত্রের দ্বারা হেমকে অর্পণ করিয়াছেন। সকল ফিরাইয়া দিয়া তিনি এক্ষণে সত্যসত্যই বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

বিলি, সোহাগকে আনাইল—ছাড়িল না। হাস্যমুখী সোহাগ আসিয়া আনন্দময়ী বিজলিকে প্রণাম করিল। বিজলি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে শয়ন কক্ষে প্রস্থান করিল।

সোহাগ বলিল, "এতদিন কি বাঁপের বাড়ী থাকিতে হয়, বউ দিদি ?"

বিলি উত্তর করিল, "এখানে আসিয়াও ত তোমার দেখা পাই না।"

সো। এখন ত দেখা পেয়েছ, এখন বল দেখি, কেন এত্তদিন বাপের বাড়ী ছিলে ?

বি। তোর জন্যে বর খুঁজছিলাম।

সো। তবু ভাল, আমার জন্যে ব্যস্ত হ'বার একটা লোক পেলুম।

বি। দেখ্ সোহাগ—

সো। কি দেখ্‌ব, বউ দিদি ?

বি। আমি শুনেছি তুই খুব ভাল মেয়ে।

সো। বটে! আমি ত তা' জান্‌তুম না।

বি। ঠাট্টা রাখ্। কিছুদিন আগে তোকে আমি মন্দ বলেই জেনেছিলাম।

এবার সোহাগ উত্তর করিল না—ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মৌন রহিল। বিলি বলিল, "কিন্তু এখন জেনেছি—"

সো। এখন কি জেনেছ ?

বি। এখন জেনেছি, তুই একটি রমণীরত্ন।

সো। বটে! তবে আমাকে খোঁপায় তোল।

বি। সোহাগ—

সো। কি, বউ দিদি ?

বি। আমি অপরাধ করেছি—

সো। দাদার কাছে ?—শতবার।

বি। না, তোমার কাছে।

সো। বউ দিদি, ও রকম কথাগুলা বলো না, আমার বড় লজ্জা করে।

বিলি কোন উত্তর করিল না। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব রহিল। পরে বিলি ডাকিল, "সোহাগ—"

সো। আবার কি?

বি। আমার সাধ হয়—

সো। বাপের বাড়ী যেতে নাকি?

বি। দূর।

সো। তবে কি?

বি। না, সে কথা বল্‌ব না।

সো। বল্‌তেই হবে, আমার মাথার দিব্য।

বি। আমার দাদার সঙ্গে তোর বিবাহ দিতে।

বালিকার প্রগল্‌ভতা মুহূর্ত্তে দূর হইল; সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া নীরব রহিল।

বি। কিন্তু—

সোহাগ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

বি। কিন্তু তাহাত হ'বার নয়।

সোহাগের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে—কেন?

বিলি অন্যমনস্কভাবে আপন মনে বলিতে লাগিল, "দাদা বোধ হয় আর বিবাহ করিবেন না।"

সোহাগ উঠিবার উপক্রম করিল। বিলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমার দাদাকে দেখেছিস ?"

সোহাগ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—দেখেছি।

বিলি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মা, কোথায় দেখ্‌লি ? দাদা বড় কুৎসিৎ, না ?"

সো। কুৎসিৎ কা'কে বল্‌ছ ?

বিলি তীক্ষ্ণ নয়নে সোহাগের পানে চাহিল। বালিকার মনোভাব বিলির অবিদিত রহিল না। সোহাগও বুঝিল, বিলি সকলই জানিতে পারিয়াছে।—লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল।

বিলি বলিল, "তুই দাদাকে ভালবেসেছিস্ ?"

সোহাগ উত্তর না দিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। বিলি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "যে আমার দাদাকে ভালবাসে সে আমার বড় আপনার। তাঁকে যে কেহ চিনে না—ভালবাসে না। সোহাগ—সোহাগ, তোকে আর আমি ছাড়্‌ব না।"

তার কয়েক দিন পরে নির্ম্মল মায়ের অনুমতি লইয়া

সস্ত্রীক বিশালপুরে যাত্রা করিলেন। এবার বিশালপুরে যাওয়াটা বিলির জিদে নয়—নির্ম্মলের জিদে। নির্ম্মল গৃহে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, রমেশ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া শয্যাশায়ী আছেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য নির্ম্মল ব্যাকুল হইলেন। বিলিও সঙ্গে চলিল; সেটাও নির্ম্মলের বাসনানুযায়ী। সেই বহুস্মৃতিপূর্ণ বিলাসের বজরাখানি সাজাইয়া উভয়ে বজরায় উঠিলেন। যখন যাত্রা করিলেন তখন অপরাহ্ন।

পরদিন প্রভাতে বজরার ছাদে বসিয়া বিলি নির্ম্মলকে বলিল, "আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

নির্ম্মল বলিলেন, "বলিতে এত সঙ্কোচ কেন? বাসনা কি, বল।"

বি। তীর্থ দর্শন করিবার বাসনা জন্মিয়াছে।

নি। তীর্থ! এখানে তীর্থক্ষেত্র কোথায়?

বি। আছে—সন্নিকটেই আছে।

নি। তাহাত আমি জানিতাম না। কোথায় বজরা লাগাইতে বলিব?

বি। আমি দেখাইয়া দিতেছি।

বিলির নির্দ্দেশিতস্থানে ক্ষণপরে বজরা লাগিল। উভয়ে তীরে উঠিলেন। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। নির্ম্মল বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, সন্নিকটে কোথাও লোকালয় বা দেবালয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানেত একখানা ইটও দেখিতেছি না—তীর্থক্ষেত্র কোথায়?"

বিলি উত্তর করিল, "সম্মুখে সেই ক্ষেত্র। এইখানে আমি ধর্ম্ম শিখিয়াছি—তোমায় চিনিয়াছি।"

নি। আমি যে তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, বিলি!

বি। পার্শ্বে ভাগিরথী গর্ভে আমার নৌকা ডুবিয়াছিল—সম্মুখে মুক্তক্ষেত্রে হারাণ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এখন বুঝেছ?

নি। না।

বি। তবে আরও এগিয়ে চল। আমার যোগস্থান—আমার তীর্থধাম দেখিবে এস।

উভয়ে আরও অগ্রসর হইলেন! পাড়ের ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। উভয়ে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় একজন লোক শয়ান রহিয়াছে। উভয়ে বিস্মিত হইলেন। লোকটাকে বিলি দেখিবামাত্র

চিনিল। একটু অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "হারাণ, তুমি আবার এখানে?"

যে শুইয়াছিল, সে প্রকৃতই হারাণ। তাহার অবস্থা বড় শোচনীয়। যা' কিছু সুন্দর, সুখকর সকলই তাহাতে লোপ পাইয়াছে। যা' কিছু বীভৎসদর্শন, ঘৃণা উদ্দীপক তাহাই তাহাতে বর্ত্তমান। পরিধানে একখানি শতধা-ছিন্ন, ক্ষুদ্র, মলিন বস্ত্র—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট—দেহ কঙ্কাল-সার—কেশ রুক্ষ, জটাসম্বদ্ধ। সে মুমূর্ষু, উত্থানশক্তি রহিত। কখন সজ্ঞান, কখন বা জ্ঞানশূন্য।

বিলির কণ্ঠস্বর হারাণের মর্ম্মস্পর্শ করিল সে চাহিয়া দেখিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু-কবলিত দেহে নব শক্তির সঞ্চার হইল সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না।—পড়িয়া গেল। তখন বিলির পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এসেছ! আমার শেষ প্রার্থনা, শেষ ভিক্ষা কাণে গিয়াছে? আমার অন্তিম বাসনা শুনে স্বর্গ হ'তে নেমে এসেছ? একটু দাঁড়াও—একটু তোমায় দেখি; তোমার পানে চেয়ে তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি। আমার আর বিলম্ব নাই—বেশীক্ষণ তোমায় ধরে রাখব না।"

বিলি বলিল, "এ জনহীন প্রান্তরে কেন পড়ে রয়েছ? —চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

হারাণ। গৃহ! গৃহ অনেকদিন ছাড়িয়াছি। যেদিন তোমায় গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিয়াছি, সেই দিন হইতে গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। দেশময় অশান্ত প্রাণে ছুটিয়া বেড়াইয়া অবশেষে এইখানে মরিতে আসিয়াছি। ভাবিলাম, যেখানে তুমি মরিয়াছ, সেইখানে তোমার প্রেতাত্মাও আছে। যদি আমার দেহাবশেষ তোমার প্রেতাত্মার করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এই আশায় লুব্ধ হইয়া এখানে মরিতে আসিয়াছি। আজ আমার জীবন ধন্য হইল—মৃত্যু সুখের হইল,—আজ তোমার প্রেতাত্মা দেখিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! আমার বোধ হইতেছে যেন তোমার জীবন্ত প্রতিমা দেখিতেছি।

বিলি। আমি মরি নাই; আমাকে জীবন্তই দেখিতেছ।

হা। আর আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না। যাহা নিজে দেখিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া অপ্রত্যয় করিব?

তখন বিলি কেমন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল তাহা

বলিল। শুনিয়া হারাণ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বিজ্‌লির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার শুষ্ক চক্ষু বহিয়া জলধারা ছুটিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "বিজলি, দেবি, আজ পাহাড়ের ভার আমার বুকের উপর হইতে নামাইয়া লইলে। কি বলিয়া কি বলিব জানি না। আমার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ—সকলই আমি ভুলিয়া যাইতেছি। এতদিনে আমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।"

বি। তুমিও আমায় নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। যে আত্মাভিমান, অবিশ্বাস লইয়া এইস্থানে একদিন আসিয়াছিলাম, তুমি আমায় জলে ডুবাইয়া, সে ঘৃণিত আত্মচিন্তা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। তোমার দয়ায় আমি স্বামীকে চিনিয়াছি—ভগবানকে চিনিয়াছি।

হা। তুমি আমার ভগবান—তুমিই আমার স্বামী,—তোমা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হারাণ আবার বলিল, "আমি এ সংসার ছাড়িয়া, এ সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া, সকলের উপর তোমায় ছাড়িয়া অজ্ঞাত রাজ্যে চলিলাম। যদি জন্মান্তর থাকে—"

বলিতে বলিতে হারাণের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল।

হারাণ ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "যদি জন্মান্তর থাকে তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মে যেন তোমার আশীর্ব্বাদে আমার পশুত্ব ধ্বংস হয়—যেন আমি জন্ম জন্মান্তরে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেবী বা কন্যা ভাবে, ভগিনী বা সঙ্গিনী ভাবে তোমার উপাসনা করিতে পারি।"

হারাণ নীরব হইল,—ক্ষণকাল বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। বিলি আরও একটু অগ্রসর হইয়া হারাণের নিকটবর্ত্তী হইল। নির্ম্মল পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে এদৃশ্য দেখিতে ছিলেন। হারাণ, নির্ম্মলকে দেখে নাই—বিলির মুখ খানি ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নাই। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে হারাণ অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "মরি, মরি, কি সুন্দর! যে পৃথিবীতে তুমি আছ সে পৃথিবী কি সুন্দর। তোমাকে বুকে ধরিয়া পৃথিবী সুন্দর—তোমার আলো মাখিয়া সূর্য্য সুন্দর—তোমার সংস্পর্শে বাতাস সুন্দর—তোমার ছায়া বুকে ধরিয়া আকাশ সুন্দর—জাহ্নবী সুন্দর। এই সুন্দর—বিশ্ব—মাঝে—তুমি—অতি—সুন্দর। এই—সৌন্দর্য্য,—এই সৌন্দর্য্যের রাণীকে—ছাড়িয়া—চির বিদায়—লইতে হইল,—এই যা' দুঃখ; নতুবা—মরণে—কি সুখ। কিন্তু—কিন্তু—আবার—দেখা—হ'বে।"

আর কথা ফুটিল না সব শেষ হইয়া গেল।

সন্নিকটস্থ গ্রামের লোক ডাকিয়া নির্ম্মল, হারাণের শব দাহ করিলেন।

যখন শব দাহ হইতেছিল তখন বিলি একটা কাজ করিল। যে ধীবর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল বিলি তাহার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল ; এবং বিস্মিত ধীবর-দম্পতীর সন্নিধানে প্রচুর অর্থ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। দম্পতীযুগল ভাবিল, গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাদের অর্থ দিয়াছেন। গৃহিণী পুলকিত অন্তরে গৃহকোণে অর্থ প্রোথিত করিতে সমুদ্যত। কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "মোদের টাকা-কড়িতে কাজ নেই—বর লেব।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর অর্থ ফিরাইয়া দিয়া ঠাকুরের কাছে বর লওয়াই স্থির হইল। তখন দম্পতীযুগল, টাকা কড়ি কাপড়ে বাঁধিয়া গঙ্গাদেবীর অনুসন্ধানে চলিল। গঙ্গাদেবী গঙ্গায় থাকেন ; অতএব তাঁহার অনুসন্ধান সহজসাধ্য। উভয়ে গঙ্গার ধারে আসিয়া ঘাটে একখানা বজরা দেখিল—কিন্তু গঙ্গাদেবীকে দেখিতে পাইল না। ধীবরপত্নী ভাবিল, গঙ্গামাই বুঝি বজরা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,—অতএব সে টাকা-কড়ি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতঃ

ভক্তিগদগদ চিত্তে বজরার নিকট স্বাগত একটা বর চাহিয়া গৃহে ফিরিল।

এদিকে শবদাহ শেষ হইতে অপরাহ্ন হইল। যখন চিতার ধূম নিবিয়া গেল তখন নির্ম্মল বজরা ছাড়িয়া আবার বিশালপুর অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকদূর যাইতে হইল না;—পথিমধ্যেই রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

রমেশ যে দিন বিলির অন্বেষণার্থ অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আঘাত পাইয়াছিলেন। এতদিন শয্যা হইতে উঠেন নাই—উঠিবার শক্তিও ছিল না। আজও বড় দুর্ব্বল, তবে বিলি ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিবার মানসে আজ অধীরান্তঃকরণে বধূগ্রাম অভিমুখে ছুটিয়াছেন। রমেশ বজরায় আসিতেছিলেন। নির্ম্মল তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র ক্ষুদ্র নৌকাখানি নামাইয়া রমেশের বজরায় গিয়া উঠিলেন। অধীর পদে রমেশের কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া সকল কথার আগে বলিলেন, "রমেশবাবু, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। না বুঝিয়া ভ্রমে পড়িয়া তোমার মত দেবতাকে একদিন আমার

গৃহ হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছি। আমি যথার্থই বর্ব্বর। তুমি দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিতে পার; কিন্তু এ ক্ষোভ, এ মনোব্যথা আমার চিরদিন থাকিবে।"

রমেশ বলিলেন, "ভাই, ভ্রম মানুষের প্রকৃতিগত। কিন্তু সে ভ্রম স্বীকার করিতে কয়টা মানুষের সাহস আছে? আত্মকৃত অপরাধের জন্য কাঁদিতেই বা কয়টা লোক পারে? যে পারে সে মহৎ। সে সব কথা যাক্—এখন আমার বিজু কোথায়?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তারপর ছয় মাস অতীত হইয়াছে। যে আশা রমেশের হৃদয়ে এতদিন সঞ্জীবিত ছিল তাহা মিটিয়াছে;—তিনি সোহাগকে পাইয়াছেন। নববধূকে লইয়া রমেশ আজ আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছেন।

ফাল্গুন মাস। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া মলয়ানিল প্রফুল্ল। তরঙ্গশিরে হীরক জ্বালিয়া, পত্রে পত্রে ফুল ফুটাইয়া চন্দ্রমা গরবিণী।

পুষ্পোদ্যান মধ্যে রমেশ একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোহর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গৃহের সকলই সুন্দর। অর্থে যদি সৌন্দর্য্য কিনিতে পারে তবে গৃহটি অতি সুন্দর। গৃহপ্রাচীরে লতা-পাতা-ফুল নানাবর্ণে চিত্রিত—হর্ম্ম্যতল মর্ম্মর প্রস্তরগঠিত। রৌপ্য দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ—অগণিত ফুলমালা দীপাধার হইতে দীপাধারে বিলম্বিত। মধ্যস্থলে বহুমূল্য পালঙ্ক। সেই উজ্জ্বল-দীপাবলি-উদ্ভাসিত সুগন্ধময় কক্ষমধ্যে নবদম্পতী পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট।

উভয়ে নীরব; কিন্তু সুখের আবেশে বিভোর। সোহাগ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহা পাইয়াছে। দেবতুল্য স্বামী—কুবেরের ঐশ্বর্য্য—স্বামীর ভালবাসা, সকলই পাইয়াছে। সে ভাবিতেছিল, "কোন পুণ্যফলে তাহার এ সৌভাগ্য!" সোহাগ আর থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "সোহাগ, কাঁদিতেছ কেন?"

সোহাগ উত্তর করিল না। কেবল একবার সকরুণ দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর পানে চাহিল। সে লজ্জা-জড়িত দৃষ্টি, সে অশ্রুজলের অর্থ রমেশ বুঝিলেন। কিন্তু কথাটা সোহাগের মুখে শুনিবার অভিপ্রায়ে রমেশ

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, বল সোহাগ, কেন কাঁদিতেছ।"

সোহাগ নিরুত্তর রহিল। কিন্তু রমেশ ছাড়িলেন না। নববধূর মুখে প্রণয়ের কথা শুনিতে প্রণয়ীর বড়ই লোভ। রমেশের বয়স কিছু বেশী হইলেও তিনি প্রণয়ী। তিনি সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না ;— সোহাগকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সোহাগ, আমি কুৎসিৎ-দর্শন—বয়সেও তোমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু যদি আদরে,ভালবাসায় এ অভাব দুর করা সম্ভব হয় তাহা হইলে যা' কিছু আমার হৃদয়ে স্নেহময় আছে তাহাতে তোমায় আজীবন নিমজ্জিত রাখিব।"

সোহাগ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল ; চোখের কোণে একটু অনুযোগ—ভ্রূ-মধ্যে একটু তিরস্কার। সে দৃষ্টির অর্থ রমেশ বুঝিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল। তবু তিনি ছাড়িলেন না,— আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ভাবিয়া কাঁদিতেছিলে, বল ?"

সোহাগ চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভাবিতেছিলাম, তোমার যেমন দয়া, আকাশের দেবতা-

দেরও কি তেমনি দয়া ? তাঁরাও কি আমার মত পাপী-তাপীকে দয়া করেন ?”

বলিতে বলিতে সোহাগের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইল। রমেশ সস্নেহে তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া উদ্যান মধ্যে লইয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যান মধ্যে অনেকক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া উভয়ে আবার ফিরিলেন। শয়নকক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, পালঙ্কের উপর—যেখানে তাঁহারা ক্ষণপূর্ব্বে বসিয়াছিলেন সেখানে দুইছড়া গোলাবের মালা পড়িয়া রহিয়াছে। মালা ক্ষণপূর্ব্বে এখানে ছিল না; এর মধ্যে কে রাখিয়া গেল ? রমেশ মালা উঠাইয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুষ্পনিচয় সদ্যচয়িত ; এবং কাপড়ের সূক্ষ্ম ছিন্নাংশ দ্বারা একত্র গ্রন্থিত। আরও দেখিলেন, এই বসন-ছিন্নাংশে ও ফুলের পাপ্ড়িতে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রমেশ ভাবিলেন, “কে এ মালা এখানে রাখিয়া গেল ?”

রমেশ ঝটিতি গৃহবাহিরে আসিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গৃহ ছাড়িয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রমেশ সবিস্ময়ে দেখিলেন, একটী মলিনবসনা রমণীমূর্ত্তি দ্রুত-পাদবিক্ষেপে উদ্যান অতিক্রম করিয়া নদীর দিকে চলিয়াছে। রমেশ, নীরবে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

নদীকূলে আসিয়া দেখিলেন, রমণী জলে নামিয়াছে। দ্রুতপাদ সঞ্চারণে ক্রমেই সে গভীরতর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখন সে আকণ্ঠ জল পাইল তখন দাঁড়াইয়া একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল। চাঁদের পূর্ণছটা তাহার মুখের উপর পড়িল। মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। রমেশ তাহাকে চিনিলেন। চলনভঙ্গিমা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। রমেশ ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না!"

কেহ কোন উত্তর দিল না। বুঝিবা উত্তর স্বরূপ সে আরও গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইল। রমেশ তখন জলে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীর চিবুক ডুবিল, নাসিকা ডুবিল, চক্ষু ডুবিল, ক্রমে কেশরাশিও ডুবিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ রমেশ আবার ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না!"